বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা ও তার বিচার

আইন ও সালিশ কেন্দ্র

বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা ও তার বিচার

আইন ও সালিশ কেন্দ্র

www.pathagar.com

বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা ও তার বিচার

এপ্রিল ২০০৭

© আসক

প্রচ্ছদ
মনন মোর্শেদ

অঙ্গসজ্জা
খায়রুল হাসান সুমন

ফটোগ্রাফ
আসক ও ইন্টারনেট

মুদ্রণ
সাহিত্য প্রকাশ

প্রকাশক
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
২৬/৩ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৮৩১৫৮৫১, ৯৩৩৭১৭৩, ৯৩৬০৩৩৬
ফ্যাক্স: ৮৩১৮৫৬১
ই-মেইল: ask@citechco.net
ওয়েবসাইট: www.askbd.org

ISBN: 984-300-000517-7

মূল্য: ১০০ টাকা

www.pathagar.com

সূচি

মুখবন্ধ ৪

প্রবন্ধ ৬
বাংলাদেশের অমীমাংসিত জঙ্গিবাদ: বোঝবার প্রচেষ্টা – মিল্লাত হোসাইন ৬

আক্রান্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ১২
আসমা কিবরিয়া ১২
মোঃ শহীদুল আলম ১৪
সানোয়ার হোসেন ১৬
যাদব ১৮
জোৎস্না বিশ্বাস ২১
কবরী সারোয়ার ২৪

মত-অভিমত ২৬
বদরুদ্দীন উমর ২৭
মফিদুল হক ২৮
রেহনুমা আহমেদ ৩০
শিরিন শারমিন চৌধুরী ৩৫
আসিফ নজরুল ৩৮

তদন্ত প্রতিবেদন ৪০
রাজশাহী ৪০
নওগাঁ ৪৮
দিনাজপুর ৫৫
চট্টগ্রাম – শেখ নাসির আহমেদ ৫৭
জঙ্গিদের অর্থ যোগানদাতা মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক এনজিও –টিপু সুলতান ৫৯

মামলা পর্যালোচনা ৬৩
ঝালকাঠিতে দুই বিচারক হত্যা মামলা – এটিএম মোরশেদ আলম ৬৩
যশোর উদীচী বোমা হামলা ও হত্যা মামলা – মিল্লাত হোসাইন ৭৪

আইন পর্যালোচনা ৮০
টেলিফোনে আড়ি পাতা: জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ – নূরুল কবীর ৮০

সাক্ষাৎকার ৮৭
রুহুল কুদ্দুস বাবু ৮৭
নিজামুল হক নাসিম ৯২
আনু মুহাম্মদ ৯৪

পরিশিষ্ট ১০০
বোমা হামলার ঘটনাপঞ্জি ১০০
রাজশাহী-নওগাঁ অঞ্চলে বাংলাভাই বাহিনীর নির্যাতনে নিহত ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকা ১১৫
ঘটনাপ্রবাহ ১১৭
১৭ আগস্ট ২০০৫ তারিখে জেএমবি'র প্রচারিত লিফলেট ১৩২
পরিসংখ্যান ১৩৫

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

এ প্রকাশনার খসড়ার কাজ শুরু হয়, বলা যায় ২০০৪-এর এপ্রিল-মে মাস থেকেই। তখন রাজশাহী-নওগাঁ অঞ্চলে বাংলাভাই সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছে। ক্যাম্প বসিয়ে সর্বহারা বলে চিহ্নিত গ্রামবাসীদের আত্মসমর্পণ করানো, বিচার করা, শাস্তি দেয়া, নির্যাতন, লুট, প্রকাশ্যে হত্যা, অপহরণ, গুম-খুন ইত্যাদি চলছিল। ২০০৪-এর ১ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২৫ মে অর্থাৎ বাংলাভাইয়ের সে অঞ্চল ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তা-ই চলে। এসব থামানোর কথা ছিল যাদের অর্থাৎ পুলিশ প্রশাসন, তারা উল্টো সহযোগিতা করছিল বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তার সাথে তৎকালীন স্থানীয় মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রী-সাংসদ-রাজনীতিকদের একাংশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদ, ইঙ্গিত কিংবা অভয়দানও ছিল। সেসব তথ্য এখন ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে। এদিকে রাজধানী থেকে চলে সরকারের লাগাতার অস্বীকৃতি। প্রচার মাধ্যমের সুবাদে দেশের মানুষ এসব ব্যাপারে অবগত হয় ঠিকই, তবে তাদের হাত-পা বাঁধা– করার কিছুই নেই। এমনি এক ত্রিশঙ্কু অবস্থায় এসব আইন-বহির্ভূত কর্মতৎপরতা, নৃশংস আচরণ এবং সরকারের দায়িত্বহীনতা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য ৩১ মে '০৪ ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারীপক্ষ, ব্লাস্ট এবং সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন– এই পাঁচ মানবাধিকার ও সামাজিক সংগঠন। পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার জন্য ১–৬ জুন ২০০৪-এর মধ্যে আসকের দুটি তদন্ত প্রতিনিধিদল রাজশাহীর বাগমারা এবং নওগাঁর রানীনগর উপজেলায় অনুসন্ধান চালায়। সেখানে আক্রান্ত মানুষ, তাদের পরিবার-পরিজন ও এলাকাবাসীর সাথে কথা বলার পর নৈরাজ্যের যে ভয়াল চিত্র উঠে আসে তা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট হবে। তখন যে বা যারা এসবের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিংবা প্রতিবাদ জানিয়েছে সবাই যেন মিথ্যেবাদী অথবা দেশের ভাবমূর্তি ভাঙায় রত।

তারপর বছর ঘুরে আসে ১৭ আগস্ট ২০০৫। সেদিন কাছাকাছি সময়ের ভেতর সারাদেশে ৬৩ জেলায় যুগপৎ বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় জেএমবি। তাতে নিহত হয় ২ জন এবং আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৫ জন। অতঃপর একে একে বোমা, আত্মঘাতী বোমার বিস্ফোরণ। এই দুর্বিপাকের মুখে সরকারযন্ত্রের বোধহয় চৈতন্যোদয় ঘটে কিছুটা। কিংবা বলা যায়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপের কারণে সরকার বাধ্য হয় এই জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে। অল্প দিনের মধ্যেই গ্রেফতার হয় জেএমবির শীর্ষ নেতৃকুল। কিন্তু অন্যদিকে আবার এই জঙ্গি তৎপরতাকে হাতিয়ার বানিয়ে সন্ত্রাস দমনের নামে কিছু আইন প্রণয়ন করতে শুরু করে সরকার। যেগুলো সর্বতোভাবে মৌলিক নাগরিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, টেলিফোনে আড়িপাতা আইন, মানি লন্ডারিং আইন-২০০৫ ইত্যাদি। টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত একটি পুরনো আইন সংশোধন করে ২০০৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে জারি হয় 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধনী) আইন- ২০০৬।' এ আইনের বলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো, কোন তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যে কোনো কর্মকর্তা নাগরিকদের যে কোনো ফোনালাপ, ইলেকট্রনিক বা অন্য যে কোনো ধরনের বার্তা বিনিময়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং তা ধারণ করতে পারবেন।[১] একই সাথে গ্রাহকদের কথোপকথনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং তা ধারণ করার জন্য সরকারি আদেশ যদি ফোন কোম্পানিগুলো না মানে, তাহলে তাদের জন্য আর্থিক জরিমানা ও দন্ডের বিধান রাখা হয় এই আইনে।

সরকারের এ সংক্রান্ত তৎপরতা মানবাধিকার সংস্থা হিসেবে আইন ও সালিশ কেন্দ্র শুধু পর্যবেক্ষণই করেনি– এসব আইনের অপপ্রয়োগের আশঙ্কায় সোচ্চারও হয়েছে। কেননা নিবর্তনমূলক আইন নিয়ে বিশেষত আমাদের মতো দেশে

১ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধনী) আইন, ২০০৬-এর ৯৭(ক) ধারা

www.pathagar.com

যেখানে গণতন্ত্র খুবই নাজুক অবস্থায় পড়ে আছে, অভিজ্ঞতা মোটেও ভালো নয়। মানুষের দুর্ভোগ বাড়ানোর জন্যই যেন সেসব তৈরি হয়। তদুপরি 'ব্যক্তি অধিকার' প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের যে দীর্ঘদিনের লড়াই তাকে এক নিমেষে বলি দেয়া যায় 'নিরাপত্তার' নামে জারি করা এসব আইনের মাধ্যমে। সুতরাং আমাদের প্রকাশনায় এ দিকটির অন্তর্ভুক্তি বিশেষভাবে জরুরি মনে হয়েছে।

এ প্রকাশনা জেএমবির হামলা ও বিচার নিয়ে হলেও আমরা মনে করি না যে, এটিই বাংলাদেশের একমাত্র জঙ্গি সংগঠন। একে বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখারও জো নেই। এ ব্যাপারে নানাজনের নানামত রয়েছে। আমরা এখানে বিবিধ কণ্ঠস্বর একত্র করার চেষ্টা করেছি একীভূত করার প্রয়াস ব্যতিরেকে। কেননা জঙ্গি তৎপরতার বিষয়টি এক কথায় জটিল, আমাদের জন্য অভিজ্ঞতা হিসেবে আনকোরাও বটে। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো অবস্থান নেয়ার সময় এখনো আসেনি। ইতোমধ্যে সরকার বদল হয়েছে। জঙ্গিদের ব্যাপারে বর্তমান সরকার ও প্রশাসনের অবস্থান তৎকালীন জোট সরকারের সঙ্গে তুলনা করলে পার্থক্যটা প্রায় আকাশ-পাতাল। ২০০৬ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আমাদের যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, সেই সময়ের প্রেক্ষিতেই দিয়েছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের বেশ কিছু বক্তব্য হয়তো প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। তবে সেসবের ঐতিহাসিক মূল্য আছে, যা সেই সময় ও অবস্থাকে বুঝতে সহায়ক হবে। তাই তাদের সাক্ষাৎকারগুলো যথাযথ রাখা সমীচীন মনে হয়েছে। আর ভুক্তভোগী, ক্ষতিগ্রস্ত, নির্যাতন ও হত্যার শিকার পরিবারের সদস্যদের কষ্ট-অভিযোগ তো কখনো পুরনো হওয়ার নয়। তাদের বক্তব্য/সাক্ষাৎকার এক কথায় সময়ের ধরাবাঁধার বাইরে বলা চলে।

মানবাধিকার সংস্থা হিসেবে আইন ও সালিশ কেন্দ্র মৃত্যুদন্ডের পক্ষপাতী নয়। তবে ৩০ মার্চ রাতে ছয় জঙ্গির ফাঁসিতে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ হয়তো সান্ত্বনা পেয়েছেন, দেশের আতঙ্কিত মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এসেছে– এই অনুভূতিগুলোকে মূল্য না দেওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু কেউ যদি ভেবে থাকেন, ছয় জঙ্গির ফাঁসির মাধ্যমে এর ফয়সালা হয়ে গেল, তাহলে মনে হয় ভুল করা হবে। আমাদের আশঙ্কা, তড়িঘড়ি শাস্তি কার্যকর করার মাধ্যমে আসল সত্য চাপা পড়ার সুযোগ তৈরি হয়ে গেল কিনা। মানুষ কিন্তু এখনো সেই তিমিরে। অথচ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত বা নিরাপত্তাহীনতার ভুক্তভোগী হিসেবে তার এ সংক্রান্ত তথ্য জানার অধিকার রয়েছে। কেননা সরকার বদলায়, জনগণ নিজের জায়গায়ই থেকে যায়। দেশে তখন সরকার-প্রশাসন বলবৎ থাকার পরও কেন তারা সাহায্য-সহযোগিতা পেল না, কেন তাদের নিরাপত্তাহীনতায় ও বোমা আতঙ্কে ভুগতে হলো, প্রিয়জনকে হারাতে হলো, নিজে পঙ্গু হলো– সেসব জানার অধিকার তাদের আছে বৈকি। তাছাড়া ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যও এ সংক্রান্ত জরুরি তথ্যগুলো জনসমক্ষে আসা দরকার।

এ প্রকাশনায় অনেকের মিলিত ভূমিকা রয়েছে। রাজশাহী-নওগাঁ জেলার ভুক্তভোগী মানুষ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আসক-এর তথ্যানুসন্ধানী দলকে তথ্য দিয়েছেন। সর্বাগ্রে তাদের প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। নিহতের পরিবার ও পঙ্গু-আহত মানুষজনের কাছে তাদের জীবনের ভয়াবহ কষ্টের এবং অবিচারের দিনগুলোর কথা শুনতে গিয়ে হয়তো তাদের দুঃখ-কষ্টকে আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আসক-এর পক্ষ থেকে তাদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। সত্যি যে, এছাড়া তথ্যসংগ্রহে আমাদের আর কোনো পথ ছিল না। রাজনীতিক, আইনজীবী, শিক্ষক, লেখক, গবেষক, অভিনেত্রী, যাত্রাশিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাক্ষাৎকার প্রকাশনার বিষয়কে নানাদিক থেকে দেখতে-বুঝতে ও এ নিয়ে নতুন করে ভাবতে সহায়ক হবে। তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লেখা পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে যারা আমাদের বাধিত করেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। অ্যাডভোকেট ইদ্রিসুর রহমান আইনি দিকগুলো নির্ভুল করার প্রয়াস নিয়েছেন। নূর খান লিটন জরুরি তথ্য সংশোধন করেছেন। হামিদা হোসেন প্রকাশনার বিষয়গুলো নির্বাচন এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন– তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

আসক-এর কমিউনিকেশন, তদন্ত ও তথ্যসংগ্রহ ইউনিট এবং কম্পিউটার সেকশনের কর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টায় 'বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা ও তার বিচার' শীর্ষক বৃহৎ কলেবরের প্রকাশনার কাজ সমাধা হলো। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন মনন মোর্শেদ। আসক-এর বাইরে যারা এ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরসহ সবাইকে ধন্যবাদ।

সুলতানা কামাল
নির্বাহী পরিচালক
আইন ও সালিশ কেন্দ্র

www.pathagar.com

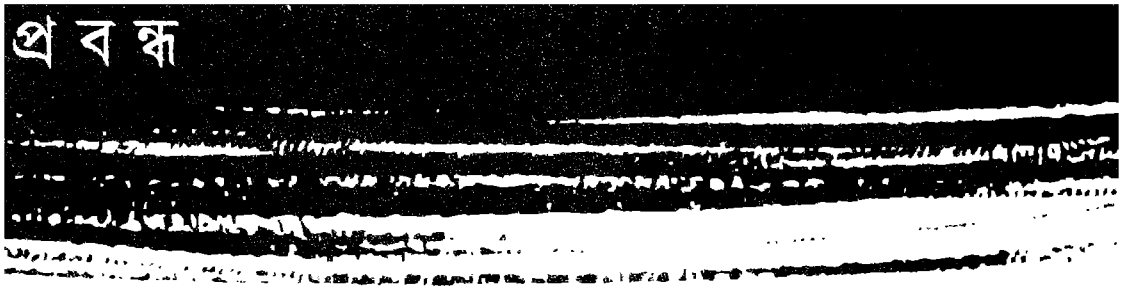

বাংলাদেশের অমীমাংসিত জঙ্গিবাদ: বোঝবার প্রচেষ্টা

মিল্লাত হোসাইন

৩০ মার্চ ২০০৭ মধ্যরাতে প্রায় সবার অগোচরে এবং বাংলাদেশে জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) অপরাপর কার্যকলাপের মতো অনেকটাই আকস্মিকভাবে দেশের বিভিন্ন কারাগারে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হলো জেএমবি প্রধান শায়খ আবদুর রহমান, দ্বিতীয় শীর্ষনেতা সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই, সামরিক প্রধান আতাউর রহমান সানি, শুরা সদস্য আবদুল আউয়াল, খালেদ সাইফুল্লাহ্, এবং হামলাকারী ইফতেখার হাসান মামুনের। ২০০৫ সালের ১৪ নভেম্বর ঝালকাঠিতে বোমা হামলার মাধ্যমে দু'জন নিম্ন আদালতের বিচারক জগন্নাথ পাঁড়ে এবং সোহেল আহমেদকে হত্যা করার মামলায় তাদের এই দণ্ড দেয় আদালত। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে সৃষ্ট সশস্ত্র ধর্মীয় জঙ্গিবাদের একটি পর্যায়ের সমাপ্তি হলো বলা যায়। কিন্তু এতেই পুরো বিষয়টির 'একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি' হয়ে গেল এমনটি ভাবা কি যুক্তিসঙ্গত হবে? এটি এবং এ সংক্রান্ত অপরাপর প্রশ্নের জবাব খোঁজার একটি উপযুক্ত সময় ও সুযোগ এখন আমাদের সামনে এসেছে।

জেএমবি, শায়খ ও বাংলাভাই

চলতি ২০০৭ সালের ৩০ জানুয়ারি – ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় বাংলাদেশে জেএমবি সৃষ্ট জঙ্গি ঘটনাপ্রবাহের ওপর একটি ধারাবাহিক তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে পত্রিকাটি সুস্পষ্ট ভাষায় দাবি করেছে যে, এ প্রতিবেদনে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রমাণ তাদের হাতে আছে। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী জেএমবির জন্ম হয় ১৯৯৮ সালে।

২০০৪ সালের ১৯-২০ মে'র কোনো এক সময় জেএমবির হাতে খুন হওয়া, নওগাঁ জেলার রানীনগর থানার বাসিন্দা আব্দুল কাইয়ুম বাদশার গাছের ডালে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা লাশের ছবি পরদিন ২১ মে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ছাপা হওয়ার পর জেএমবি, জেএমজেবি, শায়খ কিংবা বাংলাভাই নামগুলো এবং তাদের কার্যক্রম দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে। এর দু'দিন পর ২৩ মে ২০০৪ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাংলাভাইকে গ্রেফতারের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দান, কিংবা তার এক সপ্তাহ পর ৩১ মে সরকার কর্তৃক বাংলাভাইকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা– এসব এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য তাদের প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু হয় এর ক'দিন আগে ২০০৪ এর ১ এপ্রিল সকাল ৯টায় রাজশাহীর বাগমারা থানার হামিরকুৎসা বাজারে সংঘটিত সশস্ত্র শো–ডাউনের মাধ্যমে[১]।

---

১ আসক বুলেটিন, ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃষ্ঠা. ৮-৯।

www.pathagar.com

১৯৯৮ থেকে ২০০৪-এ মধ্যবর্তী সময়ে জেএমবি কী করছিল বা আদৌ কি কিছু করেছিল? এ সময়কালে তাদের তৎপরতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা হলো– ২০০১ সালে বাগমারায় দাওয়াতি কার্যক্রমের সূচনা; একই বছরের শেষের দিকে শায়খের নিজ জেলা জামালপুরে দু'জন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানকে জবাই করে হত্যা; ২০০২ সালের ১৬ আগস্ট বাগেরহাটে এক সংখ্যালঘু নেতার ওপর হামলা; একই বছরের ৭ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ৪টি সিনেমা হলে বোমা হামলা- নিহত ১৯ জন; ২০০৩-এর ২০ জানুয়ারি জয়পুরহাট জেলায় এক পীরের দরগায় আক্রমণ চালিয়ে ৫ খাদেমকে জবাই করে হত্যা; একই বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরের একটি মেসে বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণে এক জেএমবি সদস্যের মৃত্যু; ২০০৩ সালে টাঙ্গাইলের সখীপুরে এক মাজারে বোমা হামলায় ৩ জনের মৃত্যু; একই বছরের ১৪ আগস্ট জয়পুরহাটের জঙ্গি আস্তানায় প্রশিক্ষণকালে পুলিশি অভিযান; ২০০৪ সালের মার্চে টাঙ্গাইলে মনির খান নামের একজন লেখককে জবাই করে হত্যা; দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা করার পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ ইউনুসকে হত্যা করা এবং ২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদকে আক্রমণ[২], ২০০৫ সালের ৮ ডিসেম্বর নেত্রকোণা উদীচী কার্যালয়ে আত্মঘাতী বোমা হামলা ইত্যাদি।

এসব ঘটনায় পুলিশের সাথে জঙ্গিদের সংঘর্ষ হয় এবং তারা পুলিশের অস্ত্র লুট করে *(জয়পুরহাট)*। কয়েকটি ঘটনায় জেএমবি শুরা-সদস্য বাংলাভাই *(বাগেরহাট)*, খালেদ সাইফুল্লাহ *(দিনাজপুর)*, সালাউদ্দিন-আতাউর রহমান সানি-আবদুল আউয়াল *(টাঙ্গাইল-সখীপুর)* গ্রেফতার হয় পুলিশের হাতে। মামলা হয় এবং পরে তারা মুক্তিও লাভ করে। এসব ঘটনার বিবরণ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং কয়েকটি ঘটনা দেশজুড়ে আলোচিত হয়। জেএমবি'র জঙ্গি তৎপরতার পরবর্তী পর্যায়টি হলো– ১ এপ্রিল ২০০৪ থেকে ১৬ আগস্ট ২০০৫ পর্যন্ত। এ সময় তারা রাজশাহীর পুটিয়া, দুর্গাপুর, বাগমারা, নাটোরের নলডাঙ্গা, নওগাঁর আত্রাই ও রানীনগর থানাজুড়ে সর্বহারা দমনের নামে হত্যা-নির্যাতনের এক অভয়ারণ্য গড়ে তোলে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এ সময় তারা কমবেশি ২৪ জনকে হত্যা করে।[৩] এ পর্যায়ে জেএমবির কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সরব হয় দেশের গণমাধ্যম, প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, মানবাধিকার সংস্থাগুলো এবং তাদের মাধ্যমে জনগণের একটি বড় অংশ। তারপরও জেএমবি'র ভাষায় 'সংগঠনের ব্যাপারে কোনো সাড়া না মেলায় সারা দেশে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেওয়ার'[৪] জন্য তারা ১৭ আগস্ট ২০০৫ সারা দেশে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬৩ জেলায় (মুন্সীগঞ্জ বাদে) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে একযোগে প্রায় ৫শ' বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেদের প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেয়। এতে তাদের 'ঈপ্সিত লক্ষ্য' অর্থাৎ সাংগঠনিক প্রচার পুরো মাত্রায়ই হয়। পুরো দেশের মানুষ তো বটেই সরকারও তাতে বিচলিত হয়ে ওঠে। এমনকি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, সংস্থাগুলোও সচকিত হয়। শুরু হয় জঙ্গি ধরপাকড়। এফবিআই, সিআইএ, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, ইন্টারপোল, এমআই-৬ ইত্যাদি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ঘনঘন আগমন-নির্গমন ঘটতে থাকে।

এই দুর্বিপাকের মুখে যা হয় তা হলো– ১৭ আগস্ট (২০০৫) সারা দেশে বোমা হামলার পর আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ব্যাপক অভিযানের ফলে ও দলীয় সদস্যদের চাপে শায়খ আবদুর রহমান প্রথমে আদালতে হামলা এবং পরে আত্মঘাতী হামলার নির্দেশ দেন।[৫] এরপর ঘটনা খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। একের পর এক গ্রেফতার হতে থাকে জেএমবির শুরা সদস্যরা। ২০০৬-এর ২ ও ৬ মার্চ যথাক্রমে সিলেট থেকে শায়খ রহমান এবং ময়মনসিংহ থেকে বাংলাভাই – উভয়কেই আটক করার মাধ্যমে আপাত শেষ হয় এ দেশে জেএমবি এবং তৎসৃষ্ট জঙ্গি কার্যক্রমের একটি অধ্যায়। এরপর এদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তারপর শুরু হয় তাদের আলোচিত বিচার প্রক্রিয়া।[৬]

হরকাতুল জিহাদ ও অন্যান্য

বাংলাদেশে গত তিন থেকে চার বছর ধরে জেএমবি নামক জঙ্গি সংগঠন, এর কার্যকলাপ এবং নেতা-কর্মীদের নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড– তা থেকে একটি ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে যে, এ দেশে জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে এরাই বুঝি শেষ কথা বা একমাত্র দল। বিষয়টি মোটেই তা নয়।

---

২ প্র আ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

৩ পরিশিষ্ট-৩

৪ প্র.আ., ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

৫ প্র.আ., ২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

৬ বিস্তারিত ঝালকাঠিতে দু'বিচারক হত্যা মামলা শীর্ষক প্রবন্ধে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের গোটা রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক জীবনে ধর্মীয় জঙ্গিবাদের উত্থান, বিকাশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বাড়বাড়ন্ত অবস্থাকে যদি একটি পিরামিডের আকারে বিবেচনা করি তাহলে হয়তো জেএমবিকে এর শীর্ষবিন্দু বলা যেতে পারে। এর আগে, পরে এবং পাশাপাশি অস্তিত্বশীল ছিল এবং এখনো আছে অনেকগুলো উগ্র মৌলবাদী ও জঙ্গি সংগঠন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো– হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামি, বাংলাদেশ সংক্ষেপে হরকাতুল জিহাদ বা হুজিবি। এ দেশে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে শায়খ আবদুর রহমান হুজিবি'র সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন।[৭] পরবর্তীকালে নানা কারণে নিজে আলাদা একটি দল খুলে বসেন। যা হোক, গত ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক প্রথম আলোতে হুজিবির ওপর দুটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যা পত্রিকাটির ভাষায় ছিল, হুজিবির আলোচিত নেতা মুফতি আব্দুল হান্নানের ১৯ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে ঢাকা মহানগর হাকিমের কাছে দেয়া ১৬৪ ধারার জবানবন্দি। জবানবন্দি অনুযায়ী জেএমবির প্রায় এক দশক আগে ১৯৮৯-৯০ সালে একদল 'আফগান ফেরত' বাংলাদেশি দুনিয়াজুড়ে নির্যাতিত মুসলমানের সাথে সশস্ত্র জিহাদে শরিক হওয়া এবং দেশে 'অনৈসলামিক' কাজ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে হুজিবি গঠন করে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের জঙ্গিসংগঠনে সরবরাহ করার মাধ্যমে তাদের কাজ শুরু হয়।

হান্নানের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী যশোরে উদীচী সম্মেলন (১৯৯৯), গোপালগঞ্জে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যাচেষ্টা (২০০০), ঢাকায় ছায়ানটের বাংলা নববর্ষবরণ অনুষ্ঠান (২০০১), একই বছর সিলেটে শেখ হাসিনাকে পুনরায় হত্যার চেষ্টা, ২০০৪-এ সিলেটে ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীকে গ্রেনেড ছুড়ে হত্যার চেষ্টা, সিলেটের মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান এবং আওয়ামী লীগ নেত্রী জেবুন্নেসাকে হত্যার চেষ্টা– এসব ঘটনা হুজিবিই ঘটিয়েছে। ইতোমধ্যে তারা একবার ভারতে গ্রেনেড পাচার করে। আর কবি শামসুর রাহমানের ওপর হুজিবিই হামলা করেছে বলে শায়খ আবদুর রহমানের কাছে স্বীকার করে হান্নান।[৮]

সরকার ও বিরোধী দল

অনুসন্ধানী চোখে তাকালে আমরা দেখবো, এই ঘটনার বিভিন্ন অভিঘাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামো থেকে আরম্ভ করে রাজনীতি (ধর্মভিত্তিক, আপাত ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মনিরপেক্ষ), গোয়েন্দা সংস্থা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন, এলাকাবাসী, গণমাধ্যম ও ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বিভিন্নভাবে। বিশেষত তৎকালীন ক্ষমতাসীন ৪ দলীয় জোট সরকার এ ঘটনার নানা অভিঘাতে যেভাবে গিরগিটির মতো ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলিয়েছে তা বেশ দর্শনীয়। এর ফল হলো এই, তা আমাদের সামনে রেখে গেছে একগুচ্ছ অমীমাংসিত রহস্য এবং নানা ধরনের প্রশ্নের সম্ভার। যেমন–

১৯৯৮ থেকে ২০০৪-এর মার্চ পর্যন্ত সময়ে জেএমবি দেশজুড়ে সহিংস ও অহিংস, নানা তৎপরতা চালিয়েছে। একদিকে গেরিলা কায়দায় কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনকে টার্গেট করে হত্যা এবং বোমা হামলা চালিয়ে দ্রুত দৃশ্যপটের বাইরে চলে গেছে। অন্যদিকে চালিয়েছে সাংগঠনিক তৎপরতা, যা তাদের পরবর্তী কার্যক্রম থেকে বোঝা দুষ্কর নয়। প্রশ্ন হলো– এ সময় দেশের প্রশাসন, পুলিশ বাহিনী, বিশেষজ্ঞ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কী করছিল? কিংবা সরকারইবা কী রকম প্রতিক্রিয়া বা কর্মতৎপরতা চালাচ্ছিল? স্মরণ করা যেতে পারে যে, ২০০২ এর ৭ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ৪টি সিনেমা হলে বোমা হামলার ঘটনায় তৎকালীন সরকার ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন, রাজনীতিক সাবের হোসেন চৌধুরী, মহীউদ্দীন খান আলমগীর এবং সাংবাদিক এনামুল হক চৌধুরী জড়িত ছিলেন সন্দেহ করে তাদের গ্রেফতার ও রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ এবং শারীরিক-মানসিক নানা রকমের নির্যাতন করেছিল। কোনো ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তে না গিয়ে উক্ত ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা এবং এটাকে প্রতিপক্ষকে টিট করতে পারার একটা মওকা হিসেবে নেয়ার এ মানসিকতা, ইতোপূর্বে আমরা উদীচী বোমা বিস্ফোরণ ও হত্যা মামলার ক্ষেত্রেও দেখেছি।[৯] এমনকি, ২০০৬-এর এপ্রিলে টাইম ম্যাগাজিনে জেএমবিসৃষ্ট জঙ্গি ঘটনার বিষয়ে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার দেয়া সাক্ষাৎকারেও তাদের পারস্পরিক দোষ চাপানো চলতেই থাকলো –

শেখ হাসিনা বলছেন– These terror groups are protected by the government. This is their baby. Maybe because of pressure—domestic and international—they had to take some action. But they want to blame the opposition—us, the Awami League. *(এসব সন্ত্রাসী সরকারের মদদপুষ্ট। এ তাদেরই 'মানসপুত্র'।*

---

৭ প্র.আ., ৩ ফেব্রুয়ারি, '০৭

৮ প্র.আ., ৩ ফেব্রুয়ারি, '০৭

৯ যশোর উদীচী বোমা হামলা ও হত্যা মামলা দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপের কারণেই সম্ভবত তারা কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তারা আসলে আমাদেরই দোষী বলতে চায়)।

তার জবাবে খালেদা জিয়া বলছেন– 'No, no, it's not my baby. It's their baby.... We inherited terrorism from them.' *(না, না, আমাদের নয়; এটা তাদেরই মানসজাত।... এ জঙ্গিবাদ আমরা তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি)*।[১০]

০১ এপ্রিল '০৪ থেকে ১৭ আগস্ট '০৫ ৬৩ জেলায় বোমা হামলার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে রাজশাহী, নাটোর ও নওগাঁয় বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে গণমাধ্যম (বিশেষত পত্রপত্রিকা) নিয়মিত প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশের মাধ্যমে রাখছিল সোচ্চার ভূমিকা। তার বিপরীতে সেখানকার পুলিশ প্রশাসন, সরকারি দলের স্থানীয় সংসদ সদস্য, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রী, সরকারের শরিক জামায়াতে ইসলামী সর্বোপরি বিএনপির শীর্ষ মহল ঘটনাকে অন্যখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা এমনকি বাংলাভাইয়ের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করছিল। ১৯ আগস্ট '০৫ দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত এক মন্তব্য প্রতিবেদনে মতিউর রহমান বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী (খালেদা জিয়া) নিজেও গত বছরের (২০০৪) সেপ্টেম্বরের শুরুতে একটি ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদককে (মাহফুজ আনাম, দি ডেইলি স্টার) বলেছিলেন, বাংলা ভাই বলে কেউ নেই।' একই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০০৪ এর ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তাকে (মতিউর) 'আপনারা দেশের ধর্মীয় জঙ্গি সংগঠনের তৎপরতা সম্পর্কে অতিরঞ্জন করেন, বাড়িয়ে বলেন, আপনারা বায়াসড লেখালেখি করেন' বলে ভর্ৎসনা করেছিলেন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ৪ সেপ্টেম্বর'০৫ সাংবাদিকদের কাছে জেএমবি ও চরমপন্থি সংগঠন জনযুদ্ধ (সর্বহারা উপদল) এক হয়ে গত ১৭ আগস্ট সারা দেশে একযোগে বোমা হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেন।[১১] ২৭ সেপ্টেম্বর '০৫ তারিখে তৎকালীন ভূমি প্রতিমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু সাংবাদিকদের বলেন, 'ইংরেজি ভাই, বাংলা ভাই, নামে কে আছে না আছে তা আমার অজানা।'[১২]

২০০৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ইসলামি জঙ্গি সংগঠন শাহাদাত-ই-আল-হিকমা এবং ২০০৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি জেএমবি ও জেএমজেবিকে নিষিদ্ধ করে সরকার। অথচ ৩ এপ্রিল ২০০৬ পূর্বোক্ত টাইম ম্যাগাজিনে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, "তাদের *(জঙ্গি)* অস্তিত্বের কথা আমাদের জানা ছিল না। ১৭ আগস্টের (২০০৫) বোমা হামলার পরই কেবল জানতে পারি।"

এই সময়সীমায় এমনকি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও বাংলাভাই গ্রেফতার না হওয়ায় এবং পরবর্তীকালে ১৭ আগস্টের ঘটনা, তারপর দেশের বিভিন্ন স্থানে আত্মঘাতী বোমা হামলার পর শায়খ আবদুর রহমান কিংবা বাংলাভাইয়ের আটক না হওয়ায় সাধারণ্যে যে ধারণা ডালপালা মেলে প্রায় বিশ্বাসের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল তা হলো– এরা কখনোই গ্রেফতার হবে না এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে জেএমবি ও তৎসৃষ্ট ঘটনাবলি একটি বড় আকারের প্রশ্নবোধক চিহ্ন এবং অমীমাংসিত রহস্য হয়ে থাকবে। ঠিক তখনই সরকারযন্ত্রের চাকা দ্রুত ঘুরতে শুরু করে। একে একে ধরা পরে সবাই। এটা যেমন রহস্যময়, তেমনি আবার তাদের আটকের ঘটনাকে নাটক, তামাশা ইত্যাদি বলতেও ছাড়েনি কেউ কেউ। তাদের বিচার প্রক্রিয়া, কারাগারের বাইরে সাবজেলে রাখা এসবও প্রশ্নের উদ্রেক করেছে।[১৩]

জামায়াতের ভূমিকা

এ ঘটনায় তৎকালীন সরকারের শরিক দল জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামীর তখনকার কিছু বক্তব্য নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালে জেএমবির তৎপরতা যখন তুঙ্গে তখন তার বাংলাভাই মিডিয়ার সৃষ্টি– ধরনের উক্তি থেকে যার সূত্রপাত। এরপর ২০ আগস্ট ২০০৫ এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন– '(১৭ আগস্ট) বোমা হামলার সাথে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ', ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং আওয়ামী লীগ জড়িত'।[১৪] আবার ১১ ডিসেম্বর ২০০৫ বাংলাদেশ বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতির (ওকাব) সাথে

---

১০ TIMEasia, ৩ এপ্রিল ২০০৬

১১ ভোরের কাগজ, ৬ সেপ্টেম্বর ০৫

১২ জনকণ্ঠ, ২৮ সেপ্টেম্বর ০৫

১৩ রেহনুমা আহমেদ ও শিরিন শারমিন চৌধুরী; মত-অভিমত

১৪ ভোরের কাগজ, ৬/৯/০৫

www.pathagar.com

মতবিনিময়কালে তিনি দাবি করেন, দেশে বোমা হামলা পরিচালনাকারী জেএমবির মূল ব্যক্তিরা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নজরদারির ভেতর চলে এসেছে; এদের শিগগিরই গ্রেফতার করা যাবে।[১৫] এরপর একদিন উক্ত 'মিডিয়ার সৃষ্টি' বাংলাভাইসহ 'জেএমবির মূল ব্যক্তিরা' ধরা পড়লো, তাদের বিচার-আচার হয়ে ফাঁসির হুকুম হলো। তখনও তিনি সরকারের মন্ত্রী। জেএমবির শীর্ষ নেতৃত্বের প্রায় সবারই এবং ধৃত জেএমবি সদস্যদের অনেকেই অতীতে জামায়াত বা জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের সাথে জড়িত ছিল। বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন বিএনপির কিছু সাংসদ, মন্ত্রী ও শীর্ষস্থানীয় নেতা কর্নেল অলি আহমদ, হুইপ আশরাফ হোসেন, ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাজাহান এবং আবু হেনা জঙ্গি তৎপরতার জন্য জামায়াতকে দায়ী করে বক্তব্যও দিয়েছেন।

আফগান যুদ্ধের অভিঘাত

বাংলাদেশে এসব জঙ্গি কার্যকলাপের যারা নাটের গুরু তাদের প্রায় সবার ক্ষেত্রেই একটি মিল উপেক্ষা করার মতো নয়। সেটা হলো এদের বেশির ভাগই ১৯৭৯-৮৮ সাল জুড়ে চলা আফগান যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য গত অন্তত এক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী 'ইসলামি জঙ্গিবাদের' উত্থান ও বিকাশের সাথে জড়িতদের ক্ষেত্রে। ওসামা বিন লাদেন, মোল্লা ওমর এবং অন্যরা সবাই চলতি পরিভাষায় 'আফগান ভেটেরান'। আফগান যুদ্ধে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়ের ঘটনায় তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় লাভ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্দেহ নেই। কেননা নিজেদের মতাদর্শিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে তারা আফগানিস্তানের মাটিতে প্রায় আছড়ে ফেলে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বলা যায়। পাশাপাশি এটা, সবার অলক্ষে মুসলমানদের একটি উগ্র অংশের কাছে এ বার্তাই পৌঁছে দেয় যে, মুসলমানরা একটি পরাশক্তিকে সামরিকভাবে হারাতে পারে। অনেকে একে প্রাথমিক যুগের দিগ্বিজয়ী ইসলামের পুনরুত্থানের আলামত বলেও ভাবতে শুরু করে। বাংলাদেশের জঙ্গিরাও সেখান থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছে বলে ধারণা করা যায়।

অর্থসংস্থান

এতো সব কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য জঙ্গিদের অবশ্যই প্রচুর অর্থের সংস্থান করতে হয়েছিল। এ অর্থের উৎস কি? এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে জেএমবি সামরিক প্রধান আতাউর রহমান সানি বলেছেন– 'সারা বিশ্বব্যাপী আহলে হাদিস আন্দোলন বিস্তৃত। ইসলামের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে সেই নব্বই দশকেই বেছে নেয়া হয় বাংলাদেশকে। সেই লক্ষ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে টাকা আসতো। এছাড়াও দেশে সামর্থ আছে এমন বহু আহলে হাদিস আছে তারাও সহায়তা করতো। আমাদের এই আন্দোলনের নিজস্ব ফান্ডে দুই কোটি টাকা ছিল।'[১৬] এ বিষয় সাংবাদিক টিপু সুলতান জানাচ্ছেন– 'এক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)'র দিকে অনেকেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। এরা নানাভাবে এ দেশে জঙ্গিদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জেএমবির তৎপরতার সরেজমিন খোঁজ নিতে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ঘুরে বিশ্বব্যাপী আল কায়দার সহযোগী সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত একাধিক এনজিওর তৎপরতা ও জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেছে।'[১৭] এ কারণে কুয়েতভিত্তিক রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এখান থেকে গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য করা হয়েছে এবং এখানকার একাধিক 'শরিয়া মোতাবেক পরিচালিত' ব্যাংক ও সেখানকার কিছু কর্মীকে শাস্তি দেয়ার খবর পত্রিকা সূত্রে জানা গেছে। জঙ্গিদের অর্থের উৎস ও লেনদেনের বিষয়টি অত্যন্ত অস্পষ্ট। এ বিষয়ে নিবিড় তদন্ত হওয়া দরকার।

রোহিঙ্গাযোগ ও অন্যান্য

এই জঙ্গি দলগুলোর সাথে রোহিঙ্গা গেরিলা সংগঠনগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চোখে পড়ার মতো। আরাকানের জিহাদি সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও)র সাথে সম্পর্ক এবং সহযোগিতার কথা শায়খ আবদুর রহমান এবং মুফতি হান্নান স্বীকারও করেছেন। বিশেষত অস্ত্র, গোলা-বারুদ এবং দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বান্দরবান ও কক্সবাজারের নানা দুর্গম এলাকায় জঙ্গিদের প্রশিক্ষণে উল্লিখিত রোহিঙ্গা সংগঠনগুলো বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বলে জানা যায়। শায়খ ও

---

১৫ সংবাদ, ১২/১২/০৫

১৬ সাপ্তাহিক ২০০০ , ১০ মার্চ ০৬

১৭ জঙ্গিদের অর্থ যোগানদাতা মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক এনজিও

www.pathagar.com

হান্নানের জবানবন্দি থেকে আরও জানা যায় যে, বর্তমানে কারাগারে আটক ড. আসাদুল্লাহ গালিবের আহলে হাদিস আন্দোলন[১৮], চরমোনাইর পীর-শায়খুল হাদিস-ফজলুল হক আমিনী[১৯]দের কাছে অবিদিত ছিল না এসব জঙ্গি কার্যকলাপের অন্তত প্রাথমিক তথ্য বা আভাস। তদুপরি বিভিন্ন বিশ্বায়িত জঙ্গি সংগঠন (আল কায়দা, লস্কর-ই-তৈয়বা, জৈশ-এ মোহাম্মদ ইত্যাদি) এবং ভারতের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী, মতান্তরে স্বাধীনতাকামী সংগঠনের (উলফার নাম আলোচিত) তৎপরতা চালাবার জন্য বাংলাদেশকে প্রবেশদ্বার কিংবা পশ্চাদ্ভূমি হিসেবে ব্যবহার করার; অত্যাধুনিক অস্ত্রের সহজলভ্যতাও (চট্টগ্রাম বন্দর থেকে দশ ট্রাক অস্ত্র উদ্ধার, দেশের বিভিন্ন স্থানে অকল্পনীয় পরিমাণের অস্ত্র-গোলাবারুদ আটক করার ঘটনা দ্রষ্টব্য) এ প্রক্রিয়ার পালে বাতাস লাগাতে সচেষ্ট ছিল বলে সন্দেহ করা যায়।

বিচার প্রক্রিয়া

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো– বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জঙ্গি তৎপরতাকে দমন করা যাবে কিনা? এর সাথে উঠে আসে এদের উত্থানের প্রেক্ষিতটিকে বিবেচনার কথাও। এ বিষয়ে আইনজীবী রুহুল কুদ্দুস বাবু বলছেন '...এটা একটা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই জঙ্গিবাদের উত্থানের বীজ নিহিত আছে। তারপর এখানে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে দারিদ্র্য, তা থেকে মানুষের মধ্যে হতাশার জন্ম হয়, সে হতাশা থেকে মানুষ অদৃশ্যবাদে আক্রান্ত হয় এবং অদৃশ্যবাদ থেকে মানুষ মৌলবাদের দিকে টার্ন নেয়। সেই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো এড্রেস করার জন্য যদি উদ্যোগ গ্রহণ না করা হয়, তাহলে এখানে মৌলবাদের উত্থানের সম্ভাবনা থেকেই যাবে।'[২০] আর প্রথমোক্ত বিষয়ে রেহনুমা আহমেদ বলছেন– " মূল প্রশ্ন হচ্ছে 'বিচার প্রক্রিয়ার' মাধ্যমে 'জঙ্গি' রাজনীতির 'মূলোৎপাটন' ঘটে কিনা, সেটা। ...আমার জানা মতে, বিশ্বের কোনো দেশে এমনটা ঘটে নাই।"[২১]

এসব জঙ্গি কর্মকান্ডকে অতিমূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন করার একটা প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। সে যাই হোক না কেন, মূল বাস্তবতা হলো– আমাদের দেশে জঙ্গিবাদ ক্রিয়াশীল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আত্মঘাতী বোমা হামলার মতো চরমপন্থার আশ্রয় নেয়ার পক্ষে যেসব উপাদান দেখতে পাই, যেমন– জাতিগত স্বাধীকার আন্দোলন (শ্রীলংকার এলটিটিই), বৈদেশিক দখলদারিত্ব (ইরাক, আফগানিস্তান), জাতিগত বৈরিতা (আরব-ইহুদি, রুয়ান্ডার হুতু-তুতসি), আন্তঃধর্ম (হিন্দু-মুসলমান) এবং অন্তঃধর্ম (শিয়া-সুন্নি) হানাহানি ইত্যাদির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আমাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, প্রধানত নিজ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত এসব সশস্ত্র হামলার। কেন এই সব ঘটলো তার কারণ অনুসন্ধান করে একে মোকাবিলার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য আমাদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয়বিধ ভাবনার প্রয়োজন আছে। বর্তমান নিবন্ধটি এরকমই একটি প্রচেষ্টার অংশ।

---

১৮ প্র.আ., ৩ ফেব্রুয়ারি, '০৭
১৯ প্র.আ., ৩০ জানুয়ারি, '০৭
২০ মত-অভিমত
২১ মত-অভিমত

www.pathagar.com

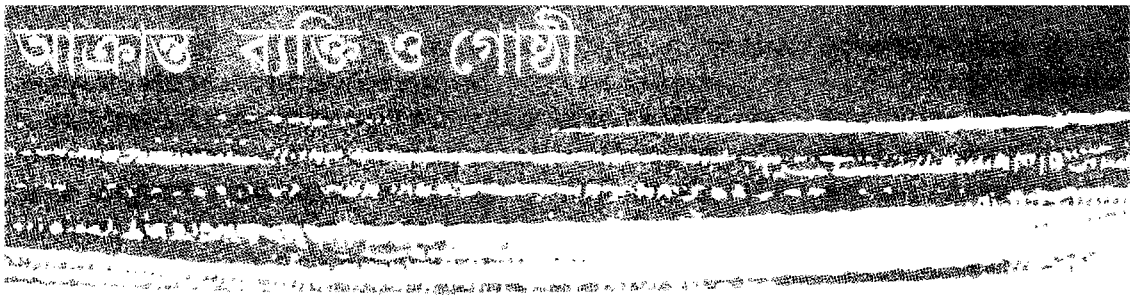

বাংলাদেশে জঙ্গি আক্রমণ নানাবিধ ছাপ ফেলে গেছে। আমাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমন্ডলে তার আঁচড় পড়েছে নানাভাবে। এর সবগুলো থেকেই হয়তো উত্তরণ সম্ভব। কিন্তু সবচে' বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে তারাই, যারা নিজেরাই আক্রান্ত হয়েছেন। সেসব ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগতভাবে যারা আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিলেন – এ অধ্যায়ে এরকম কয়েকজনের সাথে আমরা কথা বলেছি। যে দু:সময় তাঁরা পার করে এসেছেন এবং যে বেদনা তাঁরা বহন করে চলেছেন তার খানিকটা আঁচ আমরা পাবো 'আক্রান্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী'র এই সাক্ষাৎকার-পর্ব থেকে।

"প্রথম থেকেই সরকার এ ব্যাপারে সচেতন হলে এতোগুলো জীবন শেষ হতো না"

আসমা কিবরিয়া

চিত্রশিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী ও নিহত সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার স্ত্রী

আসক : কিবরিয়া হত্যা মামলার বর্তমান অবস্থা কি? আপনার কি মনে হয় বিচার প্রক্রিয়া সঠিক পথে এগুচ্ছে?

আসমা কিবরিয়া : বর্তমানে এই মামলাটি আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিন মাসের জন্য স্থগিত করেছেন সুপ্রিমকোর্ট। প্রথম থেকেই এই বিচার প্রক্রিয়া সঠিক পথে এগুচ্ছিলো না। তদন্তকারীরা যেভাবে এই তদন্তে অগ্রসর হচ্ছিলো, তাতে প্রকৃত নির্দেশদাতা ও আসল আসামি ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছে। কিছুসংখ্যক স্থানীয় লোককে ধরে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল একথা প্রমাণ করতে যে, তারা সঠিক লোকজনকে ধরেছে। তাদের মধ্যে নৈশপ্রহরী, মাইক্রোবাস ড্রাইভার ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যও রয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁর মতো একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে হত্যা করে এসব সাধারণ মানুষ কীভাবে লাভবান হবেন? তাদের স্বার্থ কি? আমার মতে, তারা ভাড়াটে খুনি, তারা কারো নির্দেশে এ কাজ করেছে। তাছাড়া যে গ্রেনেড দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, তার উৎস তো খুঁজে বের করা হয়নি।

আসক : এর সাথে জঙ্গিরা জড়িত বলে মনে করেন, নাকি এটা একটা রাজনৈতিক হত্যাকান্ড?

আ.কি : অবশ্যই এটা রাজনৈতিক হত্যাকান্ড এবং এতে অবশ্যই জঙ্গিদের সাহায্য নেয়া হয়েছে। গ্রেনেড ছোড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এতে প্রশিক্ষণ দরকার। রাজনৈতিকভাবে তাঁর মতো জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতাকে মারতে পারলে হবিগঞ্জের চারটি আসনই বিএনপি পেয়ে যাবে– এমন একটা ধারণা হয়েছিল তাদের। আওয়ামী লীগকে

www.pathagar.com

মেধাশূন্য করার একটা পরিকল্পনা তাদের ছিল।

আসক : 'শান্তির সপক্ষে নীলিমা' আন্দোলন যে প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে সেটা হলো একটা নির্মম হত্যাকান্ড, এ রকম সহিংস ঘটনা মোকাবিলায় আপনারা যে আন্দোলন করছেন তা পুরোপুরি প্রতীকধর্মী, তা কেন?

আ.কি : আমার স্বামীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমি হতবাক হয়ে গেছি। কারণ, আমি কল্পনাও করিনি তাঁর মতো একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও দেশপ্রেমিক লোককে এভাবে কেউ হত্যা করতে পারে। সব গ্রেনেড ও বোমা হামলার বিচারের জন্য এই সহিংসতার জবাবে আমি অহিংস পথই বেছে নিয়েছি; কারণ সারাবিশ্বে আজ যেভাবে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে, তা রোধ করার জন্য শান্তির পথ বেছে নেয়াই আমার বিবেচনায় শ্রেয়। হিংসা শুধু হিংসারই বিস্তার ঘটায়। হিংসার বিরুদ্ধে আন্দোলনে জনগণ যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্যই শান্তির পথ বেছে নিয়েছি। আমার বিশ্বাস, এতে জনসচেতনতা বাড়বে এবং জনগণের বিবেক আরও জেগে উঠবে। আমি সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তিকে অনেক বেশি কার্যকর বলে মনে করি। শান্তির সপক্ষে নীলিমা কর্মসূচি প্রতীকী কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ।

আসক : আপনি কি মনে করেন, এ পদ্ধতিতেই হত্যাকান্ডের বিচার পাওয়া সম্ভব?

আ.কি : জনগণের সমর্থনে যে আন্দোলন গড়ে উঠছে, তাতে যদি সরকারের টনক না নড়ে, তাহলে বুঝতে হবে সরকার জনমতের তোয়াক্কা করে না। জনগণ সচেতন হলেই সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বিচার আদায় করা সম্ভব।

আসক : বাংলাদেশে জঙ্গিদের হামলার লক্ষ্য বা কার্যকলাপের একটা বিশেষ ধাঁচ হলো বাঙালি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানা। একজন শিল্পী হিসেবে এ বিষয়ে আপনার বিশ্লেষণ কি?

আ.কি : বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানা হয়েছে বারবার। পাকিস্তানের সময় বারবার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানা হয়েছে। তাতে কোনো লাভ হয়েছে কি? বাঙালি বুকের রক্ত দিয়ে তাদের ভাষা-সংস্কৃতির অধিকার রক্ষা করেছে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর আঘাত হলে বাঙালির প্রতিবাদী চেতনা শাণিত হয়ে ওঠে। আজো তার ব্যতিক্রম হবে না। যে কোনো আঘাত রুখে দাঁড়ানোর মনোবল ও সৎসাহস আমাদের আছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আসক : আপনাদের আন্দোলনের একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো হত্যাকান্ডের বিচার নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক লবিং। তা কতোটা কার্যকর হচ্ছে বলে মনে করেন?

আ.কি : যে কোনো নাগরিকের অধিকার আছে ন্যায়বিচার পাওয়ার। কিন্তু ন্যায়বিচার করার ইচ্ছা যে সরকারের প্রথম থেকেই ছিল না, তা বারবার প্রকাশ পেয়েছে তাদের কার্যকলাপে। আমরা প্রথমেই এফবিআই'র মাধ্যমে তদন্তের দাবি জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, স্থানীয়ভাবে তদন্ত সঠিক হবে না। স্থানীয় তদন্তকারীরা সরকারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। কিন্তু এফবিআই যখন এসেছিল, তখন সরকার কোনো সহযোগিতা করেনি। পরে ইউএন-এর তদন্ত টিম আনার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি; কিন্তু এজন্য এখনো অনেক কাজ করতে হবে।

আসক : আমাদের সামনে খোদ ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর হামলার যথাযথ বিচার না হওয়ার নজির থাকা সত্ত্বেও কি আপনি আশাবাদী যে, এটা যথেষ্ট সাহায্য করবে?

আ.কি : ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর হামলার পর ব্রিটিশ সরকারের কোনো তৎপরতা আমরা দেখিনি। সম্প্রতি লন্ডনের পত্রপত্রিকায় একজন জামায়াত নেতার লন্ডন সফর নিয়ে যেসব খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে অনুমান করা যায় কেন ব্রিটিশ সরকার কোনো চাপ দেয়নি।

আসক : জেএমবির শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিরা ধরা পড়েছে। এখন তাদের বিচারও চলছে। কিছু মামলার রায়ও হয়েছে। তাদের গ্রেফতার এবং বিচারের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনার মতামত কি?

আ.কি : জেএমবির শীর্ষস্থানীয় লোকেরা ধরা পড়েছে এটা ঠিক, তবে তাদের বিচার প্রক্রিয়া যেভাবে চলছে, তাতে কতোদিনে যে এটা শেষ হবে বলা মুশকিল। আমার মতে, এভাবে জঙ্গিদের বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করা ঠিক নয়। নির্বাচন সামনে রেখে এদের বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করা উচিত নয়। নির্বাচনে এদের ভূমিকা কী হবে, তা নিয়ে জনগণ শঙ্কিত।

আসক : জঙ্গিবাদের উত্থান থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের সরকারের ভূমিকাকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

আ.কি : আমি মনে করি, প্রথম থেকেই সরকার এ ব্যাপারে সচেতন হলে এতোগুলো জীবন শেষ হতো না। আমার স্বামী এটা অনুমান করেছিলেন যে, এখানে জঙ্গি সংগঠন তৎপর রয়েছে। কিছু কিছু মাদ্রাসার ছত্রছায়ায় জঙ্গি সংগঠন গড়ে ওঠার সংবাদ কি সরকার জানতো না? সরকার এতো উদাসীন ছিল কেন? এর কারণ খুঁজে বের করা দরকার। তা না হলে নির্বাচনের সময় এসব জঙ্গিকে নানাভাবে ব্যবহার করা হবে বলে আমার বিশ্বাস। জঙ্গিদের সহিংসতা ছড়িয়ে পড়বে। কতো

www.pathagar.com

লোককে যে আরও প্রাণ দিতে হবে তার ইয়ত্তা নেই। এই রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার আমি ও আমার পরিবার। কাজেই আমি চাই না এ রকম বোমা-গ্রেনেড হামলা আরও ঘটুক।

আসক : বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী তৎপরতা কি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের একটি অংশ, নাকি একান্তই একটি বিচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ ব্যাপার? আপনার মতামত কি?

আ.কি : বাংলাদেশের জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদের কিছু সম্পর্ক আছে বৈকি! এদের অভ্যন্তরীণভাবে উৎসাহ জোগানো হয়েছে ও সহযোগিতা করা হয়েছে। আফগানিস্তানে তালেবান প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু জঙ্গি এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। ধারণা করা হয়, তালেবানদের সঙ্গে শায়খ রহমান ও সিদ্দিকুল ইসলামদের যোগসূত্র রয়েছে। কঠোর হস্তে দমনের মাধ্যমেই এই জঙ্গিবাদ নির্মূল করা সম্ভব।

সাক্ষাৎকার প্রদানের তারিখ: ২৩ জুলাই ২০০৬

"আমি হল ত্যাগ করার ৫ মিনিট পর বোমাটি বিস্ফোরিত হয়"

মোঃ শহীদুল আলম
অ্যাডভোকেট, গাজীপুর জেলা বার

আসক : গাজীপুর বার লাইব্রেরিতে যে আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়েছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন কি?

মো: শহীদুল আলম : গত ২৯ নভেম্বর ২০০৫ সালে আইনজীবী সমিতি ভবনে দ্বিতীয় হলরুমে ৯টা ৪০ মিনিটে জেএমবি কর্তৃক আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়। ওই হলরুমে ৫৬ জন আইনজীবী নিয়মিত বসে তাদের আইন পেশার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রথম দরজার প্রথম টেবিলে আমার বসার স্থান এবং আমার সামনে দ্বিতীয় টেবিলের ডান পাশে অ্যাডভোকেট আমজাদ হোসেনের কাছে বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ৯টা ৪০ মিনিটে আইনজীবীদের উপস্থিতি কম ছিল এবং ৯টা ৩০ মিনিটে অতিরিক্ত সহকারী জজ জেবুন নাহার আয়েশা এজলাসে ওঠার প্রেক্ষিতে ৯টা ৩৫ মিনিটে একটি মোকদ্দমা শুনানি করার জন্য আমি কোর্টে চলে যাই। আমি হল ত্যাগ করার ৫ মিনিট পর বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। জেএমবির আত্মঘাতী সদস্য আইনজীবীর পোশাক পরে ব্যাগের মধ্যে বোমাটি বহন করে দ্রুতগতিতে হলরুমে প্রবেশ করে বিস্ফোরণ ঘটায় এবং নিজেও নিহত হয়। তার কোমরে বৈদ্যুতিক তার পেঁচানো ছিল। আহত সব আইনজীবী ও মক্কেলদের গাজীপুর সদর হাসপাতালে নেয়ার পর জরুরি ভিত্তিতে সবাইকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ওই ঘটনায় অ্যাডভোকেট আমজাদ হোসেন, অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল আজম, অ্যাডভোকেট গোলাম ফারুক ও অ্যাডভোকেট নুরুল হুদা এবং ৩ জন মক্কেল মৃত্যুবরণ করেন। আহত আইনজীবীদের বিভিন্ন হাসপাতালে ২-৩ মাস চিকিৎসা করার পর তারা বর্তমানে কাজে যোগদান করেছেন। তবে এখনো বিভিন্ন রকম পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়া অ্যাডভোকেট রমিজ উদ্দিন এখনো সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন এবং তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আসক : এ ব্যাপারে যে মামলাগুলো হয়েছিল সেগুলোর বর্তমান অবস্থা কি?

শ.আ : মামলায় অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং বর্তমানে বিচারাধীন আছে।

আসক : ঘটনায় নিহতদের পরিবার এবং আহত/পঙ্গু হয়ে যাওয়াদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলুন।

শ.আ : ঘটনায় নিহত আইনজীবীদের পরিবারকে গাজীপুর আইনজীবী সমিতি ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বেনাভোলেন্ট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন আইনজীবী সমিতি থেকে প্রেরিত অনুদান নিহতদের পরিবারকে ও আহত আইনজীবীদের মধ্যে সঠিকভাবে বিতরণ করা হয়েছে। নিহত অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল আজমের স্ত্রীকে ডাচ্ বাংলা ব্যাংকে ও অ্যাডভোকেট গোলাম ফারুকের স্ত্রীকে আইএফআইসি ব্যাংকে

www.pathagar.com

ব্যারিস্টার রফিকুল হকের উদ্যোগে চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে আহত আইনজীবীদের শরীরে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া থাকায় তারা সম্পূর্ণভাবে সুস্থ নন।

আসক : হামলার লক্ষ্য হিসেবে গাজীপুরকে বেছে নেয়ার কোনো কারণ আছে বলে মনে করেন? এর আগে হামলার কোনো হুমকি দেয়া হয়েছিল? দিয়ে থাকলে কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল কি?

শ.আ : গাজীপুর জেলা রাজধানী ঢাকার সন্নিকটে অবস্থিত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো। অনেক রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাও অবস্থিত। এছাড়া গাজীপুর সদর উপজেলায় ৫-৬টি গ্রামে আহলে হাদিস মতবাদীদের বসতি আছে এবং আহলে হাদিস মতবাদীদের পরিবারবর্গের কিছু সদস্য জেএমবির সাথে জড়িত। হুমকি দেয়া হয়েছিল বলে শোনা যায়। তবে আইনজীবী সমিতি ভবনে কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। শুধু জেলা জজ আদালতের গেটে পুলিশি প্রহরা ছিল।

আসক : 'আল্লাহর আইন চাই' শ্লোগান তুলে তারা বিচারক, আইনজীবী ও আদালতকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। একজন আইনজীবী হিসেবে এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

শ.আ : জামায়াতে ইসলামীর অগ্রযাত্রায় জেএমবির ধর্মান্ধরা উৎসাহিত হয়। এই শ্লোগানের উদ্ভাবকরা ধর্মান্ধ, ভন্ড, ধর্মব্যবসায়ী এবং ধর্মের নামে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য আদালত অঙ্গনে বোমা হামলা চালায় বলে আমার ব্যক্তিগত মতামত এবং আমি এর কঠোর নিন্দা করি।

আসক : জেএমবির শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিরা ধরা পড়েছে। এখন তাদের বিচারও চলছে। কিছু মামলার রায়ও হয়েছে। তাদের গ্রেফতার এবং বিচারের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনার মতামত কি?

শ.আ : জঙ্গিদের সংঘবদ্ধ আক্রমণ পুলিশ প্রতিহত করতে পারেনি। তবে নেতাসহ অন্যদের গ্রেফতার করা হলেও নেতৃস্থানীয় জঙ্গিদের অনেকেই মুক্তি পেয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া যথাযথ হয়নি। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করা যেত।

আসক : শীর্ষ জঙ্গিদের এই বিচার প্রক্রিয়া তাদের মূলোৎপাটনে কতোটা সহায়ক বলে মনে করেন?

শ.আ : বর্তমান বিচার প্রক্রিয়ায় এই জঙ্গিবাদ দমন করা সম্ভব নয়। মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান, অঙ্ক, চিকিৎসা, কম্পিউটারসহ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা প্রয়োজন। এছাড়া বিশ্বের মুসলিম কমিউনিটির দরিদ্রতা দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আসক : জঙ্গিবাদের উত্থান থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের সরকারের নীতি/আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ভূমিকাকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

শ.আ : বর্তমান সরকার জঙ্গি দমনে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কার্যক্রম যথেষ্ট ও সাবলীল নয়।

আসক : কারো কারো অভিযোগ, জোট সরকারে যেহেতু জামায়াতে ইসলামী আছে সে কারণে সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গি সংগঠনগুলো নির্বিঘ্নে এতোটা তৎপর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আপনি কী মনে করেন?

শ.আ : জামায়াতে ইসলামী সরকারের শরিক হতে পারায় ধর্মান্ধদের ক্ষমতালিপ্সু করে তুলেছে বলে আমার ব্যক্তিগত মতামত।

আসক : দেখা গেল যে, বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা আকস্মিকভাবে শুরু হয়ে একেবারে শীর্ষে উঠে গিয়ে হঠাৎ করে আবার শেষ হয়ে যায়। এই নাটকীয় ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখছেন?

শ.আ : বিশ্ব মুসলিম কমিউনিটির ওপর ইসরাইলের অত্যাচার এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ কতক দেশের পক্ষপাতিত্ব বাংলাদেশের মুসলমানদের স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধ করেছে। তবে বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদের শুরু ৭-৮ বছর যাবৎ লক্ষণীয়। এখানে নাটকীয়তার কিছু নেই বলে আমি মনে করি।

আসক : বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী তৎপরতায় জেএমবি ছাড়াও অনেক জঙ্গি সংগঠনের সংশ্লিষ্টতা দেখা গেছে। কিন্তু এখন জেএমবি ছাড়া অন্যরা বিচার প্রক্রিয়া/আলোচনায় তেমন নেই। বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

শ.আ : জেএমবি সুসংগঠিতভাবে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট বোমা হামলা চালায় এবং পরে আদালতে বিচারক এবং আইনজীবী হত্যা করে। কিন্তু অন্যান্য জঙ্গি সংগঠন তেমন কিছু করতে পারেনি।

আসক : বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী তৎপরতা কি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের একটি অংশ, নাকি একান্তই একটি বিচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ ব্যাপার? আপনার মতামত কি?

শ.আ : সাম্প্রতিক কোনো হামলাই বিচ্ছিন্ন নয়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সাথে জেএমবির সংশ্লিষ্টতা এখনো

www.pathagar.com

প্রমাণিত হয়নি। তবে ওহাবি মতাদর্শী কুয়েতি এনজিওর অর্থায়নে আহলে হাদিস মতবাদীদের এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এবং তাদের অর্থায়নে জঙ্গিদের উৎসাহিত করেছে বলে আমার ব্যক্তিগত মতামত।

সাক্ষাৎকার প্রদানের তারিখ : ৩০ জুলাই ০৬

"বাঙালি সংস্কৃতিচর্চাকে স্তব্ধ করে দেশকে বর্বরতার চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নেত্রকোনা এবং উদীচীকে বেছে নেয়া হয়েছে"

সানোয়ার হোসেন ভুঁইয়া
সাধারণ সম্পাদক, উদীচী, নেত্রকোনা

আসক : নেত্রকোনা উদীচীর ওপর যে আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়েছিল সে সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলুন।

সানোয়ার হোসেন ভুঁইয়া : ৯ ডিসেম্বর নেত্রকোনা মুক্ত দিবস উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের কথা ছিল। এর মহড়া তিনদিন ধরেই উদীচী ভবনে করা হচ্ছিল। অনুষ্ঠানের আগের দিন বিধায় সকালেও মহড়ার কথা ছিল। এরই প্রস্তুতিপর্বে উদীচী ভবনকেন্দ্রিক সংস্কৃতিকর্মীদের যাতায়াতের সময় উদীচী ভবনের উত্তর কোণে মঞ্চের সোজাসুজি বাইরের দিকে লাল টেপ মোড়ানো একটি বড় বোমা দৃষ্টিগোচর হয়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সারা শহরময় ছড়িয়ে পড়ে, উদীচী অফিসের সামনে বোমা পাওয়া গেছে। প্রচুর উৎসুক জনতা বোমা দেখতে ভিড় জমায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার প্রস্তুতি নিলে উদীচীর ভাইবোনেরাও তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে। অনেক কৌশলে সকাল ১০টার কিছু আগেই বোমাটি নিষ্ক্রিয় করা হয়। বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার পর আমরা (উদীচীর ভাইবোনেরা) আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম ও করণীয় নিয়ে উদীচীর সামনে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছিলাম। আমরা শত ভয়ভীতি উপেক্ষা করে জেলা উদীচীর কার্যক্রম এবং উদীচী পরিচালিত সঙ্গীত বিদ্যানিকেতনের ক্লাস চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। নানা ধরনের আলোচনা শেষে সন্ধ্যায় উদীচীতে সবাই আসার কথা বলে যখন যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, ঠিক তখনই সাইকেলে করে এক কিশোর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পুলিশ তাকে বাধা দিলে সে তখনই আত্মঘাতী বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটায়। এটি প্রথম বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার ৪০ মিনিটের মধ্যেই বিস্ফোরিত হয়।

আসক : সে ঘটনায় যে মামলাগুলো হয়েছিল সেগুলোর বর্তমান অবস্থা কি?

সা.হো.ভু : সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলাভাই ও তার স্ত্রী, আতাউর রহমান সানীসহ ধরা পড়া শীর্ষ জঙ্গিদের আসামি করে আদালতে চার্জশিট প্রদান করা হয়েছে।

আসক: এ ঘটনায় নিহতদের পরিবার এবং আহত/পঙ্গু হয়ে যাওয়াদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলুন।

সা.হো.ভু : আত্মঘাতী বোমা হামলায় আত্মঘাতীসহ আটজন নিহত ও ষাটোর্ধ্ব জন আহত হয়। নিহতদের মধ্যে আমাদের উদীচীর সহ-সাধারণ সম্পাদক খাজা হায়দার ও সাংগঠনিক সম্পাদক সুদীপ্তা পাল শেলী ছিলেন তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আর অন্য যারা নিহত হয়েছেন তাদের মধ্যে পুলিশের দারোগার স্ত্রী ছাড়া সবাই দিনমজুর। তাদের পরিবারগুলো একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটিকে হারিয়ে দারুণ অর্থকষ্টে ভুগছে। রইছউদ্দিনের স্ত্রী তো ৪টি মেয়ে নিয়ে পথে পথে ঘুরছে।

হায়দারের স্ত্রী শাহনাজ বেগমকে হায়দারের কর্মস্থল আইডিতে কাজ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শেলীর পরিবারে কাজ করার মতো কোনো লোক নেই। আহতদের মধ্যে উদীচীর ৯ জন এবং পুলিশ সদস্যের ৯ জন ছাড়া সবাই খেটে-খাওয়া মানুষ। অনেক পরিবার তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটিকে হারিয়ে গত আট মাস ধরে প্রচুর অর্থ এবং মানসিক কষ্টে ভুগছে।

অনেকেই তাদের বসতভিটা বিক্রি করে আহত সদস্যের চিকিৎসা করছে। অনেকের শরীরের বিভিন্ন স্থানে এখনো

www.pathagar.com

স্প্লিন্টার রয়েছে। অনেককেই উন্নত চিকিৎসার জন্য ডাক্তাররা দেশের বাইরে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেছেন।

আমার ভোকাল কর্ডে ১টি এবং আমাদের সহ-সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমানের বুকে ১টি স্প্লিন্টার আছে, যা ভবিষ্যতের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া মুন্না দেবনাথ নামের ছেলেটির নতুন করে ইনফেকশন হয়েছে। আহত ১ জন পুলিশ সদস্যের বাম চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ডান চোখেও দেখতে সমস্যা হচ্ছে।

আসক : হামলার লক্ষ্য হিসেবে নেত্রকোনাকে বেছে নেয়ার কোনো কারণ আছে বলে মনে করেন? এর আগে হামলার কোনো হুমকি দেয়া হয়েছিল? দিয়ে থাকলে কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল কী?

সা.হো.ভু : বাংলাদেশের মধ্যে নেত্রকোনা ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক এলাকা, এই এলাকার জনগোষ্ঠী অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রগতিমুখী সংস্কৃতিমনা, যার একটা অতীত ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের।

নেত্রকোনার সাংস্কৃতিক মূলধারা উদীচীকেন্দ্রিক। মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন, বিশ্ব বিবেকবান, আধুনিক ও সংস্কৃতিমনা নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে উদীচী দীর্ঘদিন ধরে নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বাঙালি সংস্কৃতিচর্চাকে স্তব্ধ করে দেশকে বর্বরতার চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নেত্রকোনা এবং উদীচীকে বেছে নেয়া হয়েছে। এর আগে আমাদের এ ধরনের হামলার কোনো হুমকি দেয়া হয়নি।

আসক : বাংলাদেশে জঙ্গিদের হামলার লক্ষ্য বা কার্যকলাপের একটা বিশেষ ধাঁচ হলো বাঙালি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানা। একজন সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে এ বিষয়ে আপনার বিশ্লেষণ কী?

সা.হো.ভু : আমি মনে করি বাঙালি সংস্কৃতি বিভিন্ন মানুষের মানবিক মূল্যবোধসহ সর্বদাই অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে বিকশিত করে, যা উগ্র মৌলবাদী চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী। এ কারণেই বাঙালি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানা তাদের অন্যতম লক্ষ্য।

আসক : যাদবকে 'হিন্দু জঙ্গি' আখ্যা দিয়ে জল ঘোলা করার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সরকারি মহল থেকে তার পরিবারকে হেনস্তা, বর্তমান অবস্থা এবং এলাকার প্রতিক্রিয়া এসব নিয়ে কিছু বলুন।

সা.হো.ভু : সরকারি উচ্চমহল থেকে যাদবকে হিন্দু জঙ্গিবাদী আখ্যা দেয়ায় স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা যাদবকেন্দ্রিক তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত থাকে, যে কারণে স্থানীয়ভাবে জঙ্গিদের আস্তানার কোনো সন্ধান মেলেনি আজ পর্যন্ত। যার ফলে যাদবের পরিবারের ওপর নানা নির্যাতন নেমে আসে। সাময়িকভাবে হলেও দরিদ্র পরিবারটি নানা বিপদের সম্মুখীন হয়। সর্বজন পরিচিত খেটে-খাওয়া যাদবকে জঙ্গি ঘোষণায় এলাকার সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এ বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। বর্তমানে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী যাদবের মৃত্যুতে পরিবারটি বৃদ্ধ পিতামাতাসহ সবাই কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করছে।

আসক : জেএমবির শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিরা ধরা পড়েছে। এখন তাদের বিচারও চলছে। কিছু মামলার রায়ও হয়েছে। তাদের গ্রেফতার এবং বিচারের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনার মতামত কী?

সা.হো.ভু : জঙ্গিদের গ্রেফতার প্রক্রিয়াটি রহস্যজনক এবং বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত হলেও মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত জঙ্গিদের প্রতি সরকারি মহলের আচরণ ও ব্যবস্থাপনা মামলার রায়ের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সন্দেহের উদ্রেক করে।

আসক : শীর্ষ জঙ্গিদের এই বিচার প্রক্রিয়া তাদের মূলোৎপাটনে কতোটা সহায়ক বলে মনে করেন?

সা.হো.ভু : শীর্ষ জঙ্গিদের বিচার প্রক্রিয়া এবং রায়ের প্রেক্ষাপটে সাময়িকভাবে এদের কার্যক্রম স্তিমিত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে শীর্ষ জঙ্গিদের 'শুরা'র অনেক নেতাই গা ঢাকা দিয়েছে এবং এদের কার্যক্রম ধর্মভিত্তিক হওয়ায় ও তৃণমূল পর্যায়েও বিস্তৃত থাকায় পুরোপুরি মূলোৎপাটন সম্ভব হবে না বলে মনে হয়। সময়-সুযোগে এরা সংগঠিত হয়ে আবার আঘাত হানতে পারে।

আসক : জঙ্গিবাদের উত্থান থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের সরকারের নীতি/আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ভূমিকাকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

সা.হো.ভু : জঙ্গিবাদের শীর্ষনেতারা দীর্ঘদিন যাবৎ উত্তরবঙ্গে সরকারি দলের মন্ত্রী-এমপিদের মদদে এবং ছত্রছায়ায় প্রশাসনের সহযোগিতায় চরমপন্থি অভিযোগে নৃশংসভাবে হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। খবরের কাগজে কিংবা বিভিন্ন মিডিয়ায় এগুলো প্রচার হলেও এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের অভিযোগ সত্ত্বেও সরকার এসব ঘটনার প্রতিকার না করে প্রশ্রয় প্রদান করে। এক সময় নানা সংগঠনের নামে জঙ্গিদের কার্যকলাপের দেশব্যাপী বিস্তৃতি ঘটে।

বিদেশী বৃহৎ শক্তিগুলো এবং বিরোধী দলের চাপে বাধ্য হয়ে জঙ্গি শীর্ষনেতাদের নাটকীয়ভাবে আটক করে বিচারের নামে আইন প্রণয়ন করলেও এর মধ্যে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। কেননা জঙ্গিদের সঙ্গে সরকারি দলের নেতৃস্থানীয় বেশ কিছু

www.pathagar.com

নেতাকর্মী ও সরকারের শরিক মৌলবাদী দলগুলোর নেতৃত্বের যোগসাজশ রয়েছে।

আসক : কারো কারো অভিযোগ, জোট সরকারে যেহেতু জামায়াতে ইসলামী আছে সে কারণে সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গি সংগঠনগুলো নির্বিঘ্নে এতোটা তৎপর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

সা.হো.ভু : জামায়াত সরকারে থাকায় জঙ্গি সংগঠনগুলো তাদের উত্থান খুব দ্রুত ঘটাতে সক্ষম হয়েছে এবং নির্বিঘ্নে তাদের সব কার্যক্রম চালাতে পেরেছে।

আসক : দেখা গেল যে, বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা আকস্মিকভাবে শুরু হয়ে একেবারে শীর্ষে উঠে গিয়ে হঠাৎ করে আবার শেষ হয়ে যায়। এই নাটকীয় ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখছেন?

সা.হো.ভু : সরকারি দল মৌলবাদী দলগুলোর যোগসাজশে বিরোধী দলের কার্যকলাপকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য ধর্মের নামে জঙ্গিবাদের সৃষ্টি করে, পরে তা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিদেশী বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রচন্ড চাপে বাধ্য হয়ে মৌলবাদী জঙ্গিদের নাটকীয়ভাবে গ্রেফতার করে তাদের কার্যক্রম আপাতত বন্ধ করা হয়েছে। প্রয়োজনে আবার তাদের নতুন করে সৃষ্টিও করা হতে পারে।

আসক : বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী তৎপরতা কি আন্তর্জাতিক 'সন্ত্রাসবাদের' একটি অংশ নাকি একান্তই একটি বিচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ ব্যাপার? আপনার মতামত কী?

সা.হো.ভু : জঙ্গিবাদ তৎপরতা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের একটি অংশ বলে মনে করি। জঙ্গি শীর্ষ নেতাদের অনেকেই আফগানিস্তানে তালেবানি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং সেখানে যুদ্ধও করেছে। মৌলবাদী গোষ্ঠী আমাদের দেশে রাজপথে মিছিল করে 'আমরা হবো তালেবান, বাংলা হবে আফগান'– এ ধরনের শ্লোগান দিয়েছে। সুতরাং এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদেরই একটা অংশ।

আসক : জঙ্গি হামলার পর আপনারা কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। এ কর্মসূচিগুলো কীভাবে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারে?

সা.হো.ভু : আমরা আমাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদবিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন করে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। যেগুলোর মধ্যে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত মিছিল, প্রতিবাদী পথনাটক, গণসঙ্গীত ও লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক অন্যতম। আমরা মনে করি, বাঙালি সংস্কৃতিচর্চার ব্যাপকতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। বাঙালি সংস্কৃতি বিকশিত করে দেশে মুক্তবুদ্ধি, বিশ্ববিবেক সম্পন্ন, অসাম্প্রদায়িক নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং এ লক্ষ্যেই আমাদের কর্মসূচি চলবে।

সাক্ষাৎকার প্রদানের তারিখ: ৩১ জুলাই ২০০৬

"আমাদের সোনার সংসারটা একবারে ভাইংগা দিয়া গেছে"

সত্যেন চন্দ্র দাস
নিহত যাদবের বাবা

২০০৫ সালের ৮ ডিসেম্বর সকাল ১০টা। নেত্রকোনার বৃচাপারকোনা গ্রামের ছেলে মোটর সাইকেল মেকানিক যাদব চন্দ্র অন্য উৎসাহী দর্শকদের মতোই উৎসাহী হয়ে দেখতে গিয়েছিল উদীচী অফিসের সামনে বোমা পাওয়ার পরবর্তী দৃশ্য। সেই উৎসাহই কাল হয়ে দাঁড়ালো তার জীবনে এবং তার পরিবারে। ৮ ডিসেম্বর আনুমানিক সকাল ৭টায় নেত্রকোনা উদীচী অফিসের সামনে একটি বোমা পাওয়া যায়। খবর পেয়ে উদীচীর কর্মী ও নেত্রকোনার কৌতূহলী সাধারণ মানুষ সেখানে যায় উদ্ধারকৃত বোমা দেখতে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়। বোমা দেখতে আসা ২২ বছরের

www.pathagar.com

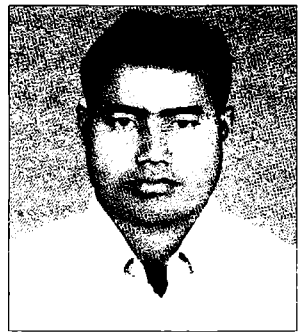

যাদব চন্দ্র দাস

কৌতূহলী যুবক যাদব তার এক মুহূর্ত আগেও হয়তো ভাবতে পারেনি আর একটি বোমার আঘাতে সে চলে যাবে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে। বাবা সত্যেন চন্দ্র দাস ও মা আরতী রানী দাসের তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে যাদব চন্দ্র দাস সবচেয়ে ছোট। বড় ভাই বিপ্লব কুমার দাস কাজ করতেন একটি অলিম্পিক বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে। বিয়ে করেছেন প্রায় ছয় মাস হলো। বোন দীপা রানী জোয়ার্দার ঢাকায় একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত আছেন। স্বামীসহ তিনি সেখানেই থাকেন। একমাত্র যাদবই থাকতো বাবা-মার সাথে। বাবা-মার যাবতীয় দেখাশোনা যাদবই করতো।

২০০৬-এর ২১ জুলাই আমি যাই যাদবের বাড়িতে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে। সেদিন সারাদিন ছিল অঝোরে বৃষ্টি। বৃষ্টি মাথায় করে নেত্রকোনা উদীচীর দুই কর্মী আমাকে নিয়ে যায় যাদবের বাড়িতে। নেত্রকোনা সদর থেকে প্রায় ১ ঘণ্টা টেম্পোতে করে আমরা নামি বারহাট্টা বাজারে। সেখানে যাদবের বাড়ি সবার কাছে এখন পরিচিত 'বোমা হামলা' বাড়ি হিসেবে। রিকশাচালক আমাদের নিয়ে যায় বৃচাপারকোনা স্কুল মাঠ পর্যন্ত। কারণ ওইটিই ছিল রিকশার শেষ রাস্তা। সে আমাদের দেখিয়ে দেয় যাদবের বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা। হাঁটু পানি ও কাদা পার হয়ে প্রায় একঘণ্টা পায়ে হেঁটে আমরা খুঁজে পাই যাদবের বাড়ি। মেঘলা আকাশের মাঝে দূর থেকে বাড়িটি দেখে মনে হচ্ছিল সুনসান। একধরনের শূন্যতা এবং শোক বাড়িটিকে গ্রাস করে আছে। যখন বাড়িতে আমরা ঢুকলাম সেই শূন্যতা এবং শোকের সঙ্গে যোগ হলো আহাজারি। সেই আহাজারি সন্তানহারা মায়ের আহাজারি। যাদবের মা আরতী রানী যাদবের মৃত্যুর পর সারাদিন গীতা এবং যাদবের ছবি সামনে নিয়ে পূজার ঘরে বসে থাকেন। তাঁর এখন একমাত্র সঙ্গী গীতা, যাদবের ছবি এবং কান্না– "আমার যাদবরে আমি আমার ভগবানের সাথে রাখছি। সে ভগবানের কাছে স্বর্গে আছে।" এই সান্ত্বনা নিয়েই আরতী রানী বেঁচে আছেন। পঞ্চাশোর্ধ্ব আরতী রানী কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারাতে বসেছেন। সারাদিন মাথার যন্ত্রণায় ভোগেন। পূজার ঘর থেকে বের হয়ে আমরা বসলাম বাড়ির বারান্দায়। আমি এখানে আসার উদ্দেশ্য বললাম। যাদবের মৃত্যুর পর বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও সাংবাদিকরা এসেছেন এবং ফোন করেছেন। বড় বোন দীপা রানী সবার ফোন নম্বর এবং নাম সংরক্ষণ করে রেখেছেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে এসেছি শুনে তিনি ডায়েরি বের করে আমাকে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ইলা চন্দের নাম বললেন, যিনি যাদবের মৃত্যুর পরে ফোন করে খবর নিয়েছিলেন। পরিবারের বর্তমান অবস্থা জানতে চাইলাম, তখন যাদবের বাবা সত্যেন চন্দ্র দাস দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এখন তার পরিবারে কোনো উপার্জন নেই। অল্প কিছু জমিজমা যা ছিল তা থেকে যা আসে তাই দিয়ে চলে সংসার। সত্যেন চন্দ্রের পরিবার চলতো তাঁর দুই ছেলের উপার্জন থেকে। যাদব চলে যাওয়ার পর থেকে অলিম্পিক কোম্পানিতে চাকরিরত ভাই বিপ্লবকেও আর চাকরি করতে দেন না মা– এই ছেলেটিকেও হারানোর ভয়ে। এখন এই পরিবারটি দিনাতিপাত করছে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার মধ্য দিয়ে। আরো জানতে পারলাম, বাড়িতে চুলা জ্বলে কদাচিৎ। পাড়া-প্রতিবেশী এবং যাদবের বাবা ও ভাই যেদিন রান্না করেন সেদিন চুলা জ্বলে, না হলে রান্না-খাওয়া এবং সংসারের অন্যান্য কাজ বন্ধই থাকে।

"আমাদের সোনার সংসারটা একবারে ভাইংগা দিয়া গেছে"– এই রকম করেই ভাবেন এখন যাদবের বাবা। এরপরে ভাই বিপ্লব আমাদের কাছে বর্ণনা করেন ভয়ঙ্কর সেই সময়ের কথা, যে সময় তাদের পরিবারকে করে দিয়েছে এলোমেলো। যাদব বোমা হামলায় নিহত হয় ৮ ডিসেম্বর সকাল ১০টায়। একদিকে যাদবের মৃত্যু, অন্যদিকে বোমা হামলাকারী হিসেবে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক মৃত যাদবকে জঙ্গি চিহ্নিত করা– সব মিলিয়ে এই পরিবারটি বিভীষিকাময় দিন অতিবাহিত করেছে। ঘটনার দিন রাত ১০টার সময় পুলিশ যাদবের ভাই এবং বাবাকে ধরে নিয়ে যায় থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। থানায় তাদের দু'জনকে দু'দিন আটকে রাখা হয়। প্রথমদিন দু'জনকে পুলিশ ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে। যাদব জঙ্গি ছিল কিনা, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল কিনা এসব। শুধু যাদবের পরিবারই নয়, তাদের যত আত্মীয়-স্বজন আছে তারাও এই দুর্ভোগ থেকে রেহাই পায়নি। সেই রাতে যাদবের প্রায় সব আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা পুলিশ সংগ্রহ করে তাদের বাড়িতেও যায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে। সেই রাতেই র‍্যাব আসে যাদবের বাড়ি সার্চ করতে। ঘরের সিলিং থেকে শুরু করে আশপাশে এমন জায়গা নেই যে তারা উল্টেপাল্টে দেখেনি। সন্তান হারানোতে শোক করাতো দূরের কথা, ছেলে ও স্বামীকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টাতেই প্রাণপাত করতে হচ্ছিলো আরতী রানীকে। কান্না আর শোক কাকে বলে সেই

www.pathagar.com

রাতে ভুলেই গিয়েছিলেন এই পরিবারের সবাই র‍্যাব ও পুলিশের জেরার মুখে। দু'দিন থানায় থাকার পর পুলিশ বাবা এবং ভাইকে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দেয়ার সময় তাদের বলা হয় যে, উপর থেকে আরো টিম আসবে, তারপর আবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো টিম আর আসেনি, জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশ্যে তাদের ডাকও পড়েনি।

যাদবের মৃত্যুর পরদিন পুলিশ সকাল ৯টায় পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করে। প্রিয় সন্তানের শেষকৃত্য সম্পাদনটাও করতে হয়েছে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায়। কাছের কিছু আত্মীয়-স্বজন আসে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে। পুলিশি হয়রানির ভয়ে তাদের অনেকেই শ্মশান থেকে স্নান না করেই ফিরে যায় বাড়িতে। ধর্মীয় বিধান মতে, মৃত্যুর চারদিন পরে শ্রাদ্ধ করার নিয়ম থাকলেও সেই কাজটি সময়মতো করতে পারেননি তারা। একদিকে স্বজন হারানোর বেদনা, অন্যদিকে পুলিশি হয়রানি এই অবস্থা বর্ণনা করতে যাদবের মায়ের আহাজারিতে পরিবেশ ভারি হয়ে ওঠে। তাঁর কাছে এখনো মনে হয় সেই সময়টির আগে যদি তাঁর মৃত্যু হতো তাহলে হয়তো এ অবস্থায় তাঁর পড়তে হতো না। এই পরিবারটি কী করবে, কার কাছে যাবে তার কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পায়নি। যাদের কাছে যাবে সাহায্যের জন্য তারাও তো নিজেদের পুলিশি হয়রানি থেকে রক্ষা পেতে পথ খুঁজছিল। ভয়ে পাড়া-প্রতিবেশী কেউ বাড়িতে আসার সাহস পায়নি। দূর থেকে শুধু পরামর্শ দিয়েছে যাদবের মাকে কান্নাকাটি না করার জন্য। তাদের মনে হয়েছে, কাঁদলেও হয়তো আবার সন্দেহ করা হবে, বিপদে পড়তে হবে। স্বল্পভাষী যাদবের বাবা সত্যেন চন্দ্রের অনেক স্বপ্ন ছিল তাঁর ছোট সন্তান যাদবকে নিয়ে। তিনি তাঁর এই প্রিয় ছেলেটি সম্পর্কে বলেন, আমার ছেলে খুব ভালো ছিল। একটি আদর্শবান ছেলে ছিল। কখনো সিগারেট খায়নি। অন্যদেরও সবসময় ভালো পরামর্শ দিত। নিজে যেমন বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করতো, অন্যকেও সেই পরামর্শ দিত। ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। শুধু বাবা নয়, যাদব সম্পর্কে পাড়া-প্রতিবেশীরও একই বক্তব্য। তার বয়সী মানুষ এবং তার চেয়ে বড়রাও তার কথা খুব মানতো। মানুষকে বোঝানোর একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল যাদবের। যাদবের মৃত্যু এবং পরবর্তীকালে তাকে জঙ্গি হিসেবে আখ্যায়িত করার বিষয়টি সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ভুলভাবে আখ্যায়িত করার পর তদন্ত করে কোনো প্রমাণ না পেয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে মন্ত্রী তার ভুল স্বীকার করেন। কিন্তু যাদবের পরিবারের কাছ থেকে জানা যায়– সরকারপক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তি বা কোনো চিঠি তাদের কাছে আসেনি ভুল স্বীকার করে বা ক্ষমা চেয়ে। হয়তো এগুলো যাদবকে ফিরিয়ে আনতে পারতো না বা পরিবারটির কষ্ট কমাতে পারতো না। তবুও সরকারের এ দায়িত্বটুকু পালন করা উচিত ছিল।

যাদবের বড় বোন আর্থিক সাহায্য চেয়ে সরকারের কাছে একটি আবেদন করেছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারপক্ষ থেকে তার কোনো সাড়া-শব্দ পাননি।

যাদবের মৃত্যুরও প্রায় ২ বছর অতিবাহিত হতে চললো। ধরা পড়েছে বোমা হামলাকারীরা। হয়তো তাদের বিচার হবে, হয়তো হবে না। তবে যাদব তো আর ফিরে আসবে না তার মায়ের কোলে। পরিবারটির যে ক্ষতি হয়ে গেল, তা আর কখনও পূরণ হবে না। যাদবের পরিবারের সদস্যদের কাছে যখন শেষে আমি জানতে চাই তাদের আরো কিছু বলার আছে কিনা, কোনো কথা তারা বলেননি বা বলতে চাননি।

যাদবের পরিবারের সদস্যদের সাথে ২০০৬-এর ২১ জুলাই-এর
সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখাটি প্রস্তুত করেছেন আফসানা চৌধুরী এমি

www.pathagar.com

"যাত্রা কেন বন্ধ হবে? এটা হচ্ছে আমার কথা"

জোৎস্না বিশ্বাস
যাত্রাশিল্পী ও সংগঠক

আসক : কখন যাত্রার ওপর হামলা শুরু হলো?

জোৎস্না বিশ্বাস : ষাটের দশক থেকে '৭১ -এর মুক্তিযুদ্ধের আগে মৌলবাদীরা যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তখন এরকম হয়েছে। আমাদের ওপরও হামলা হয়েছে ২-১টা জায়গায়। এটা '৭১-এর আগেও হয়েছে, পরেও বোধ হয় হয়েছে দু'এক জায়গায়, বিশেষ করে খুলনার দিকে।

আসক : তখন কি পুরো যাত্রাশিল্পী বা যাত্রাদলের সবাই মিলে প্রতিবাদ করেছিলেন?

জো.বি : তখন তো অত যাত্রাদল ছিল না। এই একটা বাধাই তখন এসেছিল, যেটা ধোপে টেকেনি। যাত্রা তখন অনেক জনপ্রিয় ছিল তো। হাতেগোনা কয়েকটা বিখ্যাত যাত্রাদল ছিল, বেশি ছিল না। যেমন– বাসন্তী অপেরা, বাবুল অপেরা, জয়দুর্গা অপেরা, ভোলানাথ, কমলা থিয়েটার।

আসক : যাত্রাশিল্পে আপনি যখন পদার্পণ করেন সে সময় কোনো প্রতিকূলতা ছিল?

জো.বি : না, সেই সময় তেমন কোনো প্রতিকূলতা দেখিনি। একবার ষাটের দশকে যাত্রা বন্ধের আদেশ দিয়েছিল। আমরা কিন্তু রোজার সময়ও যাত্রা করতাম, কোনো বাধা ছিল না, সেই সময়েও। একটা সমস্যাই শুধু দেখা দিয়েছিল, ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান যাত্রায় মহিলা শিল্পী অভিনয় করতে পারবে না বলে একটা আদেশ জারি করেছিলেন। তখন অবশ্য আমরা এতদিকে খেয়াল করতাম না, আমরা শুনতাম আর কি এসব ব্যাপার। তো এই আদেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন বাবুল অপেরার মালিক আমিন শরীফ চৌধুরী। মেয়ে অভিনয় করবে, ছেলে দিয়ে তো হবে না, মানুষ এটা মেনে নেবে না। সে যুগ তো চলে গেছে। আমাদের কালের চক্রে তো ঘুরছে অবিরত মানুষ। এটা তো পেছনের দিকে ঘোরানো সম্ভব না। যা হোক, তখন তাকে সে সময় নানাভাবে সাহায্য করেছেন পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন এবং প্রখ্যাত আইনজীবী হামিদুল হক চৌধুরী সে মামলা পরিচালনা করেছেন। ৩ মাসের মধ্যে সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। তখন মানুষের মধ্যে কূপমন্ডুকতা ছিল না, এখন কিছু মানুষের মাঝে যা আছে, সেটা হচ্ছে ধর্মান্ধতা, মৌলবাদী আগ্রাসনের যে কালো হাত, সেটাই প্রসারিত হচ্ছে এখন চারদিকে। আমি আর্টিস্ট, আমি কোনো দলের নই, কিন্তু ভালো কোনটা, মন্দ কোনটা, সাদা কোনটা, কালো কোনটা সেটা আমি জানি। '৭১-এ যুদ্ধ দেখেছি। জয় বাংলার নামে যুদ্ধ হয়েছিল। একটাই স্লোগান ছিল, আর কোনো স্লোগান ছিল না। সেই হিসেবে আমি বলছি, এই দেশটাকে তালেবানি রাষ্ট্র বানানোর সুপরিকল্পিত যে একটা চক্রান্ত চলছে, এটা আজকে যে বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হলো সেও বলতে পারবে।

আসক : এখন আপনার এই দলের কী অবস্থা?

জো.বি : না, এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

আসক : কবে বন্ধ করলেন? কেন?

জো.বি : অনেক কষ্টের কাহিনী আছে। '৯৬ -এ দলটা আবার করলাম ৩-৪ বছর বন্ধ রাখার পর, টাকা-পয়সা ঠিকমতো পাই না, পারমিশন পাই না, অনেক ঝামেলা। কোথাও গেলেই পারমিশন লাগবে, সরকারের লাইসেন্সকৃত যাত্রাদল হলেও। লাইসেন্সকৃত অস্ত্র এক জেলা থেকে আরেক জেলায় নিতে হলে এন্ডোর্সমেন্ট লাগে। আর যাত্রাদল ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জ নিতে হলে এন্ডোর্সমেন্ট লাগে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। তারপর আবার স্থানীয় যারা যাত্রার বায়না করে, দল নিয়ে যায় তাদেরকে নায়েক বলে যাত্রার পরিভাষায়। হয়তো পারমিশন করানো হলো ৭ দিনের। থানা থেকে পুলিশ এসে বলবে যাত্রা ৩ দিনের বেশি চলবে না। আবার যদি ৭ দিনই করি দেখা গেল কোনো একটা রিকয়েস্ট এলো যে, আর ১-২টা দিন থাকেন, যাত্রা করেন। সাথে সাথে দেখা যাবে পুলিশ এসে বলবে, আপনারা পারমিশন ছাড়া যাত্রা করছেন, বন্ধ করেন। ১টা দিনও কনসেশন নেই। এই যে প্রশাসনিক একটা বাধা, এটা খুবই নিন্দনীয়।

www.pathagar.com

আসক : এই বাধাটা কবে থেকে বেশি হতে লাগল?

জো.বি : এটা কঠিনভাবে শুরু হয়েছে '৮৪ সাল থেকে। আমার কাছে এ ব্যাপারে কিছু ডকুমেন্টসও আছে। বাংলাদেশে যাত্রায় প্রথম নিষেধাজ্ঞা জারি হয় ১৯৮৪ সালের ১৭ অক্টোবর। এমনি মাঝে মধ্যে হয়েছে। তবে এটা ভয়াবহ আকার ধারণ করে ১৯৯১ সালে নির্বাচিত সরকারের আমলে। কোথাও গেলেই লাইসেন্স কই। আসলে যাত্রার দলই যেখানে করতে দেবে না, তাহলে আর কীভাবে আমরা কাজ করবো।

তো '৯৬ -এ আমি যখন দল বন্ধ করে দিলাম, তখনকার কথা বলি। তখন নতুন সরকার নির্বাচিত হলো। তখন ভাবলাম হয়তো এখন ভালোভাবে কাজ করতে পারব। কিন্তু হলো না তো!

আসক : এটাকে বন্ধ করার পেছনে কারণ কি?

জো.বি : মৌলবাদের আগ্রাসন। জায়গায় জায়গায়, জেলায় জেলায় বোম্বিং করা হলো। বগুড়াতে নাটক চলাকালে যাত্রা আসরে বোমা মারা হলো, কারণটা কী? মানে এগুলো করতে দেয়া হবে না। যাত্রা কেন বন্ধ হবে? এটা হচ্ছে আমার কথা। এখন যেই অশ্লীলতার দোহাই দেয়া হচ্ছে সেটা তো একটা সার্কুলারের মাধ্যমে সরকারই পারে বন্ধ করতে। সেটা তো শুধু নাটকই। এখন তার মধ্যে অশ্লীল বা রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কথা থাকলে আমরা নিজেরাই সেটা এডিট করে নিই। যাত্রার মধ্যে সর্বধর্ম, সর্বজাতি, সব মানুষের কথা থাকে। আগে যাত্রাগুলো হতো মহাভারত, রামায়ণ এগুলো নিয়ে। এরপরে আসল দেশপ্রেম নিয়ে, স্বদেশী যাত্রা। যেমন মুকুন্দ দাস এরকম যাত্রা করে কয়েকবার কারাবরণ করেছিলেন। তখন থেকেই তো ১৯৩৩- এ বেঙ্গল প্লেসেস অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট করলো। যা হোক, অশ্লীলতা তো সরকারই বন্ধ করতে পারে। পারমিশন দেয়ার সময় বলে দিলেই হয়, যাত্রা কোনো অশ্লীল দৃশ্য দেখানো হলে পারমিশন বাতিল করা হবে। এরপরও যদি কোনো যাত্রাদল নিজেদের উদ্যোগে অশ্লীলতা প্রদর্শন করে তবে তার লাইসেন্স বাতিল করলেই তো হয়। অর্থাৎ মাথাব্যথা হয়েছে বলে তো মাথাটাকে কেটে ফেললে হবে না। সেটার তো ট্রিটমেন্ট দরকার।

আসক : যাত্রাতে মানবতার কথা বলা হয়, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবার কথা বলা হয়। নারী-পুরুষ একসাথে সাবলীলভাবে এখানে অভিনয় করে, নারীদের সম-অধিকার এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্যই কি মৌলবাদীরা এর বিরোধিতা করে?

জো.বি : এই যাত্রা তো মানুষকে সংগঠিত করে। তারা চায় মানুষ আরও কূপমন্ডুক হোক, ধর্মান্ধতায় ভুগুক। একবিংশ শতাব্দীতে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু তারা এটা চাইছে। এক্ষেত্রে যারা সুশীল সমাজ, যারা দেশের মঙ্গল চায়, তারা একত্র হলেই এটা রোধ করা সম্ভব। কারণ যারা এটা চায় তারা মুষ্টিমেয় কয়েকজন। শিল্প-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে যারা, তাদের সংখ্যা লিমিটেড– খুব কম। কারণ কোনো শান্তিপ্রিয় মানুষ চায় না যে একটা সংঘাত হোক, কোনো মায়ের কোল খালি হোক, কোনো অন্যায় প্রশ্রয় পাক। সবাই চায় আমার সন্তান পড়াশোনা করে মানুষ হোক, ঠিকমতো বাড়ি ফিরে আসুক, ভালোভাবে বাঁচুক। এই যে সামনে যাত্রার মৌসুম শুরু হতে যাচ্ছে। এখন সবাই বেকার, সবাই অস্থির, শুধু নির্বিকার সরকার, এরকম তো চলে না। এখন মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করব, জাতিসংঘে চিঠি দেব যে আমাদের মানবাধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।

আসক : এ থেকে রেহাই পেতে কী করা উচিত?

জো.বি : ওদের হাত ভেঙে দিতে হবে। এটা হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্র। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে অগণতান্ত্রিক কাজ কেন হচ্ছে? গণতন্ত্র মানে তো সবার সমান অধিকার থাকা। এখানে তো কেউ মদ খেয়ে রাস্তায় হৈ-হুল্লোড় করছে না, এখানে তো কেউ নারী নিয়ে ঢলাঢলি করছে না। এটা গণতন্ত্রের অধিকার না। কিন্তু যারা অভিনয় করছে, তাদের এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। অদ্ভুত কথাবার্তা, যেসব কথার কোনো মানে হয় না। যারা এখানের শিল্প-সংস্কৃতিকে পছন্দ করে না, বাংলাদেশকে তালেবান বানানো তাদের কোনো অধিকার নেই। তারা তাদের দেশে চলে যাক, পাকিস্তানে যাক, আফগানিস্তানে যাক। এই বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের যে নিজস্ব সংস্কৃতি আছে সেটা বন্ধ করার কোনো অধিকার তো তাদের নেই। বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে যেটা চলে আসছে। আগে আমরা যাত্রা করতাম, সিনেমার নায়ক-নায়িকার নাম জানতো, যাত্রার কোন দলের কোন হিরোর কি নাম, হিরোইনের কি নাম, সেটা জানতো। কোন দলে কি যাত্রা নামাচ্ছে, সেটা কিন্তু তাদের নখদর্পণে ছিল। তো এখানে কি কোনো রাজনীতি কাজ করতো? কেউ দেখাক তো পারলে, কোন যাত্রাশিল্পী, যাত্রার দল অশ্লীলতার সাথে জড়িত, বিপথগামী, কোন রাষ্ট্রবিরোধী কাজের সাথে জড়িত– আমাকে দেখাক তো। তাদের ন্যূনতম দাবি, তাদের পেশায় যেন কোনো আঘাত না আসে। তারা এটা ছাড়া তো কিছু শেখেনি। তো সেটাকে বন্ধ করাটা কেমন অমানবিক কাজ, যেই করুক সেটা। এখন চোরের ভয়ে কাপড় পরব না, তাতো হয় না, কাপড় তো

www.pathagar.com

আমাকে পরতেই হবে। এখন চোরের ওপর রাগ করে কি আমি ভাত খাব মাটিতে বসে? তাতো হয় না, এদের তো রোখা সম্ভব। মৌলবাদী আগ্রাসন এটা রোখা খুবই সম্ভব। শান্তিপ্রিয়, সুশীল সমাজ, সভ্য মানুষ তো কখনো এটা চায় না। আমরা সবাই মিলে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে চাই, কাউকে আঘাত করার মনোভাব আমাদের নেই। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমার মুখ তুমি দেখবে, তোমার মুখ আমি দেখব। আমরা তো আমাদের মধ্যে বিরোধ চাই না, ন্যায্য অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তুমি একটা অন্যায়-অবিচার করবে, সেটা সবাইকে মেনে নিতে হবে। এটা স্বাধীন দেশে সম্ভব নয়। কারণ এটা দিয়ে সে সংসার চালাবে, মা-বাবা-সন্তানকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করবে, তাদের তো চিন্তা আছে। এখানে ৬ মাস যাত্রা চলে। পশ্চিমবঙ্গে ১২ মাসই চলে। ওখানে হলে যখন শো হবে তখন টাকা পাবে। রেইনি সিজন-এ ওখানে হলে হলে যাত্রা হয়। কারণ তখন বৃষ্টিতে বাইরে সমস্যা হবে; তাই পাবলিক হলে করে। আমাদের এখানে তো এমন কোনো ব্যবস্থা নেই।

আসক : এখন যে যাত্রাশিল্পটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তারপরও কিছু মানুষ নির্বাক, কথা বলছে না যথেষ্ট। সে জায়গা থেকে এখন যে অবস্থা হচ্ছে, যেমন– রিসেন্টলি মৌলবাদীরা যে আক্রমণটা করেছে, কী ধরনের আক্রমণের কথা শুনেছেন বা আপনি কি সে সময়টাতে সরাসরি ছিলেন? মানে সেসময় কি আপনার দলটা ছিল?

জো.বি : না, সে সময় আমার দল ছিল না, তবে শুনেছি। ওই তোমরা যাত্রা করবা না, দল বন্ধ করে দাও। কোনো মেয়েছেলেকে নিয়ে এগুলো করতে পারবা না। এই ধরনের বাধানিষেধ ধরে বলা হলো, না হলে বোমা মেরে দেব, শেষ করে দেয়া, হুমকি দেয়া হয়েছিল, ভয় দেখানো হয়েছে।

আসক : এখানে নেতৃত্বেরও একটা ব্যাপার ছিল যে, একজন বা দু'জন মানুষ সবাইকে ডাকবে?

জো.বি : আমরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেছি, শহীদ মিনারে প্রতীকী অনশন করেছি। যখনি আমরা মিছিল নিয়ে বেরিয়েছি, তখনি পুলিশ বাধা দিয়েছে। বলেছে, আপনারা এখন প্রতিবাদ করবেন না। আপনাদের নিয়ে বসবে। এই যে ৬৩টা জেলায় যে বোমা হামলা হলো, তারপর আমরা যাত্রার সবাই মিলে শহীদ মিনারে একটা সমাবেশ করলাম। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সবাই, সুশীল সমাজ বলতে যা বুঝায়, তারাও, সবাই আমাদের সাথে আছে সবসময়। আমরা কথা বলছি। এমন সময় পুলিশ একজন এসে বলল, দেখি আপনার ব্যাগে কি আছে? সার্চ করবে। আমি বোমা নিয়ে গেছি আর কি শহীদ মিনারে। এই ধরনের মেন্টালেটি কাজ করছে এখন।

আসক : এখন বাংলাদেশে কি পরিমাণ যাত্রা দল আছে?

জো.বি : এখন যাত্রাদল কমতে কমতে ৪০টার মতো হতে পারে– তা আমিও শিওর না। যার সাথে দেখা হয়, তারই একই কমপ্লেইন। সবাই মনে করে আমার বুঝি অনেক ক্ষমতা। কিন্তু আমার কোনো ক্ষমতা নেই আসলে। আমার কথারও তো কোনো মূল্যায়ন হয় না, কাউকে তো শুনতে হবে।

এখন যাত্রাকে নিয়ে রাখা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, এটা থাকার কথা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এই চোর-ডাকাত-বাটপারের মধ্যে যেয়ে থাকবে সংস্কৃতি, সেটা কি এতই ভয়াবহ? আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়েও? এটা তো খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার।

এখন যে সরকারই আসুক, আগে তাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে– যাত্রা যেন অবাধে চলে সে ব্যবস্থা করবে, না হয় ৫-৬ লাখ ভোট থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

আসক : সরকারের যাত্রা বন্ধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপনাদের বক্তব্য কি?

জো.বি : যে ৫-৬ হাজার টাকা বেতন পেত, সে যদি ১২শ' টাকা বেতন পায়, সে কীভাবে সংসার চালাবে? সে তো তখন বিপদগামী হতে বাধ্য। এর জন্য দায়ী কে হবে, সরকার হবে। বেশ্যাবৃত্তি করতে তো বাধ্য হবে সে, পেটের জন্য করতে হবে। বাঁচতে হবে তো। এদেশ থেকে চোরাচালান হয়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়ে নির্বিবাদে। নানান দেশে সব দেহজীবীর কাজ করছে। তাদের বাধ্য করা হচ্ছে। এগুলো তো বন্ধ করতে পারছে না সরকার। বাবা-মায়ের বুক খালি করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে উটের জকি বানানো হচ্ছে। এগুলো তো বন্ধ করতে পারছে না সরকার। সরকারের দায়িত্ব দেশ ও জনগণকে রক্ষা করা। অন্তত কোথাও কোনো অনিয়ম ও শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ হচ্ছে কিনা সেটা দেখা। যারা যাত্রায় অভিনয় করে তারা কোনো সমাজবিরোধী কাজ করে কিনা, সেটা দেখা। সেটা বন্ধ করার দায়িত্ব সরকারের, সরকারের কর্তব্য। কিন্তু প্রতিটা মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মানে কী? মানে তার জীবনের যে লক্ষ্য বা প্যাশন অভিনয় করা, সেখান থেকে তাকে সরে আসতে বাধ্য করার মানে কি?

সাক্ষাৎকার গ্রহণ – লুসি তৃপ্তি গোমেজ ও কানিজ খাদিজা সুরভী
তারিখ: ২৫ আগস্ট ২০০৬

www.pathagar.com

"জনগণকে বোঝানোর জন্য সংস্কৃতি কর্মীরা ভূমিকা রাখতে পারে"

কবরী সারোয়ার
চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ও পরিচালক

আসক : সিনেমা হল, যাত্রা, আদালত, মাজার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এ ধরনের জায়গা জঙ্গিদের হামলার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু, একজন সংস্কৃতি কর্মী হিসেবে এর কারণ কী বলে মনে করেন?

কবরী সারোয়ার : সিনেমা হল, যাত্রা, আদালত, মাজার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এসব স্থানে জঙ্গিরা হামলা করছে। আমার মনে হয়, সংস্কৃতি অঙ্গনকেই শুধু ধ্বংস করা তাদের উদ্দেশ্য নয়, তাহলে আর কোর্ট-কাছারিতে তারা হামলা করতো না। এখানে অন্য ব্যাপারও জড়িত আছে। যেমন– জঙ্গিরা যে হামলা করছে তাতে আমার মনে হয়, বাইরের কোনো শক্তি উৎসাহ দিচ্ছে। যারা জঙ্গি হামলা করছে তারা বাংলাদেশের শেকড় পর্যায়ের লোকজন। তারা হয়তো বুঝতেও পারছে না তারা কি করছে।

আসক : এ পরিস্থিতি কি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কোনো প্রভাব রেখেছে?

ক.সা : প্রভাব তো পড়েছেই। প্রচন্ড রকমের প্রভাব পড়েছে। যেমন– আমি রোটারি করি এবং আমি একজন রোটারিয়ান। ফান্ড রেইজিংয়ের জন্য আমার 'আয়না' সিনেমাটি চেয়েছিলেন রোটারিয়ানরা। সিনেমা প্রদর্শন করে যে টাকা পাওয়া যাবে সেটা কুষ্টিয়ায় একটি চক্ষু হাসপাতালের তহবিলে যাবে। এতে অনেক লোক চিকিৎসা পাবে। ওই সময় এক ভদ্রলোক বললেন যে, আপা সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে যেতে খুব ভয় করে। তার মানে এর আগে সিনেমা হলে বোমা হামলা হয়েছে।

আসক : এ থেকে উত্তরণে সংস্কৃতি কর্মীরা কী ভূমিকা রাখতে পারে?

ক.সা : এ ধরনের অপরাধ যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে বোঝানোর জন্য সংস্কৃতি কর্মীরা যে ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে, অন্য কোনো পেশার কর্মীরা কিন্তু এ ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে না। মূলত বেশি করে এসব কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে জনগণকে জড়িত করা– তাহলে হয়তো হামলা আর হবে না। যারা এ ধরনের কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে তারা কিন্তু অত্যন্ত গরিব। আর আমি যে অঙ্গনে কাজ করি সেখানে যদি এর ক্ষতিকর বিষয়গুলোকে জোর দিয়ে গান, নাটক, সিনেমা তৈরি করা হয় তাহলে এর প্রভাব অনেক বিস্তার লাভ করবে। যেমন– আমি যখন অনেক আগে সিনেমা দেখতাম তখন সিনেমায় কাজ শুরু করিনি কিন্তু আমার ছোট মনে তখনই সিনেমার একটা প্রভাব পড়ে। একটু বড় হয়ে হেলেন অব ট্রয় দেখেছিলাম, তখন মনে হয়েছিল আমিই বুঝি হেলেন, আমিও এ ধরনের একটা কিছু করতে পারি। এ ধরনের বিষয়গুলো মানুষের মনে প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন– একজন নিউরোলজিস্টকে আমি দেখাই। কিন্তু তিনি আমার কাছ থেকে পয়সা নেন না। শুধু আমার থেকেই না সংস্কৃতি অঙ্গনের কেউ গেলেই টাকা নেন না। উনাকে আমি একদিন বললাম, আপনি যদি টাকা না নেন তাহলে তো আপনার কাছে আর আসা যাবে না। তখন উনি বললেন, আমি যখন স্টুডেন্ট, রাজ্জাক এবং কবরীর এত ছবি দেখেছি! 'নীল আকাশের নিচে' ছবিতে রাজ্জাক ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিল, সে পড়াশোনা করার জন্য কতো কষ্ট করেছে। জানেন তার প্রভাব আমার মধ্যে এতো পড়েছে যে, তার আগে ফাঁকি-ঝুঁকি মারতে চাইতাম কিন্তু ওইটা দেখে আমার মধ্যে বড় হওয়ার ইচ্ছা জেগেছিল। আজকে আমি যে সফল একজন ডাক্তার তা ওই ছবির প্রভাব থেকেই হয়েছি, যার জন্য টাকা নেব না। আপনাদের কাছ থেকে তো আমি লাভবান হয়েছি। এভাবেই উনি বলেছেন। এই যে একজন শিক্ষিত লোকের চমৎকার একটা কথা আমি মনে করি যে, এ কথাগুলো আমাদের দেশে ছড়িয়ে দেয়ার সময় এসেছে।

আসক : জঙ্গি হামলা প্রতিরোধ আপনারা কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন কি?

ক.সা : আসলে বিষয়টা এতো ব্যাপক যে পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়টা আমি নিজেও বুঝি না। ভয়-ভীতির মধ্যেই আমরা কাজ করি। এর বিরুদ্ধে শহীদ মিনারে গিয়ে দাঁড়াই প্রতিবাদস্বরূপ কিংবা আমার যে ছবি বানিয়েছি 'আয়না' ওটার মধ্যেও আছে। আসলে যার যে অঙ্গন, ওখান থেকেই কথা বললে বেশি পজিটিভ হয় বলে আমি মনে করি।

www.pathagar.com

জঙ্গি হামলার বিরুদ্ধে যে পতাকা মিছিল হয়েছিল সেখানেও আমি গিয়েছিলাম। এ ধরনের প্রতিবাদগুলোতে আমি থাকি।

আসক : বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে আপনার মতামত কি?

ক.সা : আমরা রায় পেয়েছি কিন্তু তাদের সাজা কেন হচ্ছে না, এতোদিন ধরে কেন জিইয়ে রাখলো এটা আমারও প্রশ্ন। এটাই কি আইনের স্বাধীনতা? আমার মনে হয় এটা স্বেচ্ছাচারিতা। যারা আইন নিয়ে কাজ করেন তারাও তো বুদ্ধিমান, তারাও দেশকে ভালোবাসেন। তাদের কি কোনো দায়িত্ব নেই? যেমন বঙ্গবন্ধুর মামলা এখনও ঝুলছে। ওনারা এখন বলে আওয়ামী লীগ ৫ বছর ক্ষমতায় থাকতে করলো না কেন। ঠিক আছে, আমাদেরও প্রশ্ন কেন করলো না? কিন্তু আপনি ক্ষমতা পেয়ে আপনি করবেন না! সেটাও তো আপনি ঠিক কথা বললেন না। আপনারা তো ম্যান্ডেট পেয়েছেন, আপনারা করেন। এই একে অন্যের ওপর দোষ চাপানো আমরা সংস্কৃতি অঙ্গনের লোকজন কিন্তু করি না। এক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা উচিত।

জঙ্গি যারা আছেন তাদের হয়তো সরকার ধরতেই চায় না। তাদের ধরলে হয়তো সরকারের ক্ষতি হতে পারে। আমার মতে, ওনাদের যদি ক্ষমতা হারাতেও হয়, তাহলেও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কর্মকান্ড নিয়ে আগানো উচিত। মানুষ যত বেশি জানবে ততো বেশি বুঝবে কারা ভালো কাজ করছে, কারা ভালো করছে না। আমার তো মনে হয় কোনো না কোনো লিঙ্ক তো আছেই। একেবারেই তো ওরা নিজেরা জঙ্গি সংশ্লিষ্ট কাজ নিজেরা করতে পারে না। যেমন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথাই বলি না কেন– অনেক লোকের সাপোর্ট না থাকলে কি যুদ্ধ হতো? রাজাকারের সংখ্যা কিন্তু কম, মুক্তিযোদ্ধারাই বেশি। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন কিন্তু সবাই তো আওয়ামী লীগের লোক না। সমস্ত পেশাজীবী যদি না আসতো তাহলে তো তিনি সফল হতেন না। সেটাই যদি হতে পারে তাহলে এই যে জঙ্গি ধরা যেটা স্বল্প পরিসরে হচ্ছে, এগুলোর বিচার যদি ত্বরান্বিত করতো তাহলে ওরা ভয় পেত, ওরা করতে সাহস করতো না। কারণ, বেশির ভাগ লোক তো কষ্টের মধ্যে আছে।

আসক : একজন নাগরিক হিসেবে এখন করণীয় কি?

ক.সা : বিভিন্ন জনের মতামতগুলো উঠে আসা। আমার মনে হয়, রাজনীতিটাই সবচেয়ে বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বক্ষেত্রে রাজনীতি কলুষিত হয়ে গেছে। এত টাকা লুট হচ্ছে এক্ষেত্রে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। এ প্রক্রিয়া যে শুরু হয়েছে তা বন্ধ হবে ধীরে ধীরে, শেকড় থেকে এগুলো উপড়ে ফেলতে হবে। নতুন প্রজন্মকে এর ভার দিতে হবে। অনেকে যারা এতদিন ধরে কাজ করছে– রাজনীতিতে হোক, অর্থনীতি, সংস্কৃতি অঙ্গনে যারা আছেন তারা আমার মনে হয় এখন উপদেষ্টা, পলিসি মেকিংয়ের ক্ষেত্রে নতুনদের জায়গা করে দিতে পারেন বা তারা যদি একসাথে বসে কাজ করে তাহলে পুরনোদের অভিজ্ঞতা এবং নতুনের মেধা দুটোর সমন্বয় হবে। প্রতিটি সেক্টরে যদি এভাবে কিছু কিছু মানুষ নিয়ে আসা হয় তাহলে আগামীতে একটি পজিটিভ বাংলাদেশ হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ – আফসানা চৌধুরী এমি ও কানিজ খাদিজা সুরভী
তারিখ : ২৩ আগস্ট ২০০৬

www.pathagar.com

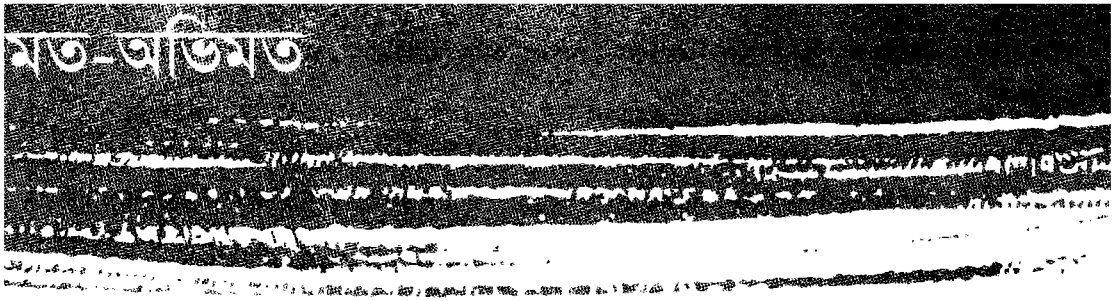

বাংলাদেশের ধর্মীয় জঙ্গিবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে রাজনীতিক, আইনজীবী, গবেষকরা কী ভাবছেন, তা জানতে আমরা এ রকম পাঁচজনের কাছে দশটি প্রশ্ন রেখেছিলাম। ২০০৬ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে তাঁরা আমাদের প্রশ্নের লিখিত জবাব দেন। মতামতগুলো একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব এবং তা পাঠকদের জঙ্গি বিষয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তার ও তর্ক-বিতর্কের খোরাক যোগাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রশ্ন দশটি ছিল–

১. জেএমবির শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিরা ধরা পড়েছে। এখন তাদের বিচারও চলছে। কিছু মামলার রায়ও হয়েছে। তাদের গ্রেফতার এবং বিচারের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনার মতামত কি?
২. শীর্ষ জঙ্গিদের এই বিচার প্রক্রিয়া তাদের মূলোৎপাটনে কতোটা সহায়ক বলে মনে করেন?
৩. বাংলাদেশে এই জঙ্গিবাদী তৎপরতার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে বলে আপনার মনে হয়?
৪. বাংলাদেশের এই জঙ্গিদের হামলার লক্ষ্য বা কার্যকলাপ সম্পর্কে আপনার বিশ্লেষণ।
৫. দেখা গেল যে, বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা আকস্মিকভাবে শুরু হয়ে একেবারে শীর্ষে উঠে গিয়ে হঠাৎ করে আবার শেষ হয়ে যায়। এই নাটকীয় ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখছেন?
৬. বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী তৎপরতা কি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের একটি অংশ, নাকি একান্তই একটি বিচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ ব্যাপার? আপনার মতামত কি?
৭. জঙ্গিবাদের উত্থান থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের সরকারের ভূমিকাকে (নীতি/আইন প্রণয়ন, যেমন-টেলিটেপিং আইন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ইত্যাদি) কীভাবে মূল্যায়ন করেন?
৮. কারো কারো অভিযোগ, জোট সরকারে যেহেতু জামায়াতে ইসলামী আছে সে কারণে সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গি সংগঠনগুলো নির্বিঘ্নে এতোটা তৎপর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আপনি কী মনে করেন?
৯. বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী তৎপরতায় জেএমবি ছাড়াও অনেক জঙ্গি সংগঠনের সংশ্লিষ্টতা দেখা গেছে। কিন্তু এখন জেএমবি ছাড়া অন্যরা তেমন আলোচনায় নেই। বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?
১০. এই পরিস্থিতিতে কী করণীয়?

www.pathagar.com

"বিচার প্রক্রিয়া ঠিকমতো হয়ে তাদের শাস্তি কার্যকর হলে তথাকথিত এই জঙ্গিদের মূলোৎপাটন হবে"

বদরুদ্দীন উমর
সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

১. জঙ্গিদের বিচার প্রক্রিয়া খুব ধীরগতি। একেকজনের নামে অনেক মামলা দায়ের করে একটার পর একটা চালানো হচ্ছে। কিছু মামলার রায় বের হয়েছে। যাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তাদের অন্য মামলায় ঝুলিয়ে না রেখে অবিলম্বে ফাঁসি দেওয়া দরকার।

২. বিচার প্রক্রিয়া ঠিকমতো হয়ে তাদের শাস্তি কার্যকর হলে তথাকথিত এই জঙ্গিদের মূলোৎপাটন হবে। কারণ, জনগণের মধ্যে ওদের কোনো সমর্থন নেই। এদের শীর্ষস্থানীয় নেতারা ধরা পড়ার পর জনগণ যে স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বের করে তাদের ফাঁসি দাবি করেছেন এর থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

৩. এই জঙ্গিবাদ কৃত্রিমভাবে মূলত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সরকার কর্তৃক সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪. এ কারণে আফগানিস্তান, ইরাক, লেবানন ইত্যাদি দেশের মতো বাংলাদেশের এই তথাকথিত জঙ্গিরা কোনো সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা বা ব্যক্তিকে টার্গেট করে না। তারা টার্গেট করে অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল ব্যক্তি এবং সংস্থাকে।

৫. এটা কোনো নাটকীয় ব্যাপার নয়। এর অর্থ হলো এই জঙ্গিবাদের পরিকল্পক ও পৃষ্ঠপোষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত সরকার যখন প্রয়োজন মনে করে, তখন এটা বৃদ্ধি করে; যখন তা মনে করে না তখন তা কমিয়ে আনে বা বন্ধ রাখে। এর থেকে এসবকে মনে হয় আকস্মিকতা।

৬. বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী তৎপরতা অবশ্যই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের সাথে সম্পর্কিত। লক্ষ্য করার বিষয় যে, ৯/১১-এর পর থেকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের হুজুগ তুলে অন্য সবকিছু ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই এই সন্ত্রাসবাদকে একদিকে গড়ে তুলছে, অন্যদিকে তাকে ধ্বংস করার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতারণামূলক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের 'জঙ্গিবাদের' সাথে আল কায়দা বা অন্য কোনো গ্রুপের সত্যিকার সম্পর্ক প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু এসব নিয়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই এবং বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ঘন ঘন বৈঠক ও সাক্ষাৎ লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার।

৭. আগেই বলা হয়েছে যে, এই জঙ্গিবাদের উত্থানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার সম্পর্কিত, সরকার এসব কাজের প্রত্যক্ষ সহযোগী। আওয়ামী লীগ আমল থেকে নিয়ে পরবর্তী বিএনপি সরকারের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যেসব সামরিক, আধাসামরিক চুক্তি হয়, সেগুলোকে নিশ্চয়ই জঙ্গিবাদী তৎপরতার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৮. জামায়াতে ইসলামী আদর্শই এই জঙ্গি তৎপরতাকে যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতা করেছে এবং এর জন্য সরকারি পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাকে ব্যবহার করেছে। জঙ্গি নেতাদের মধ্যে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকের সাথেই জামায়াতে ইসলামীর সম্পর্ক থেকেছে।

৯. বাংলাদেশে জেএমবি ছাড়া অন্যান্য জঙ্গি সংগঠন থাকলেও জেএমবিকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সরকার বিশেষভাবে গড়ে তুলেছে। কাজেই অন্যদের গুরুত্ব এক্ষেত্রে কম। এই অন্য সংগঠনগুলো কিছুদিনের মধ্যেই সক্রিয় সংগঠন হিসেবে বিলুপ্ত হবে।

১০. এই পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে এ দেশে ব্যাপক জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক সংগ্রাম সংগঠিত করা ছাড়া জঙ্গি তৎপরতার মোকাবিলা করা ও তাকে নিশ্চিহ্ন করার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

সাক্ষাৎকার প্রদানের তারিখ: ৫ আগস্ট ২০০৬

www.pathagar.com

"শিক্ষাব্যবস্থায় অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চেতনার প্রাধান্য দান অতীব জরুরি"

মফিদুল হক
লেখক, প্রকাশক

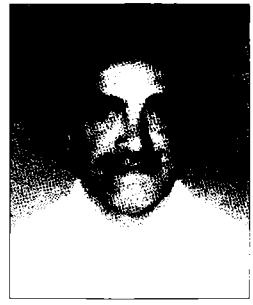

১. জেএমবির শীর্ষ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার একটি ইতিবাচক ঘটনা। তবে এই গ্রেফতার-পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাদের কাছ থেকে উদ্ঘাটিত তথ্যভিত্তিক তদন্ত কার্যক্রম নিয়ে অনেক জিজ্ঞাসা থেকে যায়। এর জের পড়েছে বিচার প্রক্রিয়ায়ও। জেএমবির সন্ত্রাসীদের অনেককেই বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ বছরের কারাদন্ড দেয়া হচ্ছে। মার্কিন বিচারব্যবস্থায় এ ধরনের অহেতুক দীর্ঘ কারাদন্ড প্রদানের রেওয়াজ রয়েছে। আমাদের বিচার প্রক্রিয়ায় জেএমবিকে ঘিরে হঠাৎ এই ধরনের ব্যতিক্রমী রায় আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বিশেষ বোধগম্য হচ্ছে না।

২. তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া যেখানে অজস্র প্রশ্নের জন্ম দেয় সেখানে অপরাধী চক্রের মূলোৎপাটনের প্রশ্ন নেই। প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেএমবির বিস্তৃত নেটওয়ার্ক সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত, এই ধরনের নেটওয়ার্ক স্থাপন ও বজায় রাখার পেছনে বাইরের সমর্থন, ভেতরের প্রশ্রয় ও বিপুল অর্থের ভূমিকা রয়েছে। যেসব সেফহাউজ থেকে তাদের নেতাকর্মীরা গ্রেফতার হয়েছেন তা প্রমাণ করে অর্থ ব্যয়ে এদের কোনো কার্পণ্য ছিল না। এর সঙ্গে রয়েছে নাশকতামূলক কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিপুলসংখ্যক কর্মীবাহিনী। আরও আছে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ শিবির এবং রিক্রুটমেন্টের এক বিপুলাকার ব্যবস্থাপনা, যা প্রয়োগ ও রক্ষায় আরও অনেক ধরনের সমর্থন এবং সম্পৃক্তি জড়িত ছিল। এই শেকড়গুলো গোটা বিচার প্রক্রিয়ার আড়ালেই থেকে গেল।

৩. এই প্রশ্নে কোনো সংক্ষিপ্ত জবাব আমার জানা নেই।

৪. এটা কোনো প্রশ্ন নয়, একটি বিস্তারিত বয়ান এর দাবি, যা মেটাতে আমি পারগ নই।

৫. বাংলাদেশের জঙ্গিবাদ নিঃসন্দেহে একটি নাটকীয় রূপ ধারণ করেছে। তার বড় কারণ জঙ্গি মৌলবাদকে অস্বীকার করার সরকারি প্রবণতা, যা এখন আড়াল করার কিংবা লঘু করে দেখার প্রয়াসে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে আরও নাটক দেখা বাকি রয়েছে।

৬. যে ইসলামি হুকুমত কায়েমের ধ্বজা তুলে মৌলবাদী তৎপরতা পরিচালিত হয় তা আদর্শগতভাবেই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব কিংবা সীমানা মান্য করে না। ফলে বিভিন্ন দেশে তৎপর মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের মধ্যে আদর্শগত ঐক্য ও বন্ধন নিয়ে কোনো লুকোছাপা নেই। বাংলাদেশে হিংসাশ্রয়ী ধর্মতত্ত্বের বাহকদের বাইরে থেকে প্রাপ্ত সহায়তা-সমর্থন নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

৭. বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের উত্থানের চাইতেও আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদের উত্থানের সঙ্গে বাংলাদেশের কতক আইনি পদক্ষেপ অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ৯/১১-এর হামলার পর মার্কিন উদ্যোগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমনি কতক পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর একটি হচ্ছে বিভিন্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে মানি লন্ডারিং আইন কঠোরতর করা। পাশাপাশি বেআইনি ব্যবস্থা তথা হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ নিরুৎসাহিত করতে প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ দ্রুত ও সহজতর করা হচ্ছে, বড় অঙ্কের অর্থ প্রেরণকে আন্তর্জাতিক খবরদারির মধ্যে আনা হচ্ছে। এর একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে, তবে এই ইতিবাচকতা বাস্তবে দেখা দেবে কিনা তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সরকারের সদিচ্ছার ওপর। বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস একটি সযত্নে লালিত গোপনীয়তা হিসেবে বিরাজ করছে। সরকার যে কয়েকটি কাজ করতে বাধ্য হয়েছে, যেমন রাবেতা আল ইসলামের দপ্তর বন্ধ করে দেয়া, হেরিটেজের কাজ গুটিয়ে ফেলার আদেশ জারি, পাশাপাশি যেসব সংস্থা স্থানীয় কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানকে অর্থের যোগানদানের সঙ্গে জড়িত সেসব বিষয়ে সরকার কোনোরকম মন্তব্য করেনি। জেএমবির অর্থ লেনদেনের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের সম্পৃক্তি নিয়েও চলেছে রাখঢাকের একই রকম খেলা। ফলে আইন যাদের দমনের জন্য করা হয়েছে, তারা আইনের আড়ালেই থেকে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদ রুখবার নামে দেশে দেশে নাগরিক অধিকার সঙ্কোচনের প্রয়াসও চলছে। বাংলাদেশও এর থেকে মুক্ত নয়। তবে যেমন মানি লন্ডারিং আইনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, জঙ্গিবাদকে দমনের জন্য গৃহীত এসব আইনের কারণে জঙ্গি দলগুলোর বিশেষ অসুবিধা হয়নি, বরং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে এর ব্যবহার ঘটবার আশঙ্কাই প্রবল। এটা বাংলাদেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

৮. বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ তার নখদন্ত প্রকাশ করে ব্যাপক বোমাবাজি ও ঘৃণ্য হত্যাকান্ডের মাধ্যমে। সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বের সঙ্গে একটা বিরোধের সম্পর্ক তৈরি করেছে বটে, তবে এমন সব বর্বর কান্ডের পরও তাদের প্রতি, এমনকি ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে কারাবাসকালে তারা যেসব বিশেষ ব্যবস্থার সুযোগ লাভ করছে, তাতে বোঝা যায় এরা সরকারের একটি মহলের আনুকূল্য ও প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে। জঙ্গিবাদ মানে কেবল কতক ব্যক্তি কর্তৃক কতক সহিংস ঘটনার অবতারণা নয়, এটা এক ধরনের সহিংস মতাদর্শ যা ওয়াহাবি ইসলামের কূপমন্ডুক চিন্তার স্বীকৃত নীতি। বর্তমান সময়ের আগে এমনি আদর্শের বাহক দল জামায়াতে ইসলামী এই অঞ্চলে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশী হয়েছিল ১৯৭১ সালে, পাক সামরিক বাহিনীর দোসর হিসেবে। সেই সময়ে তাদের দলের অনুগত ক্যাডারদের বাছাই অংশ নিয়ে তারা গঠন করেছিল বদর বাহিনী আর বাংলার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের যারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। হত্যার আদর্শের বাহক দল আবার যখন ক্ষমতার অংশীদার তখন জঙ্গিবাদের উত্থান অনেক তলিয়ে দেখা দরকার।

৯. শান্তির ধর্ম ইসলামকে যারা হিংসাশ্রয়ী ইসলামে রূপান্তর করেছে তাদের অবস্থান অনেক গভীর বিশ্লেষণ দাবি করে।

১০. বর্তমান পরিস্থিতিতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সব গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক উদারবাদী মানুষের ব্যাপকতম ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বিশেষ জরুরি। বাংলাদেশে চিরাচরিতভাবে ইসলামের যে মানবিক ও প্রেমপ্রীতিময় আদর্শ শক্তিশালী হয়ে আছে তা উগ্রবাদী জঙ্গিদের কাছে পরাভব মানতে পারে না। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি আশু আইন-শৃঙ্খলাগত দিক রয়েছে, যেখানে সরকারের ভূমিকা মুখ্য এবং সরকারকে তার দায়িত্ব পালনে সক্রিয় করতে নাগরিকজনের চাপ প্রয়োগের রয়েছে পরোক্ষ ভূমিকা। বাংলাদেশ সরকারের অকার্যকারিতা নিয়ে যেসব অভিযোগ উঠেছে তা ভুল প্রমাণ করতে হলে জঙ্গি দমনে সরকারি ভূমিকা নিশ্চিতভাবে আরও ব্যাপক ও গভীর হতে হবে। দ্বিতীয়ত আসে সামাজিক ভূমিকার প্রশ্ন, যেখানে নাগরিকজনের দায়িত্ব মুখ্য। এই দায়িত্ব পালনে শিক্ষাব্যবস্থায় অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চেতনার প্রাধান্যদান অতীব জরুরি। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড প্রসার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই তালিকা বহুভাবে সম্প্রসারণ করা যায়। মোদ্দা কথা– দেশকে হিংসাত্মক ধর্মাশ্রয়ী সাম্প্রদায়িক ধারা থেকে অসাম্প্রদায়িক মানবিক পরিমন্ডলে নিয়ে আসার জন্য আরাধ্য রয়ে গেছে অনেক কাজ।

সাক্ষাৎকার প্রদানের তারিখ: ৯ আগস্ট ২০০৬

www.pathagar.com

"আমার মনে হয়, জঙ্গি/ইসলামপন্থী দলগুলোকে অনায়াসে 'সন্ত্রাসী' বলাটা বিপজ্জনক"

রেহনুমা আহমেদ
নৃ-বিজ্ঞানী ও গবেষক

১. প্রথমেই একটি কথা বলে নেয়া ভালো। বাংলাদেশে ইসলামপন্থী আন্দোলন, জঙ্গিবাদ এ বিষয়ে একাধিক তো দূরের কথা, একটি ভালো, বস্তুনিষ্ঠ, তাত্ত্বিকভাবে দৃঢ় সমাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজ এখনও হয়নি। পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ। তাতে তথ্য থাকে, তবে অনেকাংশে সেগুলো চাঞ্চল্যকর মোড়কে উপস্থাপিত হয়। কিংবা তথ্য এমন ধরনের ফ্রেমওয়ার্কের সাহায্যে পরিবেশিত হয় যা সমকালীন বিশ্বে রাজনৈতিকভাবে যথার্থ নয় (ইসলামপন্থীরা 'মৌলবাদী', তারা 'অযৌক্তিক,' 'ধর্মান্ধ,' 'বর্বর')। চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন জটিল রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক বিষয় বুঝতে সাহায্য করে না, ক্ষেত্রবিশেষে বিষয়গুলোকে আরো ঘোলাটে করে তোলে। যদি গবেষণা না হয়ে থাকে, যদি বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের পরিবর্তে প্রধানত চাঞ্চল্যকর তথ্যসংবলিত একটি পরিবেশে আমরা বাস করে থাকি, তাহলে কিসের ভিত্তিতে আমি এই প্রশ্নমালার উত্তর লিখছি? উত্তরে বলব, এটা ঠিক যে এই বিষয়ে আমি কোনো গবেষণা করিনি, তবে নানাবিধ কারণে জোট সরকারের শাসনামল আমার মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে।[১] নিচে আমি আমার ভাবনার টুকরো, খন্ডচিত্র তুলে ধরছি, কিন্তু বিষয়গুলোকে ভালোভাবে বুঝতে হলে, বিশ্লেষণ করতে হলে, সিস্টেমেটিক গবেষণা যে খুবই জরুরি, তা না হলে আমাদের জানা কৃত্রিম, খাপছাড়া, স্ববিরোধী থেকে যেতে পারে– তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন আপনাদের প্রশ্ন ধরে কথা বলি। জেএমবির শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিরা (শায়খ আব্দুর রহমান, বাংলাভাই) ধরা পড়েছে ঠিকই, তবে তাদের ধরপাকড় এবং গ্রেফতার প্রক্রিয়া ছিল একটা 'টেলি-তামাশা'। জোট সরকারের মন্ত্রীরাই যেখানে বলেছিলেন বাংলাভাই হচ্ছে 'মিডিয়ার সৃষ্টি' (অর্থাৎ মিডিয়া চাঞ্চল্যকর খবর বানায়, ছাপে, তা প্রচার করে, ফাঁপা জিনিস নিয়ে হৈহৈ রব তোলে), সেখানে কেন শায়খ আব্দুর রহমান আর বাংলাভাইয়ের ধরপাকড়কে, তাদের গ্রেফতারকে এভাবে সেনসেশনালাইজ করা, মিডিয়ার মাধ্যমেই চাঞ্চল্যকর করে তোলা জরুরি হয়ে পড়ল? এতে সরকারের কী লাভ হলো, এই প্রশ্ন উঠাটা স্বাভাবিক। তারা যে সফল হননি, তা প্রায় সবাই জানেন। এই টেলি-তামাশার ভিলেনরা মিডিয়ার বস্তু বা অবজেক্ট হতে রাজি হননি। তারা মিডিয়ার সাথে সরাসরি কথা বলতে চেয়েছিলেন। স্পষ্টতই সেটা স্ক্রিপ্টের বাইরে ছিল, আর তাই তাদের কথা বলতে দেয়া হয়নি। আর আরো পরে তারা আদালত প্রাঙ্গণে 'হ্যামিলনের বাঁশি বাজালে' বা 'হাটে হাঁড়ি ভাঙলে' কি কি হতে পারে, এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। পশ্চিমা দেশগুলোতে সর্বোচ্চ বল প্রয়োগকারী ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে কুক্ষিগত থাকা, অভ্যন্তরীণ ভয়-ভীতির সৃষ্টি, আর মিডিয়া হেজেমনি– এসবের মধ্য দিয়ে জনগণের 'সম্মতি' আদায় করে শাসন পরিচালিত হয়ে থাকে, অনেক পর্যবেক্ষক তাই বলেন।[২] এর ভালো নমুনা হচ্ছে ৯/১১-পরবর্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আমি বিভিন্ন সময় জোট সরকারের কিছু কার্যক্রম, কিছু কর্মপন্থা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমার মনে হয়েছে, জোট সরকারের কর্ণধাররা শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্কিনি-শাসন-নীতি থেকে কিছু পাঠ গ্রহণ করেছেন। হয়তো তারা সমানভাবে সফল হননি, কিন্তু সেটা ভিন্ন বিষয়। তার একটা কারণ হতে পারে যে, বাংলাদেশের জঙ্গিরা সরকারের 'প্রতিপক্ষ' শক্তি না।[৩] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় এটা কিন্তু সত্য নয়। সমাজতন্ত্র ভাঙার

---

১ প্রধানত তার 'সেক্যুলার' যোগ 'ইসলামপন্থী' চরিত্রের কারণে। এই দুই শক্তির সমন্বয়, শাসনের তরিকা উদ্ভাবন, তরিকা উদ্ভাবনে একাত্তরের ইতিহাস এবং সমকালীন বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা, এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমি বিশেষভাবে কৌতূহলী। আগামীতে সুযোগ পেলে এ নিয়ে গবেষণার ইচ্ছা রাখি।

২ বিষয়গুলো আরো জটিল। আলোচনার সুবিধার্থে মোটা দাগেই কথা বলছি।

৩ কথাগুলো বলছি কারণ এ দেশের কিছু রেডিক্যাল ক্রিটিকদের মতে, ইসলামপন্থী জঙ্গিরা রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ শক্তি। দেখুন, "সন্ত্রাস, আইন ও ইনসাফ," চিন্তা, বছর ১৪, সংখ্যা ১, নভেম্বর ২০০৫/অগ্রহায়ণ ১৪১২।

www.pathagar.com

লক্ষ্যে আফগান মুজাহিদিনরা ঠিকই হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রিত হন, মার্কিনি শাসকদের সমাদর লাভ করেন।[৪] কিন্তু সমাজতন্ত্রের ভাঙনের পরে কুয়েত আক্রমণ, সৌদি আরবে মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রবেশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে লাদেন-আল কায়দা মার্কিনি সরকারের মিত্রশক্তি আর থাকেনি। ৯/১১-এর ঘটনায় বুশ সরকারের ভূমিকা নিয়ে কিছু প্রশ্ন আছে ঠিকই কিন্তু তা মার্কিনের জনচৈতন্যে এখনো প্রান্তিক। বুশের 'আমরা' (মানে, 'ভালো, সভ্য মার্কিনিরা') আর 'ওরা' (মানে, "জঙ্গি ইসলামপন্থীরা, সভ্যতার শত্রুরা") এই দ্বিবিভাজন এখনো বড়সড়ভাবে কায়েমি ফ্রেমওয়ার্ক। কারণ আরো আগে থেকেই জঙ্গি ইসলামপন্থীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়, বহিঃস্থ শত্রু হিসেবে জনমনে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কি ঘটে?[৫] প্রথমত, জোট সরকারের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের আকাশ থেকে পড়া এটিচিউড, কোন বাংলাভাই, কি বাংলাভাই, কোথায় বাংলাভাই, কেউ দেখছে নাকি বাংলাভাই... তারপর একের পর এক পাবলিক স্পেসে বোমা হামলা এবং সরকারের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, তারপর হঠাৎ কৌশল পাল্টে টেলি-তামাশার আয়োজন– জোট সরকারের এত রঙ-তামাশা এ দেশের পাবলিক খায়নি। আর যেখানে সরকারি জোটের ইসলামপন্থী অংশের মানে জামায়াতের ঐতিহাসিক ব্যাকগ্রাউন্ড, ১৯৭১-এর ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে গণহত্যাকারী। অর্থাৎ জোট সরকার পাঠ অনুসরণের চেষ্টা চালিয়েছে ঠিকই কিন্তু..., আচ্ছা এভাবে বলি, যারা ধরে নিয়েছিলেন সমস্যার নিষ্পত্তি টেলি-তামাশার মাধ্যমে করে ফেলতে পারবেন, তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, জামায়াতের গণহত্যাকারী ভূমিকা এসব হিসাবের বাইরে রেখেছিলেন। কিন্তু হিসাবের বাইরে রাখতে চাইলেই দেশের মানুষও যে হিসাবের বাইরে রাখবে, তা তো গ্যারান্টিড না। সোজা বাংলায় বললে, বেশি চালাকি করতে যেয়ে তারা নিজের গলায় দড়ি পরানো ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি। সরকার যে গুবলেট করে ফেলেছে, বোধহয় 'সম্মতি' শুধু এই একটা ব্যাপারেই সৃষ্ট হয়েছে। এখন আসি বিচার প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে। 'সরকার' এবং 'জঙ্গিবাদী' শক্তি যেহেতু প্রতিপক্ষীয় শক্তি নয়, এটা বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে না তা ভাবা কঠিন। আদালতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের শাস্তি কার্যকর করা হবে, নাকি কোনো বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তাদের 'ছেড়ে' দেয়া হবে, তা সময় বাতলে দেবে। এই মুহূর্তে অনুমান করা কঠিন, কারণ সামনের মাসগুলোতে কী ঘটতে যাচ্ছে তা বেশ অনিশ্চিত। শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পনামাফিক সবকিছু না-ও ঘটতে পারে।

২. মূল প্রশ্ন হচ্ছে, 'বিচার প্রক্রিয়ার' মাধ্যমে 'জঙ্গি' রাজনীতির 'মূলোৎপাটন' ঘটে কিনা, সেটা। তার কারণ, জঙ্গি রাজনীতি মাত্রই ইসলামপন্থী হবে তা ভাববার কোনো কারণ নেই। তা বামপন্থী হতে পারে বা অন্য যেকোনো পন্থী হতে পারে। আমার জানা মতে, বিশ্বের কোনো দেশে এমনটা ঘটে নাই। কিছু পশ্চিমা দেশে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি ১৯৬০-৭০-এর দশকে চরমপন্থী/জঙ্গি বাম রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে (ব্ল্যাক প্যান্থার, বাদের মাইনহফ ইত্যাদি)। পরবর্তীকালে সরকার তাদের সাংগঠনিক শক্তি গুঁড়িয়ে দেয়, কিন্তু সে কারণে এই দেশগুলোতে আবার এ ধরনের রাজনীতির উত্থান ঘটবে না, তা বলা যায় না। আরো কাছের নমুনা হচ্ছে ভারতের নকশাল রাজনীতি, কিংবা বাংলাদেশের চরমপন্থী রাজনীতি। তৎকালীন ভারত সরকার নকশালপন্থীদের বিচার (এবং অবিচার, উভয়ই) করেছিল, কিন্তু আমার জানামতে নকশালপন্থীরা বর্তমানে আবারো জোরদার হয়েছে। আর আরো ভালো উদাহরণ হচ্ছে নেপালের মাওবাদী রাজনীতি, তাদের উত্থানের কথা তো সবাই জানেন।

৩. এ দেশে জঙ্গিবাদী তৎপরতার পেছনের কারণ কী সেগুলো একে একে উল্লেখ না করে আমি বরং প্রশ্নটাকে একটু ভিন্নভাবে ধরব। আমার মনে হয়, কারণ বুঝতে চাওয়ার সাথে একটা বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তা হচ্ছে, আগে স্পষ্ট হতে হবে জঙ্গি ইসলামপন্থী তৎপরতাকে আমরা কোনো বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ কোনো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, কোনো রাজনৈতিক মানচিত্রে কি স্থাপন করব? আমার মতে, বর্তমানের জঙ্গি ইসলামপন্থী তৎপরতা ইতিহাস-বহির্ভূত নয়, এটা সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অংশবিশেষ। এ ধরনের আন্দোলন এই অঞ্চলে নতুন নয় (উদাহরণস্বরূপ, হাজী শরিয়তুল্লাহ, ফরায়েজি আন্দোলন)। এটা উপনিবেশকরণ, সাম্রাজ্যবাদ, পশ্চিমা শক্তিগুলো দ্বারা বাদ বাকি বিশ্বকে ভাঙা-গড়া, ফিলিস্তিনের প্রশ্ন, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলের ঐক্যবদ্ধ শাসকগোষ্ঠী, মার্কিন

---

৪ লাদেন ও তার অনুসারীরা মার্কিন নাগরিক ছিলেন না। জঙ্গিদের নেটওয়ার্কিং আঞ্চলিক, আবার আন্তর্জাতিকও; এ দেশের জঙ্গিদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে বিদেশ থেকে জঙ্গি আসে, এক দেশের জঙ্গি অন্য দেশে লড়তে যায়, তবে এ দেশে রাজনৈতিকভাবে ক্রিয়াশীল, মাঠে-ময়দানের জঙ্গিরা নিরঙ্কুশভাবে এ দেশীয়।

৫ বাংলাদেশ বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি নয় বরং গরিবতম দেশের একটি, এ বিষয় আমি পাশে সরিয়ে রাখছি। তার কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে, দেশ শাসনের কলাকৌশল নিয়ে।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব সাম্রাজ্য সৃষ্টি প্রকল্প– এসবের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সাম্রাজ্যবাদ যেমন একটা বৈশ্বিক ফেনোমেনন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাকারী ইসলামপন্থী মোর্চাও একটা বৈশ্বিক প্রপঞ্চ। বিষয়টা আপনার-আমার পছন্দ না-ও হতে পারে, কিন্তু সেটা ভিন্ন ব্যাপার। সমস্যা হচ্ছে, বাংলাদেশের সেক্যুলার মহল ইসলামপন্থী আন্দোলনের আবির্ভাবকে, জঙ্গিবাদের রাজনীতিকে একটা 'ষড়যন্ত্র' হিসেবে দেখে, এটাকে একটা 'মহাচক্রান্ত' হিসেবে দেখে, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করা ইত্যাদি হিসেবে দেখে। কিংবা সিআইএ-প্রসূত হিসেবে দেখে বা বেকারত্বের বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে দেখে। আমার মতে, এ ধরনের রেটরিক বিশ্লেষণের রাস্তা উন্মোচন করে না, বরং তা বন্ধ করে। জঙ্গি ইসলামপন্থী আন্দোলনকে বৈশ্বিক রাজনীতির মানচিত্রে স্থাপন করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক ভাঙনের প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবীভাবে চলে আসে। সমাজতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক ভাঙনের পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবির্ভূত হয় বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে। এই বস্তুগত ভিত্তি এবং আরো কিছু বৈশিষ্ট্য (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ-কনজারভেটিভ শাসকগোষ্ঠী, অস্ত্র উৎপাদন ইত্যাদি) আমেরিকার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্পকে বাস্তবতা দান করে। বিশ্ব সাম্রাজ্য সৃষ্টির এই প্রকল্পে মধ্যপ্রাচ্যের দেশকে রাজনৈতিক-ভৌগোলিকভাবে ঢেলে সাজানো জরুরি হয়ে পড়েছে দুটি কারণে: ক. ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় সীমানার নিরাপত্তা বিধান এবং খ. প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। আফগানিস্তান আর ইরাক আগ্রাসন তারই পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়েছে। আর এখন তো দেখা যাচ্ছে, ইরান আর সিরিয়া আক্রমণের আয়োজনেও বেশ এগিয়ে গেছে।[৬] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইমিডিয়েট সাম্রাজ্যিক স্বার্থ আর যুদ্ধ সিডিউলের বাইরে রণাঙ্গন খোলা হলে তা মার্কিন শাসকগোষ্ঠীর জন্য বিরক্তিকর। শুধু তাই নয়, সেটা তৈরি করবে একটা বাড়তি ও অনাকাঙ্ক্ষিত চাপ। আমার মনে হয়, মার্কিন সাম্রাজ্যিক অভিযানকে নস্যাৎ করার পাল্টা পরিকল্পনায় বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন আসি স্থানিক বিষয়ে। প্রথমেই একটা বিষয় স্পষ্ট করে নিই। জঙ্গি ইসলামপন্থী তৎপরতাকে বৈশ্বিক রাজনীতির মানচিত্রে স্থাপন করা জরুরি, এটা বলার অর্থ এই না যে 'স্থানিক' বিষয় গুরুত্বহীন বা স্থানিক রাজনীতি হচ্ছে 'বৈশ্বিক' রাজনীতির প্রতিচ্ছবি। বিষয়গুলো আরো অনেক বেশি জটিল। আমার মনে হয়, আওয়ামী লীগ আমলে (১৯৯৭-২০০১) পরবর্তী নির্বাচন জেতার আগাম কৌশল হিসেবে, জনসমর্থন বাড়ানোর লক্ষ্যে 'আওয়ামী লীগই একমাত্র মৌলবাদ ঠেকাতে পারবে,' এ রকম একটা প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়েছিল। যাহোক, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের[৭] প্রস্ফুটন নিয়ে কথা বলছি, জোট আমল নিয়ে কথা বলছি। প্রায় পাঁচ বছরের ট্র্যাক রেকর্ড দেখে আমার মনে হচ্ছে, জোট সরকারের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে, বিএনপি আর জামায়াতের মধ্যে, একটা 'বিনিময় মুদ্রা' (coin of exchange) কাজ করেছে: এক দল দেশের সম্পদ আর্থিকভাবে লুট করবে, সেটা আনচ্যালেঞ্জড ভাবে করবে এই শর্তে যে, অন্য দলকে তাদের শত্রু নিশ্চিহ্ন করতে দেয়া হবে।[৮] এক পক্ষ অপর পক্ষকে প্রোটেকশন দেবে। গত কয়েক বছরে যা যা ঘটেছে, আমার মতে, তার আর অন্য কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানো সম্ভব না। এখন এমন কিছু বিষয়ে আসি, যা আলাদা মনোযোগের দাবিদার। প্রথমত, জোট আমলে জঙ্গি তৎপরতার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ শিফ্‌ট লক্ষ্য করা যায়। এরশাদ-পরবর্তী যুগে, মানে গণতান্ত্রিক সরকার আমলে ইসলামপন্থী তৎপরতার লক্ষ্য ছিল 'উন্নয়ন' কর্মকান্ড। উন্নয়ন কর্মকান্ড বিবেচিত হয়েছিল খ্রিষ্টান কর্মকান্ড হিসেবে, ইহুদি নাসারার কর্মকান্ড হিসেবে। সেই যুক্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প আক্রমণের টার্গেটে পরিণত হয়। জোট সরকার আমলে সাধারণভাবে বলা যায় যে, জঙ্গি টার্গেট 'উন্নয়ন' কর্মকান্ড নয়। টার্গেট কী, তার আলোচনায় পরে আসছি।দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের জঙ্গি তৎপরতাকে অন্যান্য মুসলমান দেশের জঙ্গি তৎপরতার সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, আর-সব দেশে (উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, মিসর)[৯] টার্গেট হচ্ছে পশ্চিমা/মার্কিনি বাণিজ্যিক স্বার্থ কিংবা স্বশরীরে

---

৬ সৈনিক অপহরণের ছুতোয় ইসরাইল ইতোমধ্যে লেবানন আক্রমণ করেছে। হিজবুল্লাহকে বিনাশ করার পরিকল্পনায় ইসরাইল যদিও সফল হয়নি, সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক মনে করেন, যুদ্ধে হেরেও ইসরাইল লাভবান হয়েছে। কারণ লেবাননে ইউনিফিল বাহিনীর উপস্থিতি ইসরাইলের জন্য একটি বাফার জোন হিসেবে কাজ করছে। ইউনিফিল বাহিনীর উপস্থিতি ইসরাইলকে হিজবুল্লাহর আক্রমণ থেকে রক্ষা করছে, কিন্তু লেবাননকে ইসরাইলের আক্রমণ থেকে না। দেখুন, Robert Fisk, "Why should Europeans protect Israel? The enlarged Nato/Unifil force is not going to preserve 'peace,'The Independent" ,08/26/06, http://www.informationclearinghouse.info/article14708.htm

৭ উল্লেখ করা জরুরি যে, এ দেশের ইসলামপন্থী আন্দোলন এক এবং অভিন্ন নয়। বিভিন্ন দল ও মত রয়েছে। মতভেদও রয়েছে। মতভিন্নতা সত্ত্বেও ইসলামি ডিসকোর্সের অধিপতি ধারা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকেন্দ্রিক; যে দল বা ধারা জঙ্গি নয়, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা যাদের ইসলাম অনুশীলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়, তারা প্রান্তিক। পত্রপত্রিকার তথ্য মতে, জেএমবি বাদে আরো কিছু সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গি দল রয়েছে।

৮ তা নাহলে জোট শাসনামলে মৃত্যু-হত্যার আইনি, আধা-আইনি, বেআইনি যে ব্যবস্থা অধিষ্ঠিত হয়েছে, তা কীভাবে বুঝব?

৯ পশ্চিমা/মার্কিনি নেতৃত্বে সামরিকভাবে দখল করা দেশের কথা আমি বলছি না, যেমন আফগানিস্তান, ইরাক।

www.pathagar.com

পশ্চিমারা কিংবা তাদের আবাসস্থল বা তাদের পর্যটনের স্থান।[১০] জঙ্গি আক্রমণে স্থানীয় মানুষও মারা গেছে কিন্তু তারা প্রধান টার্গেট ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশে একটা ঘটনা বাদে– শাহজালালের মাজারে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর গ্রেনেড হামলা[১১] আর সব ঘটনার টার্গেট এ দেশের মানুষ, তা নির্দিষ্ট দলরূপে হোক[১২], কি নির্দিষ্ট স্থানে সমাগমকারী বা নির্দিষ্ট কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকারী (মাজার, সিনেমা, যাত্রা ইত্যাদি)। তার মানে, বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ বিশেষ ধরনের পাবলিক। পশ্চিমা বাণিজ্যিক স্বার্থ বা তার 'প্রতীকী' রূপ নয় (সেই একটা ঘটনা বাদে, যার টার্গেট ছিল ব্রিটিশ হাইকমিশনার)।[১৩] তৃতীয়ত, এখন শিফট প্রসঙ্গে আসি। জঙ্গিদের টার্গেট বুঝতে হলে ১৯৭১-এর ইতিহাস জানা জরুরি। এটা জোট আমলের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ১৯৭১-এর ইতিহাস না জানলে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কী এবং কেন তা বোঝা সম্ভব নয়। তার কারণ টার্গেটরা[১৪] সেই ইতিহাসে প্রোথিত। প্রশ্ন হচ্ছে, জোট সরকার গঠনের সাথে এই শিফট কী সম্পর্কিত? হলে, কীভাবে? এটাই কি জামায়াত আর বিএনপির 'সেইফ' মিলনভূমি? উভয় পক্ষের কমন শত্রু? জামায়াতের না হয় গণহত্যার[১৫] রেকর্ড আছে, কিন্তু বিএনপিকে কীভাবে বুঝব? এই প্রশ্নগুলো তোলা জরুরি।চতুর্থ বিষয় হচ্ছে, এ দেশের ইসলামপন্থী মহল এক এবং অভিন্ন নয়। জামায়াত এবং জেএমবির সম্পর্ক সম্বন্ধে বাজারে অনেক কথাই চালু আছে; বাস্তবে তাদের সম্পর্ক কী তা আমি জানি না।[১৬] যা সুস্পষ্ট তা হচ্ছে, জামায়াত ১৯৭১-এর গণহত্যাকারী শক্তি, গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সেই দলের নেতৃত্বে রয়েছে। নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও সার্বিকভাবে বললে জামায়াতের জনপ্রিয়তা কম। জোট আমলে জামায়াত তিনটি লক্ষ্য ধরে এগিয়েছে। আর্থিক সম্পদ গড়ে তোলা, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার পরিসরে অনুপ্রবেশ (সরকারি অফিস, মন্ত্রণালয়, সেনাবাহিনী, ব্যাংক, বীমা, শপিং মল ইত্যাদি) আর জেএমবির মাধ্যমে প্রধান রাজনৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক শত্রুদের হত্যা করা, ত্রাস সৃষ্টির অভিযানের সূত্রপাত ঘটানো। এখন জেএমবি প্রসঙ্গে আসি। এটা একমাত্র জঙ্গি দল নয়, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নির্ভরযোগ্য খবর মতে, বাংলাদেশে আরো জঙ্গি দল রয়েছে। জেএমবি আল কায়দা প্রভাবিত। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের মডেল হচ্ছে তালেবান। পশ্চিমা ঢঙের রাষ্ট্র তাদের ভাষ্যমতে "তাগুতের সরকার" (১৭ আগস্ট ২০০৫-এর লিফলেট)। সশস্ত্র উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা এবং সশস্ত্র উপায়ে টিকে থাকা, একটি শান্তিমূলক শক্তি হিসেবে, শারীরিক বল প্রয়োগের ভিত্তিতে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য সত্য। জামায়াতের লক্ষ্যও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কিন্তু সেটা সম্ভবত সৌদি মডেলের। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদারি, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ মার্কিনের কাছে হস্তগত করা, ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ গড়ে তোলা, ইসলামপন্থী জঙ্গি দলকে গোপনে কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে ক্ষমতায় টিকে থাকা, ফিলিস্তিনিদের সাথে গাদ্দারি করা ইত্যাদি। অন্যভাবে বললে জামায়াত এবং জেএমবির গাঁটছড়া যা-ই থাকুক না কেন, জেএমবির কিছু স্বতন্ত্র এজেন্ডা আছে, মার্কিন স্বার্থবিরোধী এজেন্ডা আছে বলে আমার ধারণা। দীর্ঘ এই বয়ানের মধ্যে পাঠককে জঙ্গি তৎপরতার 'কারণ' খুঁজে বের করার অনুরোধ জানাচ্ছি! আরেকটি জিনিস, একেবারে সাম্প্রতিক ঘটনা, এখনো চলছে, বিএনপি এখন জোটের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার ভারসাম্যকে রিকনফিগার করার তাগিদ বোধ করছে, জোটের সেক্যুলার অংশকে ভারি করার তাগিদ বোধ করছে। আর এই কারণেই এরশাদকে জোটে আনার তৎপরতা, দুর্নীতির সব মামলা খারিজ করা এসব চলছে। ব্যাপারটা কী, তাড়না কোত্থেকে তা আরেকটু সময় পার হলে স্পষ্ট হবে।

৪. উপরে আলোচিত, ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

---

১০ এর ব্যতিক্রম হচ্ছে পাকিস্তান যেখানে সংখ্যালঘু শিয়া সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু সুন্নি আক্রমণের শিকার।

১১ আর এটাকে কীভাবে বুঝব? স্ক্রিপ্ট-বহির্ভূত কর্মকান্ড হিসেবে?

১২ তার মধ্যে আমি আহমদিয়া সম্প্রদায়কেও অন্তর্ভুক্ত করছি।

১৩ বরং, জোট আমলে পশ্চিমা বাণিজ্যিক স্বার্থ প্রতিরোধকারী শক্তি হচ্ছে প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি (বাম দল, আদিবাসী, পরিবেশবাদী, স্থানিক বাঙালি) এবং ধারাবাহিকভাবেই।

১৪ আওয়ামী লীগ, উদীচী, লেখক, বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, রমনা বটমূলে নববর্ষের উদযাপনী অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

১৫ সেক্যুলার মহলের যারা মনে করেন, ইসলামপন্থী/ধর্মীয় রাজনীতির পরিসমাপ্তি অনিবার্যভাবেই গণহত্যাকারী হবে, তাদের সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করি। বিংশ শতকের বড়সড় গণহত্যা সেক্যুলার শক্তি ঘটিয়েছে : জার্মানি (ইহুদি হত্যা), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (হিরোশিমা-নাগাসাকি, ভিয়েতনামের মি লাই), সোভিয়েত ইউনিয়ন (স্টালিন যুগে)।

১৬ জামায়াত এবং জেএমবির রাজনীতি ও অবস্থানকে আমি আগের একটি লেখায় এক করে দেখেছি (দেখুন, "প্রাক-কথন," ইসলামী চিন্তার পুনর্পঠন। সমকালীন মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রাম, সঙ্কলন ও অনুবাদ, রেহনুমা আহমেদ, একুশে পাবলিকেশন্স: ঢাকা, ২০০৬)। এই অনুচ্ছেদে আমি সেই জট ছাড়ানোর চেষ্টা করেছি।

www.pathagar.com

৫. শেষ হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয় না, আমার মনে হয় বর্তমান অবস্থাকে বলা যেতে পারে, নির্বাচনের ঝড়ের আগের ঘনঘটা। তবে কীভাবে, সে ব্যাপারে অনুমান করার মতো তথ্য আমার জানা নেই। এটুকু অনুমেয় যে, জঙ্গি ইসলামপন্থী দলগুলো বিএনপি কিংবা জামায়াতের ইচ্ছানুসারেই কাজ করবে বা তাদের পরিকল্পনা-মাফিক কাজ করবে, তা ধরে নেয়া ঠিক হবে না। একাধিক জঙ্গি দল রয়েছে, জামায়াত এবং বিএনপির সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে অনুমেয়, কিন্তু একইসাথে তাদের স্বতন্ত্র এজেন্ডাও আছে বলে মনে হয়।

৬. আন্তর্জাতিক ব্যাপার নাকি অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, এই প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি (দেখুন প্রশ্ন ৩-এর উত্তর)। আপনারা অনুমতি দিলে আমি বরং আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে দুটো কথা বলতে চাই।

বাংলাদেশের জঙ্গিবাদী তৎপরতাকে আমি 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যায়িত করতে চাই না এই যুক্তিতে যে, এটি বুশীয় সাম্রাজ্যবাদী ভাষার অংশ ('সন্ত্রাসবাদ', 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ')। বুশীয়/সাম্রাজ্যবাদী ফ্রেমওয়ার্কে শুধু জঙ্গি/ইসলামপন্থী দলগুলো 'সন্ত্রাসী'। শুধু ভাষা না, এই ভাষা যেই বিশ্লেষণাত্মক পরিকাঠামোয় অন্তর্নিহিত আমি নিজেকে তার থেকে দূরে রাখা জরুরি মনে করি। আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলি। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আফগানিস্তান ও ইরাক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবলে, যার কারণে অগণিত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, রোজ হারাচ্ছে। মার্কিনি সাহায্য-সমর্থনে ফিলিস্তিনিদের স্বাধিকার আন্দোলন পাঁচ দশকের অধিক সময় ধরে অস্বীকৃত, ভূলুণ্ঠিত। আগ্রাসনের তালিকায় সর্বশেষে যোগ হয়েছে লেবানন। এখন ব্যাপার হলো, আমরা পছন্দ করি আর না করি, জঙ্গি/ইসলামপন্থী দলগুলো (হামাস, হিজবুল্লাহ ইত্যাদি) সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধ করছে। বিশ্বায়নের এই যুগে এসব বিষয় মাথায় রাখতেই হবে। এ কারণে আমার মনে হয়, জঙ্গি/ইসলামপন্থী দলগুলোকে অনায়াসে 'সন্ত্রাসী' বলাটা বিপজ্জনক। কারণ তাহলে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, তার ভয়াবহতা, অন্যায়ের ব্যাপারে প্রতিরোধ করার ভাষা আমরা হারিয়ে ফেলি[১৭] (আর বুশের 'আমরা ভালো', 'ওরা খারাপ'– এই দ্বৈত বিভাজনে আটকা পড়ি)। এ বাদে আরেকটি বিষয় এর সাথে জড়িত। বুশীয় ভাষার নিরন্তর পুনরাবৃত্তি আমাদের ভুলে যেতে সাহায্য করে যে আধুনিক যুগের বর্তমান পর্যায়ে, খোদ আধুনিক রাষ্ট্র সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী শক্তি (ত্রাস সৃষ্টি করতে পারার সামর্থ্য, ক্ষমতা-অর্থে)।

৭. আমার মনে হয়, সরকার জঙ্গিবাদ মোকাবিলা করার নামে এমন আইনি পরিবর্তন এনেছে যা মূলত বিরোধী দলের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদী সামাজিক শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়–যাবে (তা অবশ্য আগের সরকারগুলোও করেছে; আর বর্তমানে পশ্চিমা-অপশ্চিমা উভয় দেশের সরকারই একই জিনিস করছে)।

৮. আমার জানামতে, এ দেশের সেক্যুলারিস্ট মহলের মানুষজন প্রায়শই এই কথাগুলো অভিযোগ আকারে উচ্চারণ করেন। অভিযোগ-পাল্টাঅভিযোগ যেহেতু জটিল বিষয়াদি বুঝতে সাহায্য করে না, তাই আমার এক্ষেত্রে বলার কিছু নেই। আমি ধরে নিচ্ছি, যারা এই অভিযোগ তোলেন তারাই ভালো বলতে পারবেন। প্রশ্ন হচ্ছে, অবজেক্টিভলি বলতে গেলে, বিএনপি যদি একা দেশ শাসন করত তাহলে কি জঙ্গিবাদী রাজনীতি এতটা 'শক্তিশালী' হতো? আমি জানি না, হয়তো না, তবে এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত নই। আমার মনে হয়, জঙ্গিবাদের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক (যার সাথে অস্ত্র চোরাচালানি সম্পর্কিত, যা ব্যবসা হিসেবে খুবই লাভজনক), বিএনপির ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাওয়া শুধু নির্বাচনী কারচুপির কলাকৌশলে সীমাবদ্ধ থাকত না। আমার মনে হয়, বিএনপির নতুন প্রজন্ম শাসন ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার প্রকল্প শেষ মুহূর্তের জন্য রেখে দিত না, আমার মনে হয় তারা আগে থেকেই কলাকৌশল ঠিক করত (আমার মনে হয় তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই 'এ অঞ্চলে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠা/পুনঃপ্রতিষ্ঠা'র তত্ত্ব কাজে লাগানোর চেষ্টা চালাত), সে কৌশল ধরেই এগোত এবং অপশান যেহেতু সীমিত (আমি বোঝাতে চাচ্ছি, সীমাহীন নয়, তা বিএনপি হোক, কি আওয়ামী লীগ হোক), বিএনপির বয়োকনিষ্ঠ শাসকচক্রের কাছে, ইসলামপন্থী-জঙ্গি রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা একটি সম্ভাব্য অপশান হিসেবে দেখা দেয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল জামায়াতে ইসলামীর সাহচর্য

---

১৭ এই বিষয়গুলো নিয়ে তর্কবিতর্ক বহু দেশের বুদ্ধিজীবী মহলেই হচ্ছে: সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশে সমাজতন্ত্রের ভাঙনের পর, পরিবর্তিত রাজনৈতিক মানচিত্র বোঝার তাগিদে যেমন হচ্ছে, চিরাচরিত রাজনৈতিক পক্ষ-বিপক্ষ বর্তমানের পরিস্থিতি বোঝার জন্য পর্যাপ্ত কিনা, নাকি ক্যাটাগরিগুলোর (লিবারেল, লেফ্‌ট, প্রগ্রেসিভ) পুনঃসংজ্ঞায়ন প্রয়োজন ইত্যাদি কারণে। মার্কিনি দখলাধীন মুসলমান দেশগুলোতে ইসলামপন্থী শক্তি হচ্ছে একটি 'প্রতিরোধী' এবং 'সমর্থনযোগ্য' শক্তি, তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী যেমন নোম চমস্কি, তারিক আলী, অরুন্ধতী রায়, জন বার্জার মনে করেন। তারা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার মানুষজন এবং তাদের প্রতিরোধী শক্তি (অর্থাৎ হামাস, হিজবুল্লাহ) উভয়কেই সমর্থন জানাচ্ছেন। আরো দেখুন, অরুন্ধতী রায়ের The Algebra of Infinite Justice (Penguin Books: New Delhi, 2001) বইয়ে John Berger-এর লেখা Foreword যেখানে তিনি প্রথম বিশ্বের/পুঁজিবাদের "secular fanaticism"-এর কথা বলছেন (পৃ. xvi)।

www.pathagar.com

ব্যতিরেকেই। কিন্তু এই ভাবনাগুলো খুবই স্পেকুলেটিভ।

৯. পাবলিক ডিসকোর্সে থাকা, না থাকা অনেকাংশে নির্ভর করে মিডিয়া রিপোর্টিংয়ের ওপর। আর মিডিয়া রিপোর্টিং খোদ নানান উপাদান বা পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত, তা ভুলে গেলে চলবে না। বর্তমান পরিস্থিতি 'ঝড়ের আগের স্তব্ধতা' ইঙ্গিত করে। নির্বাচন সামনে, নির্বাচনকে সামনে রেখে নানান হিসাব-নিকাশ চলছে, নানান দেয়া-থোওয়া-ডিলিং চলছে। তবে আমার এও মনে হয় যে, খোদ জঙ্গি দলগুলোর জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ নয়, যেহেতু নির্বাচনী রাজনীতি, সংসদীয় রাজনীতির প্রতি তাদের কোনো অঙ্গীকার নেই।

১০.ক. অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হওয়া (যেমন, 'সন্ত্রাসী', 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' বুশীয় ভাষা, তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখা; বর্তমান বিশ্ব বিশ্বায়নের যুগের বিশ্ব, তা মাথায় রাখা; জঙ্গি-ইসলামপন্থী শক্তিও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি ইত্যাদি মনে রাখা)।

খ. সম্ভাব্য সব ফ্রন্টে লড়তে থাকা। সোচ্চারভাবে। তবে কোনো সন্দেহ নেই যে বর্তমান সময় খুবই বিষণ্ন, এ দেশে, সমগ্র বিশ্বে। ইতালীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামসির সতর্কবাণী জপতে থাকি, 'Pessimism of the intellect, optimism of the will.'

সাক্ষাৎকার প্রদানের সময় : ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬

"ইসলামি শাসন কায়েমের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করাই জঙ্গি হামলার লক্ষ্য"

ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী
আইনজীবী সম্পাদক, বাংলাদেশ লিগ্যাল ডিসিশনস

১. দেশব্যাপী বোমা হামলার প্রায় ৬ মাস পরে গ্রেফতার করা হয় শীর্ষ জঙ্গি নেতা শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলাভাইকে। তাদের গ্রেফতারের কায়দা ছিল নাটকীয়। গ্রেফতারের পর তাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় দীর্ঘদিন। কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে উদ্ঘাটিত তথ্যের মধ্যে তাদের অর্থায়নের উৎস ও মদদদাতাদের বিষয় কোনো কিছু প্রকাশ করা হয়নি। আদালত থেকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হলেও তাদের কনডেম সেলে না রেখে সাবজেল ঘোষণা করে কারাগারের বাইরে রাখার ব্যবস্থা করে নতুন করে আইনি বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। জঙ্গি নেতাদের প্রতি এ ধরনের আচরণের আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জঙ্গিদের এ ধরনের খোলামেলা সাবজেলে রাখা কতখানি নিরাপত্তা প্রদান করা হবে তাও অনিশ্চিত। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদরাও সাবজেলে থাকার তেমন সুযোগ পাননি। এছাড়া জঙ্গিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা নিয়ে চলছে বিভিন্ন কৌশল। তদন্তে ধীরগতি, গাফিলতির অভিযোগ অন্যতম। রাজধানীতে দায়ের করা মামলার তদন্ত ঝিমিয়ে পড়ার অভিযোগও রয়েছে। দায়ের করা ১৮টি মামলার মধ্যে মাত্র ৩টিতে এক বছরে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। ১৭ আগস্ট ২০০৫-এর পর দায়ের করা ২৪১ মামলার মধ্যে ৪১টি মামলার চার্জশিট দেয়া হয়নি। ৭টি মামলার বিচার শেষে শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলাভাইসহ ৩২ জনের ফাঁসির আদেশ হয় (জনকণ্ঠ, ১৭/৮/০৬)।

বাংলাভাই ও শায়খ আব্দুর রহমানকে 'জামাই আদরে' রাখা হচ্ছে এই অভিযোগ তোলা হলেও বাস্তবে অবস্থার কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। মিরপুরে তাদের বিশেষ ভবনে আরাম-আয়েশে রাখা হয়েছে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

দায়েরকৃত মামলার প্রকৃত ও সুষ্ঠু তদন্তের মধ্য দিয়ে বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি প্রদান আবশ্যক। নইলে দেশে আইনের শাসন চরমভাবে ব্যাহত হবে।

২. জামা'আতুল মুজাহিদিনের প্রধান শায়খ আব্দুর রহমান ও জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশের নেতা সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই এবং হরকাতুল জিহাদের নেতা মুফতি হান্নান সবাই শীর্ষ জঙ্গি নেতা। সরকারের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা থাকলে এই শীর্ষ নেতাদের কাছ থেকে তথ্য উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে জঙ্গিদের মূল উৎপাটনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু বর্তমান বিচার প্রক্রিয়া যেভাবে চলছে তাতে সেই আসল জায়গা অর্থাৎ সরকারের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার বিষয়টি বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ছে। যদিও সরকার প্রথম থেকে বলে আসছে যে, দেশে কোনো জঙ্গি মৌলবাদী তৎপরতা নেই, প্রকৃত ক্ষেত্রে জঙ্গি তৎপরতা সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে লালিত হচ্ছে। এই প্রশ্রয়ের উদাহরণ হচ্ছে, বাংলাভাই মানুষ মেরে টাঙিয়ে রাখার পরও এই সরকার বলেছে বাংলাভাই মিডিয়ার সৃষ্টি। তাছাড়া সংসদ ভবনে ঢোকার সময় ধরা পড়েছিল দুই জঙ্গি। তারা জামায়াতে ইসলামীর এক এমপির কাছে যাচ্ছিল বলে জানায়। প্রকাশিত খবরে জানা যায়, দিনভর স্পিকার অফিসে বিভিন্ন এমপি জঙ্গিদের ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য বারবার টেলিফোনে চাপ সৃষ্টি করে ও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তারা ছাড়া পায় (জনকণ্ঠ, ১৬/৯/০৬)। আবার রাজশাহীর বাগমারার জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের শীর্ষ নেতা বাংলাভাইয়ের অপারেশন সহযোগী মাহাতাব খামারুকে র‍্যাব সদস্যরা ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের পর বাড়ি পৌঁছে দেয় (প্রথম আলো, ২৯/১১/০৫)। মুফতি হান্নানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত চারটি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছেন দুই মন্ত্রী ও গোপালগঞ্জ জেলা বিএনপি নেতারা (জনকণ্ঠ, ৭/১০/০৫)। আজ অবধি কোনো জঙ্গির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়নি। সরকারের আন্তরিকতার অভাবের বিষয় আরো সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, যখন বিদেশি মেহমান এলে কিছু জঙ্গি ধরা পড়ে। সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'একজন করে বিদেশি মেহমান আসেন, ঠিক তখনই কিছু জঙ্গি ধরা হয়। এসব জঙ্গি ধরার নাটক সরকারের আইওয়াশ ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ যখন ভারত সফরে তখন শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলাভাইকে ধরা হলো' (জনকণ্ঠ, ৪/৮/০৬)। আবার যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড বাউচার বাংলাদেশে আসেন, তখন ময়মনসিংহের ভালুকার জীবনতলা মাদ্রাসা থেকে জঙ্গিরা গ্রেফতার হয় (জনকণ্ঠ, ৩/৮/০৬)। তাই জঙ্গিদের মূল উৎপাটনে এ ধরনের প্রক্রিয়া কতখানি কার্যকর তা বলা দুষ্কর।

৩. বাংলাদেশের সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থা ধ্বংস করে তৎস্থলে ইসলামি শাসন কায়েমের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করাই জঙ্গি হামলার লক্ষ্য। জঙ্গিরা বিশ্বে বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে পরিচিত হোক তা চায় না। তারা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কপালে কালিমা লেপন করে বাঙালি জাতিকে বিশ্ব দরবারে একটি সন্ত্রাসী, সাম্প্রদায়িক জাতিরূপে দেখাতে চায়। সরল, ধর্মভীরু মানুষকে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করতে জঙ্গিরা উদ্যত। বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাকে ব্যাহত করতে চায়।

৪. অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা পর্যুদস্ত করে ইসলামি শাসন কায়েম করতে চায়। ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত খবরে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের সাথে জামায়াতে হরকাতুল জিহাদ (পাকিস্তান), আল কায়দা আফগানিস্তানের সাথে সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশের ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকায় জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিতে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইর সম্পৃক্ততা রয়েছে (জনকণ্ঠ, ৩/৮/০৬)। তাই জঙ্গি তৎপরতার নেপথ্যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রভাব উপেক্ষা করা যায় না।

৫. একথা ঠিক যে, বাংলাদেশে জঙ্গি হামলা আকস্মিকভাবে ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করেছে। তবে এই তৎপরতা মোটেই আকস্মিক নয়। বরং দীর্ঘদিন ধরে সুপ্ত বীজ থেকে সুপরিকল্পিতভাবে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠা একটি বিষয়। আর তাই এই তৎপরতা হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে এই ধারণা করা ঠিক হবে না। আপাতদৃষ্টিতে জঙ্গিদের কার্যকলাপ বাহ্যিকভাবে দৃশ্যত না হলেও বা নিষ্ক্রিয় মনে হলেও, জঙ্গিরা ঘাপটি মেরে বসে নেই। তারা তাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, অর্থ সঙ্কুলান করা, নেটওয়ার্ক সুবিন্যস্ত করার মধ্য দিয়ে তারা আরও সুসংগঠিত হচ্ছে এবং সুযোগ বুঝে আবারও হামলা চালাতে পারে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে আশঙ্কা করা হয়েছে যে, আসন্ন নির্বাচনের আগে জেএমবি আরেকদফা হামলার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। জেএমবির আকস্মিক নীরবতা কোনো বড় ধরনের ঝড়ের আভাস বহন করে কিনা তাও ভাববার বিষয় (জনকণ্ঠ, ৯/৮/০৬)।

৬. বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী তৎপরতা কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন একক বা অভ্যন্তরীণ বিষয়রূপে দেখার বা ভাবার কোনো

www.pathagar.com

অবকাশ নেই। বিশ্বায়নের এই যুগে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের একটি অংশরূপে দৃশ্যমান। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর ও রিপোর্টের ভিত্তিতে দেখা যায়, আফগান-কাশ্মিরের জিহাদিরা বাংলাদেশে হরকাতুল জিহাদ গড়ে তোলে। আফগান যুদ্ধে ফিরে আসা জিহাদির সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। রমনা বটমূলে বর্ষবরণ, সিলেটে হজরত শাহজালালের (রহঃ) মাজারে ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে হত্যার চেষ্টা, যশোরে উদীচীর সমাবেশ, কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনার সমাবেশসহ দেশের আটটি বড় বোমা হামলার ঘটনায় হরকাতুল জিহাদের হাত রয়েছে বলে জিজ্ঞাসাবাদে র‍্যাবকে তথ্য দেয় হরকাতুল জিহাদের প্রধান মুফতি হান্নান (প্রথম আলো, ১০/১০/০৫)। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থানের সাথে রোহিঙ্গা ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগ রয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয় (ভোরের কাগজ, ২০/৮/০৫)। ছাত্রশিবিরের সদস্যদের মধ্যে প্রায় ১ হাজার ৮০ জন আফগান যুদ্ধে তালেবান সদস্যরূপে অংশ নিয়ে দেশে ফিরে আসে। আফগান মুজাহিদদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয় (সংবাদ, ৪/১২/০৫)। এছাড়াও জঙ্গি তৎপরতা সুসংগঠিতভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে যে অর্থের প্রয়োজন তা সঙ্কুলান করা হচ্ছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎস থেকে (ডেইলি স্টার, ৩/৯/০৫)। এক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে দেখা যায়, কুয়েতে অবস্থিত একটি সংস্থা ও ইউকে'র একজন মসজিদের ইমাম ১৭ আগস্ট ২০০৫ সারাদেশে একযোগে ৫০০ স্থানে বোমা হামলা চালানোর আর্থিক ব্যয় বহন করে। তাছাড়া একযোগে সারাদেশের ৬৩ জেলায় জঙ্গিদের বোমা হামলা চালানোর বিশ্বস্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ৮ বছরে ব্যয় হয়েছে ১২শ' কোটি টাকা। জুলাইয়ের শেষ থেকে আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় প্রথম আলোর অনুসন্ধানে জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিনের অর্থায়নে কুয়েত ও সৌদি আরবের একাধিক এনজিওর সংশ্লিষ্টতার বিষয় প্রকাশ পায় (প্রথম আলো, ২৮/৮/০৫)। অতএব একথা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মদদপুষ্ট। বাংলাদেশের জঙ্গিচক্রের সাথে আন্তর্জাতিক সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বারও যোগাযোগ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয় (জনকণ্ঠ, ১৭/৮/০৬)।

৭. জঙ্গিবাদ দমন ও নির্মূলে সরকারের গৃহীত যে কোনো পদক্ষেপ যদি সফলতা আনতে পারে তাহলে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। তবে এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপ তেমন ফলপ্রসূ মনে হচ্ছে না এবং পর্যাপ্ত নয়। তাই জঙ্গি দমনে আরও সক্রিয় ও আন্তরিক উদ্যোগ প্রয়োজন যার অভাব রয়েছে।

৮. আমি অভিযোগের সাথে একমত। এ ধরনের অভিযোগের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় প্রকাশিত বিভিন্ন খবরে। জনকণ্ঠে ১৭ আগস্ট ২০০৬-এ প্রকাশিত এক খবরে জঙ্গিদের সাথে জামায়াতের সম্পর্কের বিষয়টি আবারও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৭ আগস্ট ২০০৫ বোমা হামলার পর রাতে সাতক্ষীরা জেলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয় শিবিরকর্মী ও কলারোয়ায় জামায়াতের এক নেতার পুত্র। জামায়াত পরিচালিত ইসলামী ব্যাংককে জঙ্গি অর্থ লেনদেনের জন্য জরিমানাও দিতে হয়।

৯. জেএমবিসহ অন্য সব জঙ্গি সংগঠনের কার্যকলাপ উদ্ঘাটন ও জড়িতদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাংলাদেশ থেকে সব জঙ্গি তৎপরতা নির্মূলের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এক্ষেত্রে জড়িত সব সংগঠনের স্বরূপ উন্মোচন করে একইভাবে আইনের আওতায় এনে বিচার নিশ্চিত করা জরুরি। যদিওবা চট্টগ্রামে হিজবুত তওহীদের ৭ জন সদস্য গ্রেফতার হয়েছে বলে খবরে প্রকাশিত হয়েছে। জঙ্গি তৎপরতা সমূলে উৎপাটনের আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে অভিযান চালানোর প্রয়োজন রয়েছে।

১০. বর্তমান প্রেক্ষাপটে আর কালক্ষেপণের কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশ থেকে জঙ্গি তৎপরতা নির্মূলে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে প্রধানত–

- জঙ্গি কর্মকান্ডের অর্থায়নের উৎস খুঁজে বের করা ও বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা, আইনের আওতায় এনে প্রকৃত তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা, বিচার করা ও শাস্তি প্রদান করা;
- জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ ঘাঁটি চিহ্নিত করা ও উৎখাতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া;
- জঙ্গি তৎপরতার মদদদাতা ও গডফাদারদের বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করা;
- জঙ্গি তৎপরতা ও কার্যকলাপের ব্যাপারে ব্যাপক গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রতিটি মসজিদে নামাজের সময় খুতবা প্রদানের মধ্য দিয়ে জঙ্গি কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা জানানো এবং জিহাদের নামে ধর্মবিরোধী সব বিধ্বংসী কর্মকান্ড প্রতিহত করার আহ্বান জানানো আবশ্যক। ইসলামে আত্মহত্যা মহাপাপ বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রয়োজন। ছেলেমেয়ে ও শিক্ষার্থীদের মাঝে ধর্মের সঠিক পথ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা ও আত্মঘাতী কার্যক্রম থেকে

www.pathagar.com

তাদের বিরত রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া। ধর্মপ্রাণ নিরীহ মানুষকে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার অপপ্রয়াস বিভ্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক;

- বোমা তৈরির সরঞ্জাম, বিস্ফোরক, অস্ত্র আমদানি ও বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন এবং এর উৎস চিহ্নিত করা।

সাক্ষাৎকার প্রদানের তারিখ: সেপ্টেম্বর ২০০৬

"সরকার বহুদিন শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিদের নানাভাবে নিরাপদ রেখেছে"

ড. আসিফ নজরুল
অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১. সরকার বহুদিন শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিদের নানাভাবে নিরাপদ রেখেছে। দেরিতে হলেও যে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে এটি আশাব্যঞ্জক। তাদের বিচারও সুষ্ঠুভাবে চলছে। তবে নিম্ন আদালতে তাদের মৃত্যুদন্ড দেয়া হলেও, আপিল আদালতে কবে বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায়ও আসামিদের মৃত্যুদন্ডের রায় হয়েছে, কিন্তু তার আপিল নিষ্পত্তি গত সাত বছরেও হয়নি। জঙ্গি নেতাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর হলেই কেবল ন্যায়বিচার হয়েছে বলা যাবে।

২. সাময়িকভাবে জঙ্গিদের তৎপরতা বন্ধ হবে। তবে এই বিচার তাদের মূলোৎপাটনে খুব বিশাল কোনো ভূমিকা রাখবে না, যদি জঙ্গি তৎপরতার কারণগুলো দূর করা না হয়। তবে এই কারণগুলো অচিরেই সম্পূর্ণভাবে দূর করা কোনো সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না।

৩. অনেক কারণ আছে। আন্তর্জাতিক কিছু কারণ আছে। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলমানদের ওপর যে নিপীড়ন ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে এবং তাদের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে, তা বিভিন্ন দেশে ধর্মান্ধ মানুষদের জঙ্গিবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মুসলিম জঙ্গিদের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এই সুযোগ নিয়ে তাদের তৎপরতার বিস্তার করেছে অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও। জঙ্গিবাদের বহু দেশজ কারণও রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানুষের মধ্যে সুতীব্র বঞ্চনাবোধ, শাসক ও ক্ষমতাশালী শ্রেণীর সীমাহীন দুর্নীতি, সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ করে সরকারের ব্যর্থতা, সরকার কাঠামোতে জঙ্গিবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল বা নমনীয় রাজনৈতিক দলগুলোর উপস্থিতি, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলামে ধর্মের অপব্যাখ্যা, জঙ্গিদের জামিন দেয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ ও আদালতের নমনীয়তা, জঙ্গিবাদ বিরোধিতার নামে কোনো কোনো মহল কর্তৃক ঢালাওভাবে ইসলামি দলগুলোর সমালোচনা ইত্যাদি।

৪. এর ঘোষিত লক্ষ্য ইসলামি শাসন কায়েম করা। কিন্তু আমার ধারণা, এর আরো কিছু হিডেন এজেন্ডা রয়েছে। এগুলো বহু ধরনের হতে পারে। যেমন– বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্টের ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে এটি। সরকারকে সমস্যায় ফেলা, বিরোধী দলের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করা বা বিদেশী মহলগুলো কর্তৃক বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ সম্প্রসারিত করার লক্ষ্য থেকেও জঙ্গি তৎপরতা চালানো হতে পারে। এর আসল লক্ষ্য উদ্ঘাটনের ক্ষমতা একমাত্র সরকারের রয়েছে; কিন্তু সরকার এটি করবে বলে মনে হচ্ছে না।

৫. খুব নাটকীয় মনে হচ্ছে না। শীর্ষস্থানীয় সব নেতাকে গ্রেফতার করার পর জঙ্গি তৎপরতা সাময়িকভাবে থেমে যাবে

www.pathagar.com

এটিই স্বাভাবিক। এমনও হতে পারে যে, সরকার পরিকল্পনা করেই তাদের মেয়াদ শেষের সময়ে এসে এসব গ্রেফতার করেছে, যাতে জনগণ ও আন্তর্জাতিক মহলে এই ধারণা দেয়া যায় যে, জঙ্গিবাদ দমন করা কেবল এই সরকারের পক্ষেই সম্ভব।

৬. দুটোই হতে পারে। হয়তো অভ্যন্তরীণভাবে বিকশিত হয়েছে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার সাহসের ওপর ভিত্তি করেই।

৭. নীতি আর আইন প্রণয়ন বা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি এসবই হয়েছে মূলত সরকারের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার চিন্তা থেকে। দুর্বল গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক শক্তির দেশে অনেক সময় সরকারকে বাধ্য হয়েও বিদেশী পরামর্শ মেনে এসব করতে হয়। আর এসব করতে গিয়ে সরকার নিজের স্বার্থও এই প্রক্রিয়ায় নিশ্চিত করে ফেলে।

৮. এই অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য। জামায়াতে সরাসরি জঙ্গিবাদীদের সাহায্য না করলেও সরকারে তারা থাকার কারণে জঙ্গিরা নানাভাবে উৎসাহ পেয়েছে।

৯. অন্য জঙ্গিরা এখন কিছুটা নীরব রয়েছে। উপযুক্ত সুযোগ ও সময়ে এরা আবারো তৎপর হতে পারে। এদের বিষয়ে মিডিয়া ও নাগরিক সমাজকে সোচ্চার হতে হবে। বিরোধী দলেরও উচিত, অন্য জঙ্গিদের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে চাপের মধ্যে রাখা।

১০. করণীয় তো অনেক কিছুই আছে। তবে আমাদের গণতন্ত্রকে সংহত করা গেলে, দেশে সম্পদ বণ্টনে চরম অব্যবস্থা দূর করা গেলে, মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলামকে যৌক্তিক করা গেলে জঙ্গিবাদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

সাক্ষাৎকার প্রদানের তারিখ : ২৫ জুলাই, ২০০৬

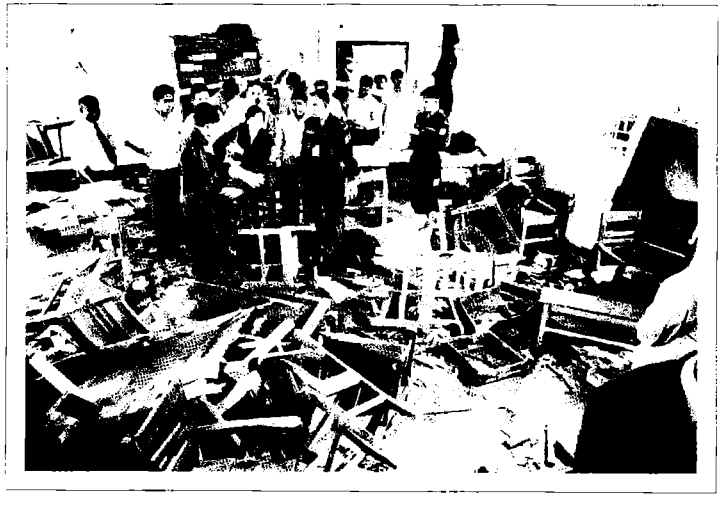

www.pathagar.com

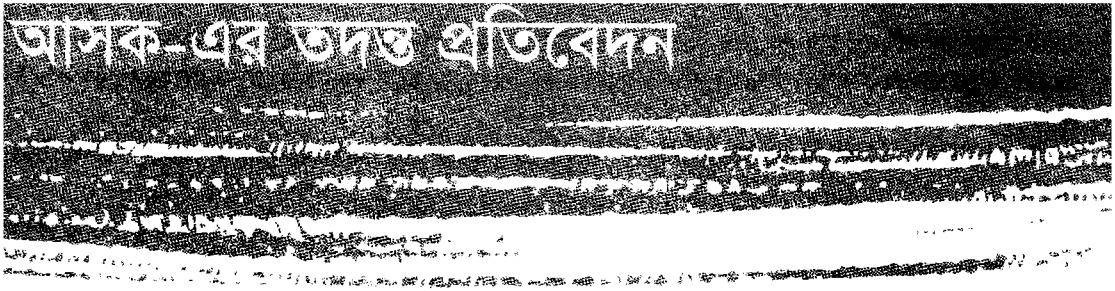

২০০৪-এর ২৫ মে বাংলাভাইয়ের রাজশাহী-নওগাঁ অঞ্চল ত্যাগ করার পরপর ১-৬ জুন আসক-এর দুটি তদন্ত দল অনুসন্ধান চালায় রাজশাহীর বাগমারা ও নওগাঁর রানীনগর উপজেলায়। বাংলাভাইয়ের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তার ও তার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ এবং নির্যাতনের স্মৃতি ও প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কায় ত্রস্ত ছিল আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং এলাকাবাসী। এরকম অবস্থায় তদন্তকারীরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রহ করেন তথ্য-প্রমাণ। প্রতিবেদন দুটি থেকে পাওয়া যাবে সে সময়ের জীবন্ত চিত্র। দৈনিক প্রথম আলোতে কর্মরত সাংবাদিক টিপু সুলতান নিজের উদ্যোগেই জঙ্গিদের অর্থসংস্থানের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চালিয়েছেন দেশব্যাপী। 'জঙ্গিদের অর্থ যোগানদাতা মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক এনজিও' শীর্ষক প্রতিবেদনটি তার ভিত্তিতেই লেখা।

রাজশাহী

রাজশাহী জেলার বিভিন্ন এলাকায় সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলাভাই ও তার সহযোগী জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমবি) কর্তৃক প্রকাশ্য হত্যা, নির্যাতনসহ সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন–

স্থান-কাল

রাজশাহী জেলার বাগমারা থানাধীন বিভিন্ন গ্রাম; রমজান খাঁর বাড়ি (ক্যাম্প), হামিরকুৎসা; আলোকনগর এইচ এম এরশাদ হাইস্কুল, হামিরকুৎসা বাজার; তাহেরপুর বাজার ও তাহেরপুর হাইস্কুল, তাহেরপুর; থানা-বাগমারা, জেলা-রাজশাহী। ২-৫ জুন ২০০৪। এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত/নির্যাতিত ব্যক্তি, সচেতন ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসনের বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে এই প্রতিবেদন।

ঘটনার বিবরণ

নির্যাতিত ব্যক্তিসহ বেশ কয়েকজন এলাকাবাসী জানান– গত ১ এপ্রিল ২০০৪ তারিখ সকালে একটি সাদা মাইক্রোবাস ও কয়েকটি মোটর সাইকেলে ৪০/৫০ জন হামিরকুৎসা বাজারে আসে। তখনই জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ বা বাংলা বাহিনীর নাম শোনা যায়। বাগমারার বিভিন্ন এলাকার কিছু লোক যারা পূর্ব থেকেই কখনো মুজাহিদ, কখনো-বা আল কায়দার সদস্য হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিত, তারা এ বাহিনীর সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে থাকে। এ বাহিনীর সদস্য হকিস্টিক, বাঁশের লাঠি, লোহার রড, হাঁসুয়া সাথে নিয়ে বাগমারা এলাকার বিভিন্ন বাজারে সশস্ত্র মহড়া দেয়। এরা প্রথম দিনেই পলাশী গ্রামে ওসমান বাবুকে তাড়া করে ধরে এনে গেদু নামের একজনের বাড়িতে প্রকাশ্যে জবাই করে।

www.pathagar.com

গোলাম রব্বানী (মুকুল) তাহেরপুর, বাগমারা

বাংলা বাহিনীর হাতে নিহত মুকুলের বাড়িতে গিয়ে কোনো পুরুষ লোককে না পাওয়ায়, তাহেরপুর বাজারে তার ভগ্নিপতি ডা. এ কে খান ফেরদৌসের দ্বারস্থ হলে জানান, গোলাম রব্বানী সনোপাড়ায় একটি দীঘিরপাড়ে মুরগি ও ছাগলের খামার করছিল। ঘটনার দিন ১১ এপ্রিল ২০০৪ সকালে (আনুমানিক ১১টায়) জেএমবি (জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ) বাহিনীর লোকেরা একজন সর্বহারা নেতাকে ধরার নামে মুকুলকে তার খামার থেকে নিয়ে যায়। তাহেরপুর হাটে ঐ দিন বিকেলে জাগ্রত মুসলিম বাংলার (প্রকারান্তরে জেএমবির) লোকেরা মাইক লাগিয়ে সমাবেশ করে। সেখানে শতাধিক লোককে সর্বহারা হিসেবে আত্মসমর্পণ করানোর উদ্দেশ্যে উপস্থিত করা হয়েছিল। সমাবেশে সিদ্দিকুর রহমান (বাংলাভাই)সহ তার অনেক বহিরাগত ও স্থানীয় সহযোগী উপস্থিত ছিল। সমাবেশে সিরাজুল ইসলাম পাটোয়ারী (জাতীয় পার্টির সাথে যুক্ত এবং মুকুল যে দীঘিরপাড়ে খামার করেছিল সে দীঘির দখলদার। তার সাথে মুকুলের বিবাদ চলছিল) নামের এক ব্যক্তি মুকুলকে "তার জানা মতে একজন সর্বহারা পার্টির নেতা" হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাভাইও এক মহিলার ফসল নষ্ট করে ক্ষতিপূরণ না করার অভিযোগ ও সর্বহারার সাথে যুক্ত করে তার নাম মাইকে ঘোষণা করে। মুকুল এ অভিযোগ অস্বীকার করে এবং আত্মসমর্পণকারী বা সর্বহারাদের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে সাক্ষ্য আহ্বান করতে বলেন। কিন্তু তার কোনো বক্তব্যের জবাব না দিয়ে তারা আনুমানিক সন্ধ্যা ৭টায় মুকুলকে উল্টো করে (তিন বাঁশের জকিতে) ঝুলিয়ে লাঠি, হকিস্টিক ও লোহার রড দিয়ে দীর্ঘক্ষণ পেটায়। নির্যাতনের এক পর্যায়ে মুকুল সর্বহারা হিসেবে এক ব্যক্তির নাম বললে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকায় তার সাথে যোগাযোগ করা হয়। সেই অদৃশ্য ক্ষমতাবান ব্যক্তি মুকুলকে শেষ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। ফেরদৌস জানান- এ নির্যাতন দেখে নিকটবর্তী পুলিশ ক্যাম্পে উপস্থিত সদস্যরা মুকুলকে এভাবে নির্যাতন না করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করতে বললেও বাংলাভাই বা তার সহযোগীরা তাকে দেড়/দুই ঘণ্টা পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে যায়। পুলিশ জ্ঞানহীন মুকুলকে প্রথমে বাগমারা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং সেখান থেকে অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কয়েকদিন একইভাবে সংজ্ঞাহীন থাকার পরে তাকে ১৮ এপ্রিল মৃত ঘোষণা করা হয়। ফেরদৌস জানান, "এ সময়ে মামলা করা সম্ভব নয়, কেননা বাংলাভাই বর্তমান সরকারের অংশ তাই মামলা করে লাভ হবে না।"

এসব নির্যাতন/হত্যার ঘটনার জন্য দায়ী বাংলাভাই এবং জাগ্রত মুসলিম জনতার (জেএমবি) সহযোগী হিসেবে তিনি জামায়াত নেতা অধ্যাপক লুৎফর রহমান, জামায়াতের আমির ডা. আঃ বারী (ভবানীগঞ্জ), হামিরকুৎসার চেয়ারম্যান মাহতাব উদ্দীন খামারু, খামারুর ভাই, গোয়ালকান্দির স্থানীয় বিএনপি নেতা মামুন ও জাতীয় পার্টির সিরাজুল ইসলাম পাটওয়ারীসহ আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেন।

তথ্য প্রদানকারীরা জানান– বাংলাভাই তার বাহিনী নিয়ে হামিরকুৎসা বাজারের পাশে রমজান খাঁর (মুক্তিযুদ্ধকালে রাজাকার ছিলেন বলে কয়েকজন জানান) বাড়িতে অবস্থান নিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করে। এ বাড়ি থেকেই এ বাহিনীর কার্যক্রম পরিচালিত হতো; এখানেই অধিকাংশ ব্যক্তিদের নির্যাতন করা হতো। নির্যাতিতদের কাছ থেকে জানা গেছে– বাংলাভাই নিজে এবং তার ভাগ্নে শহীদই প্রধান নির্যাতনকারীর ভূমিকা পালন করতো।

রমজান খাঁর বাড়িতে ১ মাস যাবৎ অবস্থান করার পরে বাংলাভাই স্থানীয় এইচএম এরশাদ হাই স্কুলে তার ঘাঁটি স্থাপন করে। এখানে কয়েকদিন থাকার পরে স্থানীয় ডাঙ্গাপাড়া মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করে এবং এখান থেকে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একটি নম্বরবিহীন মাইক্রোতে চড়ে বহিরাগত সঙ্গীদের নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। ইতোমধ্যে তার হাতে বাগমারা থানার অনেকে নিহত এবং শতাধিক ব্যক্তি চরম নির্যাতনের শিকার হয়। এদের নির্যাতনে কমপক্ষে ২৫ জন মারাত্মকভাবে আহত বা পঙ্গু হয়ে গেছে বলে তথ্য প্রদানকারীরা দাবি করেন।

তথ্য প্রদানকারীর প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন– পুলিশের ক্যাম্পের কাছে, কখনো পুলিশের উপস্থিতিতেই এসব ঘটনা ঘটেছে। নির্যাতিত, আত্মসমর্পণকারী বা আটক ব্যক্তিদের জেএমবি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে; পুলিশের সাথে বাংলাভাই ও জেএমবির সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিল। উক্ত বাহিনীর নামে চলমান বেআইনি তৎপরতা পুলিশ প্রতিহত না করে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে বলে কয়েকজন দাবি করেন। এলাকাবাসীদের অনেকেই জানিয়েছেন– পুলিশ সুপার নিজে কয়েকটি সভায় এবং প্রকাশ্য বক্তব্যে বাংলা বাহিনীর তৎপরতায় ব্যক্তিগত এবং প্রশাসনের সমর্থনের কথা প্রকাশ করে তাদের কাজে জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেছেন; এমনকি কয়েকটি হত্যাকান্ড ও নির্যাতনের ঘটনার সচিত্র সংবাদ প্রকাশের পরেও প্রকাশ্য সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন। এলাকাবাসী ও

www.pathagar.com

রাজশাহীর সাংবাদিকেরা জানিয়েছেন– গত ২৩ মে রাজশাহী শহরে শতাধিক মাইক্রো-ট্রাকে ও মোটর সাইকেলে জেএমবি যে শোডাউন করেছে, সেখানেও প্রশাসনের সহযোগিতা-পৃষ্ঠপোষকতা ছিল।

আব্দুল আজিজ সরকার (আজিজ মাস্টার), পিতা মৃত আঃ আহাদ সরকার (সাবেক চেয়ারম্যান) কোনাবাড়িয়া, হামিরকুৎসা, বাগমারা, রাজশাহী

কোনাবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আঃ আজিজ মাস্টারের বাড়িতে গিয়ে তাকে ডান হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দেখে, তার এ অবস্থার কারণ জানতে চাইলে তিনি ঘটনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি দেন। তিনি জানান– গত ১ মে ২০০৪ তারিখে তিনি জোহর নামাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু নকুপাড়া বাজার থেকে স্থানীয় পরিচিত ইয়াসিন (শ্যালো মেশিন মেকানিক এবং বর্তমানে জেএমবির সক্রিয় সদস্য) এবং শিকদারী বাজার মাদ্রাসার ফারুক তাকে বাংলাভাইয়ের নাম বলে ডেকে নিয়ে যায়। আনুমানিক সকাল এগারটায় তারা দু'জনসহ কয়েকজনকে হামিরকুৎসার রমজান খাঁর বাড়িতে জেএমবি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। আঃ আজিজ জানান– এখানে আনার পরে প্রথমে তার ছেলেকে হাজির করানো, তারপর ৩টি অস্ত্র জমা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়। সবশেষে অবশ্য বলা হয়, ২টি হাঁসুয়া ও ১টি রামদা জমা দিলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তাছাড়া মমতাজ ও মোস্তফা খুনের ব্যাপারেও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আজিজ মাস্টার জানান– স্থানীয় প্রতিবেশী মোসলেম ও চেয়ারম্যান খামারুর আত্মীয় মমতাজ ও মোস্তফাকে তাদের সম্পত্তিগত বিরোধের কারণে কয়েক বছর আগে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার একটিতে তিনি সাক্ষ্য দিতে চাইলে বাদিপক্ষ তার শত্রু হয়। অপর একটি মামলায় তাকে জড়িয়ে হয়রানি করা হচ্ছে।

একপর্যায়ে বাংলাভাই ও তার সহযোগীরা তাকে হকিস্টিক, রড দিয়ে প্রচন্ড আঘাত করতে থাকে। সবশেষে পায়ে দড়ি দিয়ে বাঁশে বেঁধে উল্টো ঝুলিয়ে প্রচন্ড মারধর করে। এভাবে পিটানোর এক পর্যায়ে তার হাত ভেঙে যায়। এ পর্যায়ে নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তিনি মিন্টু, সাইদুরসহ ৩/৪ জনের নাম বলেন, যা সত্যি নয়। তিনি জানান– জেএমবি লোকেরা বিশেষত চেয়ারম্যান খামারু ও মোসলেম মাস্টার এলাকাবাসীকে প্রতিরাতে 'বিট পাহারা' দিতে বাধ্য করছে। এরা কৃষকদের কাছ থেকে উসুল অর্থাৎ প্রতি ২০ মণে ১ মণ ধান আদায় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সর্বহারা নিধনের এ তৎপরতা শেষ পর্যায়ে ইসলামি বিধিব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। পর্দা করে মহিলাদের চলাফেরা না করার অভিযোগে অন্তত একজন নারীকে জনসমক্ষে শরীরের প্রকাশ্য স্থানে কাদা মাখিয়ে দেয়ার ঘটনা এলাকার জনসাধারণের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। পুরুষের দাড়ি রাখা, গোড়ালির ওপরে প্যান্ট ভাঁজ করে চলাফেরা ও নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করার কথাও সাধারণ মানুষের মুখে শোনা গেছে।

১ এপ্রিলে বাংলাভাইয়ের সদলবলে অনুপ্রবেশ এবং মহড়া সম্পর্কে জানতে চাইলে মহড়ায় অংশগ্রহণকারী জেএমবির কর্মী-সমর্থকদের অন্তত দশ জনের কাছে পিস্তল, দু'একজনের কাছে শাটারগান দেখেছেন বলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করে। তবে তখন বাংলাভাইয়ের কাঁধে একটি রামদা ধরনের অস্ত্র ছিল। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বাংলাভাইয়ের ক্যাম্পে দীর্ঘক্ষণ ছিলেন এমন দু'জন সাংবাদিক দাবি করেন– বাংলাভাই নিজেই সাধারণত নির্যাতনের কাজটি শুরু করতো। রক্তাক্ত তলোয়ার নিয়ে সে হামিরকুৎসা বাজার ও তাহেরপুরে মহড়া দিয়েছে। এরা জানান, বাংলাভাই নিজে আফগানিস্তানের কান্দাহারে লাদেনের আল কায়দা বাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষণ সিডি দেখিয়ে, নিজস্ব লোকদের স্থানীয় ক্যাম্পে অনুরূপ প্রশিক্ষণ দিতো।

তাহেরপুর বাজারের হোমিও চিকিৎসক হাবিবুর রহমান, ব্যবসায়ী আবুল কাসেম, নিহত মোস্তফা রব্বানী মুকুলের ভগ্নিপতি ও হোমিও চিকিৎসক ফেরদৌস খানসহ সচেতন বেশ কয়েকজন ব্যক্তি জানান– ষাটের দশক থেকেই নওগাঁ, নাটোর, বাগমারা, পাবনাসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায়/থানায়, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল), পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টিসহ কয়েকটি নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলের ব্যাপক তৎপরতা ছিল। স্বাধীনতার পরও এ তৎপরতা অব্যাহত থাকার প্রেক্ষিতে সত্তর দশকের প্রথমার্ধে এদের বিরুদ্ধে ব্যাপক পুলিশী ও যৌথবাহিনীর অভিযান চলে। ফলে কয়েক বছর এলাকা কিছুটা শান্ত থাকলেও আশির দশকের শেষদিকে আবার এদের ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়। সাম্প্রতিককালে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি লাল পতাকা ও জনযুদ্ধ নামক দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ২৫-৩০ বছরে চল্লিশটির মতো হত্যাকান্ডে এরা জড়িত বলে প্রচারণা রয়েছে।

তথ্য প্রদানকারীরা আরও জানায়– স্থানীয় একাধিক সাংসদ ও মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এক সময়ে নিষিদ্ধ দলের সাথে সম্পৃক্ত

www.pathagar.com

ছিলেন এবং নেতৃত্বও দিয়েছেন। এলাকার আধিপত্য ও কায়েমি স্বার্থের সংঘাতে সম্প্রতি নিহত গামা ও তার সঙ্গী পাখীর হত্যাকান্ডের পর ব্যক্তিগত স্বার্থ, ক্ষমতা ও নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ায় তারা একসময়ের সহযোগী সর্বহারাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের মদদ, পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনার কারণে মাঠ পর্যায়ে থানা পুলিশ জেএমবি, বাংলাভাইকে সহযোগিতা করেছে।

বাংলা বাহিনীর কাছে কথিত সর্বহারাদের আত্মসমর্পণের দৃশ্য

নির্যাতনের কথিত কারণ ও বাস্তবতা

সর্বহারা নির্মূল করার শ্লোগান দিয়ে বা প্রকাশ্যে সর্বহারা দমনের নামে বাংলাভাইয়ের নেতৃত্বে জাগ্রত মুসলিম জনতা বাহিনী বা জেএমবি এ নির্যাতন তৎপরতা শুরু করলেও দু'একজন বাদে প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত শত্রুতা সাধন ও বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের দমন প্রধান উদ্দেশ্য বলে ঘটনা পরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দিনমজুর, স্কুল শিক্ষক, নির্বাচিত মেম্বার, সাধারণ কৃষক সর্বশ্রেণীর অরাজনৈতিক লোকজনের সংখ্যাই নির্যাতিতদের মধ্যে বেশি। রাজনৈতিক নেতা-কর্মী বা সমর্থক হিসেবে পরিচিত নির্যাতিতদের মধ্যে একজন (ভবানীগঞ্জের সাবেক ছাত্রদল নেতা) বাদে প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থক। কয়েকজন ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা-কর্মী বলে নির্যাতিতদের সাথে কথা বলে জানা গেছে। এ এলাকায় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অপরদিকে কয়েকশ' লোক সর্বহারা হিসেবে এ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বা করতে বাধ্য হয়েছে বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন।

রফিকুল ইসলাম, পিতা- মৃত রেফাজ উদ্দীন (মেম্বার), কালুপাড়া, হামিরকুৎসা, বাগমারা

রফিক জানায়, গত ১২ এপ্রিল ২০০৪ সন্ধ্যায় সে আত্মসমর্পণ করে। কারণ ইতোমধ্যে জেএমবি পক্ষের লুৎফর, গনি, আঃ জলিল, শফিক তাকে একদিন তাড়া করে ধরার চেষ্টা করেছিল। সারারাত তাকে রমজান খাঁর বাড়িতে বেঁধে রাখা হয়। রফিকের ভাই জাহিরুল ও তার জ্ঞাতিভাই জাহের ও কয়েকজন বয়স্ক লোক জানান– রফিক কখনো সর্বহারা দলের সদস্য ছিল না; অত্যন্ত সদাচারী মিশুক ছেলে হিসেবে সে সবার পরিচিত। চাষবাস ছাড়াও সে শ্যালো মেশিন মেকার হিসেবে কাজ করতো। কিন্তু গোষ্ঠীগত বিরোধের কারণে তাকে সর্বহারা হিসেবে চিহ্নিত করে নির্যাতন করা হয়। রফিকের নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে তার ভাই জাহিরুল জানায়– একচোট মারধর করার পরে রফিকের মাথার ওপর চেয়ার রেখে বাংলাভাই ও অন্য একজন তাতে চেপে বসে। তারপরে তাকে অন্যদের মতো দু'পা উপরের দিকে ঝুলিয়ে পেটানো হয়। এভাবে সকাল-দুপুর ও বিকেলে ৩ দফা পিটিয়ে রফিকের দু'পার মাংসপেশি ও হাড় ভাঙা হয়েছে। পৃথক প্রশ্নের উত্তরে জাহিরুল জানায়– বাংলাভাই তার লোকজন নিয়ে প্রকাশ্যে (১ এপ্রিল ২০০৪) গেদু মিয়ার বাড়ির সামনে ওসমানকে জবাই করার পরে, রক্তমাখা তলোয়ার, লাঠি, হাঁসুয়া, হকিস্টিক নিয়ে মহড়া দিয়েছে। হামিরকুৎসা থেকে মোটর সাইকেল, গাড়িতে করে জেএমবি লোকেরা তাহেরপুর কলেজে গিয়ে ১ ঘণ্টার জন্য কলেজের পরীক্ষা স্থগিত রাখতে বাধ্য করে। বাংলাভাই কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশে বক্তব্য দেয়। ওসমান বাবুকে জবাই করার কথা জানিয়ে বলে, "সর্বহারাদের মতো জবাই করে আমরা পালিয়ে যাই না; কেউ আমাদের কিছু করতে পারবে না।"

www.pathagar.com

এলাকার সচেতন অনেকেই বিশেষত সাংবাদিকরা এ ঘটনাবলিকে সর্বহারা নির্মূলের নামে বিশেষ মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের দমন এবং মুসলিম মৌলবাদীদের প্রভাববলয় প্রতিষ্ঠার ট্রায়াল কেস হিসেবে দেখছেন। এ ক্ষেত্রে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সুদূরপ্রসারী বিশেষ উদ্দেশ্যভিত্তিক নীতি-নির্দেশনা, পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে বলে জনমনে সন্দেহ রয়েছে।

নির্যাতনের ধরন/পদ্ধতি

নির্যাতনের ধরন বা কীভাবে আপনাকে নির্যাতন করা হয়েছে?– এ প্রশ্ন করলে নির্যাতনের শিকার কয়েকজন জানান, তাদের প্রকাশ্যে হকিস্টিক, বাঁশের বিশেষ ধরনের লাঠি, লোহার রড ইত্যাদি দিয়ে হাতে, পায়ে, ঘাড়ে (কাঁধে) প্রচন্ডভাবে আঘাত করা হয়েছে। তালেব আলী (মিন্টু) জানায়, লাঠি হকিস্টিক দিয়ে মারা ছাড়াও তার হাতের নিচে ইট রেখে হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হয়েছে। তাছাড়া তার বাহু ও পায়ের মাংসপেশিতেও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে থেতলে দেয়া হয়েছে। নির্যাতনকারীরা (প্রধানত বাংলাভাই) ধৃতদের মাটিতে ফেলে বুকে-পিঠে পা দিয়ে চেপে ধরে হাত মুচড়ে পেছনে টেনে ধরে পিঠে/কাঁধে লাঠি দিয়ে পেটাতো বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। হামিরকুৎসা বাজারের নিকটবর্তী রমজান খাঁর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ক্যাম্পে যাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের (প্রায় সবাইকে) হাত-পা বেঁধে তিন বাঁশের (আলু মাপার জন্য ব্যবহৃত) জকিতে উল্টো ঝুলিয়ে পিটানো হয়েছে।

শাহ আলম (লেবু) পিতা- নজবর মৃধা, পেশা- মটর মেকানিক ও তার স্ত্রী ফরিদা ইয়াসমিন, পেশা- ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষিকা, গ্রাম- চানপাড়া, ভবানীগঞ্জ, পৌরসভা বাগমারা, রাজশাহী

শাহ আলম ও তার স্ত্রী ফরিদা জানান– বিগত ৯ এপ্রিল ২০০৪ সকাল আনুমানিক ৬টার সময় ১৫-২০ জন বাড়িতে এসে লেবুকে ডাক দেয়। লেবু তখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। তার মা দরজা খুলে দেন। দরজা খোলার সাথে সাথে সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলাভাইয়ের নেতৃত্বে ক্যাডাররা তাকে মারধর শুরু করে। তারা উভয়ে জানান, বাংলাভাইয়ের সাথে চানপাড়া গ্রামের লতিফ, বাক্কার, বেলাল ছিল এবং কয়েকজন অপরিচিত লোক ছিল। তাদের অনেকের হাতে রামদা, তলোয়ার, হকিস্টিক, ফালা ও দু'একজনের হাতে পিস্তল ছিল। শাহ আলমকে ঘরে ও উঠোনে মারধর করার পর পা ভেঙে গেলে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। ফরিদা জানান– এর মধ্যে চানপাড়া গ্রামের বাক্কার বলে উঠে, ওর স্ত্রীরও (শাহ আলমের স্ত্রী) দোষ আছে। তখন তারা ফরিদা ইয়াসমিনকে হকিস্টিক ও রড দিয়ে পেটাতে থাকে। মারধর করার সময় ক্যাডাররা জানতে চায়, এই এলাকায় কারা মাদকদ্রব্য বিক্রি করে? কিন্তু তারা কোনো উত্তর দিতে পারেননি। এ অবস্থায় শাহ আলম ও ফরিদা ইয়াসমিনকে টেনে-হিঁচড়ে ভবানীগঞ্জ বাজারের নদীর ওপারে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে ফরিদাকে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান খোদা বক্সের কাছে রেখে যায় এবং লেবুকে বাংলাভাইয়ের ক্যাডাররা হামিরকুৎসা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ফরিদা ইয়াসমিন জানান, তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যান, কমিশনারদের কাছে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য কাকুতি-মিনতি করলে তারা তাদের নিজেদের অসহায়ত্বের কথা জানান এবং তাকে থানায় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। লেবু জানান, বাংলা ভাই তাকে হামিরকুৎসা ক্যাম্পে নিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে উল্টিয়ে ঝুলিয়ে রাখে এবং বাংলাভাই নিজে এবং জেএমবির অন্য সদস্যরা হকিস্টিক দিয়ে পেটায়। প্রায় এক ঘন্টা সময় ধরে তার ওপর এরকম অত্যাচার চলে। এসময় ক্যাম্পে বাংলাভাইয়ের কাছে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে পুলিশ উপস্থিত ছিল। ঐদিনই রাত ৮টার সময় মারাত্মক আহতাবস্থায় হাতে কিছু গাঁজা গুঁজে দিয়ে মাদকসেবী হিসেবে পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেয়া হয় বলে লেবু অভিযোগ করেন। লেবু ও ফরিদা জানান– পরদিন ১০ এপ্রিল তাদের উভয়কে মাদক মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়। উল্লেখ্য, অত্যাচারে লেবুর বাম পা ভেঙে যায়।

নির্যাতিত আরও কয়েকজন

১ এপ্রিল ২০০৪ থেকে প্রায় দু'মাস যাবৎ বাংলাভাই ও তার সহযোগীদের দ্বারা নির্যাতিত আরও বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বলে তাদের ওপর নির্যাতনের বয়ান শুনেছি। এরা হলেন–

- আবু তালেব মিন্টু (২২), কোনাবাড়িয়া (দেওয়ানপাড়া), হামিরকুৎসা, বাগমারা, রাজশাহী। তালেব জানান- তাকে সকালে, দুপুরে ও বিকেল এই তিনবেলা প্রায় ১ ঘণ্টা করে পেটানো হয়। নির্যাতনকারীরা তার দুই হাত ও পায়ের নিচে ইট রেখে হাতুড়ি দিয়ে হাতে-পায়ে পিটিয়েছে। এমনকি বাহু ও পায়ের নরম মাংসপেশিতে এরা হাতুড়ি দিয়ে

www.pathagar.com

পিটিয়ে মাংস থেঁতলে দিয়েছে বলে তালেব জানান।

- আঃ বারেক, রায়পুর, হামিরকুৎসা, বাগমারা, রাজশাহী। জেএমবি কর্তৃক সম্ভাব্য/মৃত্যুর আশঙ্কায় রাজশাহী শহরে আশ্রয়গ্রহণকারী রায়পুরের আঃ বারেক জানান, তিনি জেএমবির ভয়ে রায়পুরে- নিজ বাড়িতে (স্ত্রী- ছেলেমেয়ে ও মা সেখানে থাকেন) দীর্ঘ দু'মাস যাবৎ যেতে পারছেন না।
- হামিরকুৎসার কালুপাড়ার আতাউর রহমান (৪১) পিতা- গফুর উদ্দীন প্রামাণিক। তার চার হাত-পা পিটিয়ে ভেঙে দেয়া হয়েছে। বাঁশে উল্টো ঝুলিয়ে ও বিভিন্নভাবে নির্যাতিত আতাউর এখনো সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী ও চলাফেরায় অক্ষম।
- ভবানীগঞ্জ বাজারের নিকটবর্তী গোডাউন পাড়ার যুবক মাহবুবুর রহমান (২৮), পিতা কিতাবউল্লাহ; যার দু' পায়ে ও হাতে মারাত্মক আঘাত করা হয়েছে। এখনো পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা এবং ঘাড়ের পেছনে মাথার নিচে ৩-৪ ইঞ্চি ফুলে আছে; মস্তিষ্কে প্রচন্ড আঘাত লাগায় ঠিকভাবে কথা বলতে পারেন না।
- হামিরকুৎসার রায়পুর গ্রামের আহসান ও তার ছেলে হাবিব দু'জনেই নির্যাতিত হয়েছেন। একই গ্রামের বারীর বাড়িতে একাধিকবার হামলা হয়েছে; তার ঘরের ও মাঠের ফসল জেএমবির লুৎফর (অধ্যাপক), চেয়ারম্যান খামারু, আবুল মেম্বারের নেতৃত্বে লুট করে নিয়ে গেছে বলে বারীর স্ত্রী শাফিনুর থানায় লিখিত এজাহার দিলেও কোনো জিডি/মামলা গ্রহণ করা হয়নি বলে তারা জানিয়েছেন। এখনো তাদেরকে উচ্ছেদের হুমকি দেয়া হচ্ছে। তার স্বামী বারী নির্যাতনের ভয়ে রাজশাহী শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।
- ভবানীগঞ্জের দেউলা গ্রামের লিয়াকত আলী মোল্লা (পিতা- নেয়ামত) জানান, জেএমবির লোকেরা (বাংলাভাই সাথে ছিলেন) তার বাড়িতে হামলা করে মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। একই গ্রামের আবু সাঈদ জানান, সেদিন তাকে না পেয়ে ঘরের কিছু জিনিসপত্র ভাঙচুর করেছে হামলাকারীরা।
- তাহেরপুর বাজারের নিকটবর্তী অমর সরকারের বাড়িতে হামলা করে অমরকে না পেয়ে ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র, ফার্নিচার ও পূজার ঘর ভাঙচুর করে বাংলা ভাই ও তার সহযোগীরা।
- একই মহল্লার বিজন মজুমদারের বাড়িতে হামলা করে তাকে না পেয়ে ঝন্টু (পিতা তপন মজুমদার) ও কল্যাণ সরকারকে (পিতা বাচ্চু) পিটানো হয়। ঝন্টুকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়। এখনো তিনি কারাগারে আছেন।
- ভবানীগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জব্বার জানান, ঝিকড়ার খালিশপাড়ার মুক্তিযোদ্ধা আছিরুদ্দিন (৫৫) মাস্টারকে পিটিয়ে দু'পা ভেঙে দেয়া হয়েছে।

তথ্যানুসন্ধানকালে উপরোক্ত নির্যাতিত এবং তাদের নিকটজন ছাড়াও এলাকার সাংবাদিক ও সচেতন শতাধিক লোকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বাগমারা থানা এলাকায় দু'শতাধিক লোক নির্যাতিত হয়েছে। তাদের দেয়া তথ্য থেকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম জানা যায়:

১. পলাশী গ্রামের আজিম, ২. ইসমাইল (পিতা- ইনছার), ৩. আয়নাল (পিতা আন্দা আলী), ৪. চন্দ্রপুরের মালেক (দশম শ্রেণীর ছাত্র, পিতা বিপদ), ৫. সাইফুল ইসলাম (পিতা আঃ সাত্তার মাঝি), ৬. হরিজনির (তাহেরপুরের) টুটুল (পিতা মনছুর রহমান), ৭. তাহেরপুরের তপন মাস্টারের ছেলে ঝন্টু, ৮. সেনোপাড়ার সাহাব আলীর ছেলে ডুগু, ৯. হামিরকুৎসা গ্রামের আকরাম, ১০. গোয়ালকান্দির রমজান, ১১. গোপালপাড়ার (নও মুসলিম) রহিমসহ অনেকেই জেএমবি সদস্যদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা গেছে। এছাড়া ১২. আকুয়া গ্রামের টিপু মেম্বারকে নির্যাতন করে দু'পা ভেঙে দেয়া হয়েছে। ১৩. অনন্ত পাড়ার (হামিরকুৎসা ইউপি) আব্দুস সালাম, ১৪. ঝিকরার আফসার মাস্টারও (আওয়ামী লীগ নেতা) এদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। ১৫. হামিরকুৎসা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি বাবুল আখতারকে সর্বহারা সন্দেহে মারধর করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ১৬. সাজুরিয়া গ্রামের আবেদ আলী মেম্বারকে দু'দিন ধরে নির্যাতন করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। ১৭. হামিরকুৎসার যুবলীগ কর্মী আক্কাস আলীকে প্রচন্ড মারধর করা হয়েছে। ১৮. আলোকনগরের আবু সাঈদ (পিতা- নাসিরউদ্দীন), ১৯. পলাশীর সোহরার (পিতা- কাতেব উল্লাহ) জেলে আছে; ২০. কাঠালবাড়ীর খবির ও জাহিরুল, ২১. হামিরকুৎসার আব্দুল (বাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছে), ২২. পলাশীর বেলালের বাড়িতে আগুন লাগানো হয়, ২৩. রায়পুরের মমতাজ (পিতা- জয়নাল), ২৪. কামারবাড়ীর ইব্রাহিমকে ধরে এনে মারপিট করে নির্যাতন করা হয়। ২৫. তালঘরিয়ার আওয়ামী লীগ নেতা বাবুল আখতারকে সর্বহারা সদস্য হিসেবে মারধর করেছে, ২৬. কলসীপাড়ার শাহজাহান মাস্টারকে নির্যাতন করা হয়েছে; ২৭. ঝিকরা গ্রামে আবু তালেব (ছাত্রলীগ নেতা)

www.pathagar.com

ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ রয়েছে; ২৮. মঙ্গলপাড়ার কায়েস (পিতা জব্বার মাস্টার), ২৯. শিকদারীর আওয়ামী লীগ নেতা সোবহান চৌধুরীর পরিবারের বাড়িঘর ও পেট্রোল পাম্প ভাঙচুর করা হয়েছে, ৩০. পলাশীর তাসেরসহ অনেকের নাম জানা গেছে। তথ্য প্রদানকারীরা দাবি করেন এসব লোকের সঙ্গে দেখা করলে আরও অনেকের নাম জানা যাবে, যারা বাংলাভাই বা তার সহযোগীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে।

নির্যাতনকারীদের পরিচয়

এলাকাবাসী এবং নির্যাতিতদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, জেএমবির তৎপরতার শুরুতেই যেসব লোকজন এদের সহযোগিতা করে, তারা হলো হামিরকুৎসার চেয়ারম্যান মাহতাব উদ্দীন খামারু, তার দু' ভাই, হামিরকুৎসার রমজান খাঁ, তার ছেলে কুদ্দুস, বিএনপি নেতা মামুন, বাজারের জুতা-স্যান্ডেল বিক্রেতা মোস্তাফিজুর রহমান মিন্টু, পলাশীর আব্দুল জলিল (পেশায় আমিন), তার জামাই মিজান এবং ছেলে মোস্তাফিজ ওরফে মোস্তা, ভবানীগঞ্জ বাজারের জামায়াত নেতা ডা. আব্দুল বারী ও ব্যবসায়ী মঞ্জুরুল ইসলাম, শিকদারীর লতিফ, ফজলুর রহমান ডালিম (ব্যবসায়ী), জেএমবি নেতা আব্দুর রহমান, বাসুপাড়ার চেয়ারম্যান বেসারতউল্লাহ, তাহেরপুরের জাতীয় পার্টির লুৎফর রহমান পাটোয়ারী, রায়পুরের জাওয়ারুল, আঃ হান্নান (পিতা- ফজলুর রহমান), জাওয়ারুলের বাবা বয়েন উদ্দীন, লুৎফর রহমানের ছেলে শহিদুল ইসলাম, আবুল মেম্বার, তার তিন ভাই– আকবর, আজাহার, আফসার, আহাদ আলীর ছেলে শাহাদত হোসেন, মৃত মল্লিকের ছেলে আঃ গফুর, ইয়াকুব মৃধার ছেলে জালাল, মোহন সর্দারের ছেলে জালাল, মাফি উল্লার ছেলে আলী হোসেন, আরেক আলীর ছেলে মাহবুব, মহিলা মেম্বার মেহেরুন্নেসার স্বামী মোমতাজ, কোনাবাড়িয়ার ফজলু, মেকানিক ইয়াসীন, আজিজ মৌলবী, মোসলেম (মাস্টার), জামায়াত নেতা অধ্যাপক লুৎফর রহমান, শিকদারী মাদ্রাসার ফারুক, চানপাড়ার বক্কার, লতিফ, সিদ্দিকসহ বেশ কয়েকজনের নাম পাওয়া গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিরা ও নির্যাতিতেরা জানান– এদের মধ্যে রমজান খাঁ, তার ছেলে কুদ্দুস, পলাশীর জলিল (আমিন) ও তার ছেলে মোস্তা, আমিন জলিলের জামাই মিজান, চেয়ারম্যান খামারু ও তার দু'ভাই, আবুল মেম্বার ও তার তিন ভাই, বিএনপি নেতা মামুন, জামায়াত নেতা অধ্যাপক লুৎফর, ডা. আঃ বারী, মোস্তাফিজ মিন্টু এরাই বাংলা বাহিনীর প্রধান সহযোগী ছিল। এরাই বিভিন্ন লোকদের সর্বহারা হিসেবে চিহ্নিত করে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করে। ধৃতদের বিচার ও নির্যাতন করার ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা বাংলাভাইয়ের পরেই বলা যায়।

পুলিশের বিরুদ্ধে চলমান নির্যাতন ঘটনায় মদদ এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ

এসব বেআইনি তৎপরতা ও নির্যাতনের ঘটনা কোনোভাবেই পুলিশের অজ্ঞাতে বা সমর্থন ছাড়া মাসাধিককাল যাবৎ চলতে পারে না। বরং কখনো কখনো পুলিশ সদস্যরা নিষ্ক্রিয়ভাবে উপস্থিত থেকে এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে; কিন্তু নির্যাতিতদের বাঁচানোর কোনো উদ্যোগ নেয়নি। উপরন্তু এদের মহড়ায়-কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে সমর্থন-সহযোগিতা করেছে, প্রোটেকশন দিয়েছে। আত্মসমর্পণকারী নির্যাতিতদের মারাত্মক আহত অবস্থায় পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ ধৃতদের বিভিন্ন অভিযোগে যুক্ত করে আদালতে/হাজতে পাঠিয়েছে কিন্তু নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এ ধরনের অভিজ্ঞতার কারণে নির্যাতিতরা এবং এলাকাবাসীরা এ বাহিনীর প্রতি সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা ও মদদ রয়েছে বলে অভিযোগ করে। বাংলা বাহিনীর বিরুদ্ধে যেকোনো প্রকার ভিন্নমত প্রকাশকারী বা সক্রিয়দের সর্বহারা নামে গ্রেফতার-নির্যাতনের সম্ভাবনা থাকায় এবং বাস্তবত সে ধরনের হুমকি থাকায় এলাকাবাসীরা বাংলাভাই বা তার সহযোগিদের অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে সাহস পাচ্ছে না। এলাকার সচেতন শিক্ষিত অনেকেই মনে করছেন, এককালে সর্বহারাদের নেতৃত্ব প্রদানকারীরাই অবস্থা এবং অবস্থান পাল্টে নিজেদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আর্থসামাজিক ক্ষমতাকে সংহত করতে বাংলা বাহিনীকে এলাকায় নিয়োজিত করেছে। সরকার ও প্রশাসনের উর্ধ্বতন মহলের নির্দেশেই (জেলা ও থানার) স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন– নির্যাতনকারী বাংলাভাই ও জেএমবিকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতা করে যাচ্ছে। ফলে জনমনে পুলিশ ও প্রশাসনের এ ভূমিকা নিয়ে হতাশা, ক্ষোভ ও অসহায়ত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ধ্বংস করে নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করবে বলে প্রশাসনের উর্ধ্বতন মহল থেকেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

www.pathagar.com

পুলিশ প্রশাসনের বক্তব্য

গত ০৫-০৬-০৪ তারিখে রাজশাহী জেলার বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুহুল আমিন সিদ্দিকীর সাথে দেখা করার জন্য গেলে তাকে পাওয়া যায়নি। তবে থানার সেকেন্ড অফিসার আবু সিদ্দিকীর সাথে বাগমারা থানায় বাংলাভাই ও জাগ্রত মুসলিম জনতার কার্যক্রম নিয়ে কথা হয়। আবু সিদ্দিকী বাংলাভাই ও জাগ্রত মুসলিম জনতার কথা অস্বীকার করেন এবং বাংলাভাই একটি অদৃশ্য নাম বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন– এলাকার ভালো লোকজন অপরাধীদের ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে এবং পুলিশ পরবর্তীকালে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে। বাংলাভাইকে সহযোগিতার কথা অস্বীকার করে তিনি বলেন, মূলত এলাকার জনগণ সর্বহারাদের দমনে এগিয়ে এসেছে। এতে পুলিশের গতানুগতিক কাজে সহযোগিতা করা হচ্ছে। আবু সিদ্দিকীকে রায়পুর গ্রামের সাফিনুরের জিডির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান– সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা এ সম্পর্কে ভালো বলতে পারবেন। উল্লেখ্য, সাফিনুর কর্তৃক দায়েরকৃত একটি জিডিতে থানার সিলমারা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোনো নাম্বার বসানো হয়নি। তাকে বাংলাভাই ও কথিত জাগ্রত মুসলিম জনতার হাতে নিহত বাবু ও মুকুলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, বাবুর মৃত্যুর ব্যাপারে দুটো মামলা হয়েছে– মামলা নং ০১ (০১/০৪/০৪), এটা অস্ত্র মামলা এবং মামলা নং ০২ (০১/০৪/০৪), এটা হত্যা মামলা। তবে এর কোনোটিতে বাংলাভাইকে অভিযুক্ত-আসামি করা হয়নি। মুকুলের ব্যাপারে মামলা হয়নি; তবে আজকে (০৫/০৬/০৪) মামলা হবে, কেননা ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। প্রশ্নোত্তরে সেকেন্ড অফিসার জানান– বাংলাভাই বা জাগ্রত মুসলিম জনতা কর্তৃক অত্যাচারের/নির্যাতনের বিষয়ে কেউ থানায় অভিযোগ করেনি, ফলে কোনো মামলা হয়নি। থানার সামনে বাংলাভাইকে সমর্থন করে পুলিশ সুপারের প্রকাশ্য বক্তব্য দেয়ার তথ্য জানানোর পাশাপাশি বাংলাভাইকে গ্রেফতারের বিষয়ে 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ' তারা পেয়েছেন বলেও জানান।

সর্বশেষ পরিস্থিতি

নির্যাতিত ব্যক্তিসহ সচেতন এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, মে মাসের শেষের দিকে বাংলাভাই ও তার বহিরাগত সহযোগীরা এলাকা ত্যাগ করেছে। তবে তার স্থানীয় সহযোগীরা এখনো জাগ্রত মুসলিম জনতার নামে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাভাই বা জেএমবির বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ভিন্নমত বা নির্যাতনের তথ্য প্রকাশের বিরুদ্ধে তারা সক্রিয় নজরদারী করছে, হুমকি-ধামকি দিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন গ্রামে গড়ে তোলা কমিটিগুলো এখনো রাত্রিকালে গ্রামের লোকদের সর্বহারাবিরোধী বিট পাহারা দিতে বাধ্য করছে। দিনমজুর, ভ্যানচালক, রিকশাচালকরা সারাদিন পরিশ্রমের পরে এ ধরনের বাধ্যতামূলক রাত্রিকালীন পাহারায় রাজি না হলে তাদের নির্যাতন, জরিমানা ও হুমকি দিয়ে বাধ্য করা হচ্ছে। রায়পুর কোনাবাড়িয়া ইত্যাদি গ্রামে খামারু, মোস্তা, আবুল, মোসলেম মাস্টারদের নেতৃত্বে উসুল আদায় করা হচ্ছে। পুলিশ এ পাহারাদানের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাকে সমর্থন করছে; তবে তারা উসুল আদায়ের কথা জানেন না বলে জানান। অপরদিকে, দেশব্যাপী আলোচিত এতদঞ্চলে প্রায় দু' মাস যাবৎ এ ধরনের বেআইনি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক ঘটনা অব্যাহত থাকার পরে, দেশের সুশীল সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রায় নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় এলাকার জনসাধারণ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও তৎপরতা আছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করছেন তারা।

www.pathagar.com

নওগাঁ

নওগাঁ অঞ্চলে বাংলাভাই বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

স্থান-কাল

নওগাঁ জেলার রাণীনগর থানার বিভিন্ন এলাকা। ১ জুন- ৬ জুন ২০০৪।

এপ্রিল ২০০৪-এর শুরুতে দেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী ও নওগাঁ জেলায় সরকার এবং পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতায় বাংলাভাই বাহিনী বা 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ' নামে একটি সশস্ত্র দল সংগঠিত হয়ে সর্বহারা নিধনের নামে হত্যা, লুণ্ঠন, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন নির্যাতন চালায়। মানুষ এই বাহিনীর অতর্কিত তান্ডবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীর কাছে এই সন্ত্রাসী তান্ডব থেকে পরিত্রাণের জন্য সাহায্য চেয়ে তারা হয়েছে নিগৃহীত। ফলে বাংলাভাই বাহিনী সম্পর্কে জনমনে দেখা গেছে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর ভীত-সন্ত্রস্ততা। বেঁচে থাকার জন্য আশ্রয় নিতে হয়েছে অন্য কোনো এলাকায় কিংবা জেলায়।

২১ মে ২০০৪, দেশের প্রায় সব জাতীয় দৈনিকে উল্টো করে ঝুলানো একটি লাশের ছবি ছাপা হয়। নওগাঁ জেলায় রানীনগর থানায় বরগাছা ইউনিয়নের শফিকপুর গ্রামের মোঃ আব্দুল কাইয়ুম বাদশার মৃতদেহটি বগুড়া জেলায় নন্দীগ্রাম থানার বামনগ্রাম এলাকায় একটি গাছের সঙ্গে ঝুলানো অবস্থায় পাওয়া যায়।

নিহতের ভাই সরদার মাহমুদ মুসা ঘটনার পরপরই আমাদের কাছে তাঁর ভাই হত্যার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেন– আমাদের এলাকায় সর্বহারা নিধনের নামে সরকারি মদদে ও পুলিশ বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় একের পর এক অমানবিক ঘটনা ঘটে চলছে। আমার ভাই বাদশাকে গত ১৯ মে ২০০৪, বুধবার আনুমানিক দুপুর ২টায় বাংলাভাই বাহিনীর স্থানীয় পর্যায়ের নেতা অর্থাৎ রানীনগর থানায় সেকেন্ড ইন কমান্ড হেমায়েতউদ্দিন হিমুর নেতৃত্বে তিতুমীর, সালাম, আবুল মাস্টার, রাণীনগর থানা জামায়াতের আমির মোফজুল হোসেন, শহীদুল ইসলাম বিস্কুটসহ আনুমনিক ৫০-৬০ জনের একটি দল শফিকপুরের নিকটস্থ শিম্বাগ্রাম থেকে অপহরণ করে। অপহৃত হওয়ার পরপরই ঘটনাটি নওগাঁ জেলায় সাংবাদিকসহ পুলিশ প্রশাসনকে জানাই এবং আত্মীয়-স্বজনসহ পরিচিতজনেরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে ব্যর্থ হয়। পরদিন সকালে বাংলাভাইয়ের ক্যাম্পে (যেখানে লোকজন আটক করে নির্যাতন করতো) লোক মারফত খবর নেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। অতঃপর ২০ মে ২০০৪ বিকেলের দিকে সাংবাদিকদের মাধ্যমে জানতে পারি আমার ভাইকে হত্যা করা হয়েছে এবং একটি গাছের সঙ্গে মৃতদেহটি উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানায় ফোন করা হলে কর্তব্যরত ডিউটি অফিসার জানান– "গাছে ঝুলানো লাশটি আব্দুল কাইয়ুম বাদশার লাশ।" পুলিশ কীভাবে নিশ্চিত হলো এটা বাদশার লাশ? বিষয়টি রহস্যজনক, কেননা ঐ এলাকাটি অন্য একটি জেলার মধ্যে, যেখানে আমার ভাইকে কারো চেনার কথা নয়।

সরদার মাহমুদ মুসা আরও জানান– ৪ মে ২০০৪ আমার ছোট ভাই পোস্টমাস্টার আব্দুল কুদ্দুস রাজনকে বাংলাভাই বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করলে ৯০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছিল। আব্দুল কুদ্দুস রাজনকে এভাবে অপহরণ করায় আব্দুল কাইয়ুম বাদশা বাংলাভাই বাহিনীর স্থানীয় পর্যায়ের নেতা হিমু, বিস্কুটদের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিল যে, এভাবে তার নিরপরাধ ভাইকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কারণ কি? তারপর ৮ মে ২০০৪ দুপুর ১টার দিকে জাগ্রত মুসলিম জনতার ক্যাডাররা স্থানীয় আব্দুল মাস্টারের নেতৃত্বে ১৫০-২০০ জনের সশস্ত্র বাহিনী আমাদের বাড়িতে চড়াও হয় এবং বাড়ি-ঘর তছনছ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। দীর্ঘ ৩-৪ ঘন্টা এই ধ্বংসলীলা চালায়। সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলে আমার গ্রামের শহীদুল ইসলাম বিস্কুট অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানে গেলে প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় গোলাম রব্বানী (১৮) জানান– ঘটনার দিন আনুমানিক ১টার দিকে মুজাহিদ গ্রুপ (বাংলাভাই বাহিনীকে স্থানীয়রা মুজাহিদ বলে) বাদশা ও বাশারকে নাসিরের বাড়ি থেকে ধরে বেদম মারপিট করতে থাকে। মুজাহিদদের সবার হাতে হকিস্টিক, লাঠি, বড় দা (রামদা) ছিল। একজনের হাতে পিস্তল ছিল। এরপর স্থানীয় মোহাম্মদ আলীর বাড়ি থেকে খেজুরকে ধরে তিনজনকে নাসিরের বাড়ির সম্মুখস্থ উঠানে দড়ি দিয়ে পিঠ মোড়া করে বেঁধে এ অবস্থাতেই হকিস্টিক দিয়ে মারতে থাকে।

www.pathagar.com

শিম্বা গ্রামের নাসিরের বাড়িতে উপস্থিত হলে তাকে না পেয়ে তার ছেলে নয়নের (১৮) কাছে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন– ঘটনার দিন আমি বাড়িতে ছিলাম না, তবে শুনেছি আমাদের ঘরের সিলিং থেকে বাদশা ও বাশারকে মুজাহিদরা ধরেছিল এবং খুব মারধর করে প্রায় আধমরা করে ফেলেছিল। নাসিরের চাচাতো ভাই টুকুর কাছে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান– ঘটনার দিন হঠাৎ করে মুজাহিদরা গ্রাম ঘিরে ফেলে, সবার হাতে লাঠি, হকিস্টিক ছিল। এছাড়া গ্রামে ঢুকেই পরপর কয়েকটি বোম ধরনের জিনিস ফুটায়, বড় আওয়াজও হয়। এরপর খেজুর, বাদশা, বাশারকে ধরে সবার সামনে মারধর করতে থাকে। এক পর্যায়ে তিনজনের শরীর থেকেই রক্ত বের হতে থাকে এবং নিস্তেজ হয়ে পড়লে তিনজনকে একটা ভ্যানে করে এখান থেকে নিয়ে যায়। আমরা ভয়ে বেশিদূর যেতে পারিনি।

গাছের সাথে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা বাদশা'র লাশ

শিম্বা গ্রামের পূর্ব পাড়ায় খেজুরের বাড়িতে উপস্থিত হলে নিহত খেজুরের বৃদ্ধ বাবা ও মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। বাবা জানান– আমার ছেলে রানীনগর থানা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিল, ওর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে হত্যা করেছে। আমার ছেলের হত্যার জন্য দায়ী; ১. লোহাচূড়া গ্রামের তোতা খন্দকার, পিতা-ওয়াহিদ খন্দকার; ২. টিমটিম, পিতা জসিমউদ্দিন সরকার; ৩. হিসাব। মন্ত্রী আলমগীর কবির (তৎকালীন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী) আমার ছেলেকে অনেক লোকের সামনে বলেছিলেন, 'তোর খেজুর আমি ছাড়ায়ে দেবো।' আমার ছেলের হত্যার পেছনে মন্ত্রীর হাত রয়েছে। বাংলাভাই বাহিনী আমার ছেলেকে হত্যা করেছে।

খেজুরের মা ১৯ মে ২০০৪ তারিখের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন– সেদিন দুপুরবেলা হঠাৎ করে বাংলাভাই বাহিনী গ্রাম ঘিরে ফেলে আমার ছেলেকে মারধর শুরু করে। আমার ছেলেকে দিয়ে আমার সামনে পানি-বিস্কুট আনায়। তারপর আমি জানতে পারি বাংলাবাহিনী আমার ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে দেখি সবকিছু তছনছ করছে মাথায় টুপি দেওয়া ৪-৫ জন লোক। আমি তাদের অনেক অনুনয়-বিনয় করলে তারা বলে ওঠে– "শুধু তোমার ছেলে জামা-কাপড় গায়ে দিবে, আমরাও মায়ের ছেলে, আমাদেরও তো জামা-কাপড় লাগে।" কথা বলেই সব কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র তছনছ করতে থাকে। বাড়ির আলমারি থেকে বের করে বাক্স-পেটরা সবকিছুই ভাঙচুর করেছে। বাড়ি থেকেই শুনতে পেলাম, আমার ছেলেকে ওরা মারধর করছে। শুনেই আমি সামনের দিকে যেতে চাইলে আমাকে ছেলের কাছে যেতে দেয় নেই। শুনেছি আমার ছেলেকে হকিস্টিক দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছিল। আমার ছেলে যদি কোনো অপরাধ করে থাকত তাহলে তার বিচার করল না কেন? এভাবে আমার ছেলেকে খুন করে ফেলল কেন? কি অন্যায় করেছিল?

খেজুরের বাবা ছেলের হত্যাকান্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান– কয়েকদিন খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারি ভেটি মাদ্রাসায় স্থাপিত বাংলা বাহিনীর ক্যাম্পের পেছনে একটি লাশ। তা মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। পুলিশ উদ্ধার করেছে। আমার মেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আমার ছেলের লাশ চিনতে পারে। চার টুকরো করে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল আমার ছেলেকে।

মামলা করেছেন কি না জানতে চাইলে তিনি জানান– মামলা করে কী হবে? ছেলের হত্যার বিচার তো পাবো না। তাই মামলা করি নাই।

নওগাঁ জেলার রানীনগর থানায় বরগাছা ইউনিয়নের চামটা গ্রামের হিন্দু পাড়ায় সুধীর সরকারের বসতি। বাংলাভাই বাহিনীর হাতে অপহরণের শিকার হয়েছে তার ছেলে সুশান্ত সরকার (২৯)। ছেলের অপহরণ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলেন–

www.pathagar.com

আমার ছেলে সংসার দেখাশোনা করত। আমাদের পেশা কৃষিকাজ। আমার ছেলেকে গত ১৯.৫.০৪ তারিখে আল কায়দারা গ্রামের পাকা সড়কের কাছ থেকে ধরে নিয়ে যায়। ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গ্রামের উজ্জ্বল আমাকে প্রথম সংবাদ দেয়, ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আল কায়দা বাহিনী।

অপহৃত হয় গ্রামের আরেক যুবক সুফল চন্দ্র সরকার, পিতা সুশীল চন্দ্র সরকার। সুফলের বাবা ছেলের অপহৃত হওয়া প্রসঙ্গে বলেন– আমাদের গ্রামের সন্তোষ সোনার, পিতা-হাবু সোনার, আমার বাড়িতে এসে বলে, তোমার ছেলেকে আমাদের হাতে তুলে দাও, নইলে বাড়িঘর ভেঙে দেয়া হবে। সন্তোষ সোনারকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, তোমার ছেলের নাম আছে। তোমার ছেলে বাড়ি আসলে বাংলাভাইয়ের গুড়বাড়িয়া ক্যাম্পে আত্মসমর্পণ করতে বলবা। সেখানে এলাকার সব সর্বহারা আত্মসমর্পণ করবে। কথামতো আমার ছেলেসহ হিন্দুপাড়ার ৩৮ জন ছেলেকে আত্মসমর্পণের নামে গুড়বাড়িয়া ক্যাম্পে নিয়ে গেলে আমার ছেলে ছাড়া সবাই পরবর্তী সময়ে ফিরে আসে। আমার ছেলের ফিরে না আসা দেখে আমার স্ত্রী গুড়বাড়িয়া ক্যাম্পে যান। সেখানে গিয়ে ছেলেকে দেখতে পান। তখন অনেক অনুনয়-বিনয় করলেও আমার ছেলেকে ছেড়ে দেয়নি। এখন পর্যন্ত (০৪.০৬.০৪ তারিখ দুপুর ২.৩০টা পর্যন্ত) আমার ছেলের কোনো খবর জানি না। সুফলের মা জানান– আমার ছেলের নিখোঁজ হওয়ার পেছনে গ্রামের তাজমুল, জবর মেম্বার, ইসমাইল, সিদ্দিক, সন্তোষ ও অপু জড়িত রয়েছে। কেননা, বাংলা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে এদের চলাফেরা করতে দেখেছি। আমি আমার ছেলেকে ফেরত চাই।

চামটা গ্রামের ৩৪ জন তরুণ ছেলেকে আত্মসমর্পণের নামে সন্তোষ সোনার ও তার সহযোগীরা গুড়বাড়িয়া জগদাশ ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে সবাইকে লাইন ধরে দাঁড় করে রাখার পর শুধু সুফলকে রেখে বাকি সবাইকে ছেড়ে দেয়। চামটা গ্রামের মধ্যপাড়ার ছাড়া পাওয়া যুবকদের মধ্যে দানিল আলী সরকার (১৮) তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন– বৈশাখ মাসের ৩০ তারিখে অর্থাৎ ১৩ মে ২০০৪ মাঠে কাজ করার সময় আমাকে ও মোহাম্মদ আলী প্রামাণিককে মুজাহিদ বাহিনীর সদস্যরা উচ্চস্বরে ডাকতে থাকলে আমরা তাদের কাছে যাই। তারা বলে, তোদের না আজকে আত্মসমর্পণ করতে হবে! গ্রামের সবাই যাচ্ছে, তোরা না যেয়ে মাঠে কাজ করছিস কেন? এ কথা বলেই আমাদের লাঠি দিয়ে মারতে থাকে। তখন আমরা ভয়ে কান্নাকাটি করি। তারপর তাদের সাথে থাকা মাইক্রোবাসে উঠি। সেখানেও আমাদের মারধর করে। পরে জগদাশ ক্যাম্পে গিয়ে দেখি, গ্রামের অনেকেই সেখানে দাঁড়ানো রয়েছে। আমরাও লাইনে দাঁড়াই। এরপর আমাদের লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় বলা হয়, আমরা যেন সর্বহারা নিধনে সহযোগিতা করি এবং গ্রামে পর্যায়ক্রমে রাতে নিয়মিত পাহারায় অংশ নিই। আমাদের সন্ধ্যার দিকে ছেড়ে দেয়, শুধু সুফলকে রেখে দেয়। সুফলকে এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ক্যাম্পে সুশান্ত সরকারকে আমি দেখিনি। ক্যাম্পে গিয়ে মুজাহিদদের প্রায় সবার হাতে হকিস্টিক-লাঠিসহ বড় বড় দা দেখতে পাই।

৩০ বৈশাখ অর্থাৎ ১৩ মে ২০০৪ জগদাশ ক্যাম্পে সর্বহারার নামে জোরপূর্বক আত্মসমর্পণ করানোর জন্য চামটা গ্রামের ৩৪ জনের সঙ্গে মোঃ সফির আলী প্রামাণিক, বাবা মোঃ কাজেম আলী প্রামাণিক ছিলেন। পেশায় কৃষক সফির আলী জানান, ৩০ বৈশাখের কয়েকদিন আগে গ্রামের সন্তোষ, সিদ্দিক, ইসমাইল, জবর মেম্বার, তজমুলসহ মুজাহিদ বাহিনীর আরও অপরিচিত লোকজন আমাকে এসে বলে, তুই সর্বহারা করিস, তোকে ৩০ বৈশাখ আত্মসমর্পণ করতে হবে ক্যাম্পে। আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করে বলি, আমি গরিব মানুষ কৃষি কাজ করে জীবননির্বাহ করি। সর্বহারা আমি করি না। আমাকে কেন আত্মসমর্পণ করতে হবে? তখন মুজাহিদ বাহিনীর সদস্যরা বলে, তোকে আত্মসমর্পণের মাঠে যেন অবশ্যই দেখি, নইলে তোর বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেবো। সর্বহারা না হয়েও বাধ্য হয়ে সেদিন ক্যাম্পে গিয়েছিলাম। ক্যাম্পে লাইনে দাঁড়ানোর পর আমাকে মুজাহিদরা লাঠি দিয়ে মারধর করে।

গত ০৪.০৬.০৪ তারিখে নওগাঁ জেলায় রানীনগর থানার বহুল আলোচিত বরগাছা ইউনিয়নের আখনা বাঁশবাড়িয়া গ্রামে যাওয়ার পথে বরগাছা ইউনিয়নের চৌমুহনী বাজার অতিক্রম করার সময় চোখে পড়ে বাজারের একটি দোকানের বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, পার্শ্ববর্তী নলদীঘি গ্রামের উত্তম কুমার প্রামাণিকের মিষ্টির দোকানটিতে বাংলা বাহিনীর সদস্যরা চাঁদা দাবি করে। উত্তম চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে বাংলা বাহিনীর সদস্যরা দোকানটি সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

আখনা বাঁশবাড়িয়া এলাকায় বহুল আলোচিত মোঃ আব্দুল খাবির শেখের বাড়িতে স্থাপনকৃত ক্যাম্প ও সশস্ত্র ক্যাডারদের অবস্থানের তথ্যানুসন্ধানে পৌঁছলে এলাকার লোকজনের মধ্যে একধরনের আতঙ্কিত অবস্থা লক্ষ করা যায়। খাবির শেখের বাড়িতে যাওয়ার জন্য নদী-খালের উপর বাঁশের সাঁকোর মাঝামাঝি অংশ খুলে রাখা হয়েছে। ছোট নৌকায়

www.pathagar.com

খাল পার হয়ে বাড়ির ঘাটে পৌছলে খাবির শেখের বড় ছেলে এবং বাংলাভাই বাহিনীর বাঁশবাড়িয়া ক্যাম্প ইনচার্জ মোঃ ইসমাইল শেখের দেখা পাওয়া যায়। তাকে বাংলা বাহিনী বা 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বলে ওঠেন– "ওরা ২০-২৫ জন এসেছিল, তবে বাড়িতে নয়, বাড়ির সম্মুখের ছোট মসজিদ দেখিয়ে বলেন, ওখানে তারা ২-৩ দিন অবস্থান করে চলে যায়। ওনারা এই এলাকার সর্বহারা বাহিনীকে উৎখাত করার জন্য এসেছিল। ওরা না আসলে আমাদের বাঁচার উপায় ছিল না। কারণ, সর্বহারারা আমাদের শান্তি হারাম করে দিয়েছিল। সর্বহারাদের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ।"

ইসমাইল শেখ কথোপকথনের এক পর্যায়ে বলেন– আমার নামে লাইসেন্স করা অস্ত্র আছে, কিন্তু গুলি নাই, গুলির জন্য নওগাঁ ডি সি অফিস, নওগাঁ এস পির কাছে গিয়েছি। সর্বহারারা প্রায়ই আমাদের আক্রমণ করে। ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সারা রাত গ্রামের সবাইকে নিয়ে বিটের (পাহারা) ব্যবস্থা করেছি।"

নিহত আব্দুল কাইয়ুম বাদশা ও খেজুরকে এই ক্যাম্পে আনা হয়েছিল কি না জানতে চাইলে তিনি জানান, এখানে আনা হয়নি। তবে খালের ওপারে আনা হয়েছিল, তারা ভ্যানের ওপর ছিল। ঘটনা শুনে আমি ওপার যাই এবং আমাকে মুজাহিদ বাহিনীর সদস্যরা বলে ডাক্তার নিয়ে আসার জন্য। আমি নিজেই আমাদের গ্রামের দীপেন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসি। সেখানে একজন পুলিশের দারোগা উপস্থিত ছিলেন।

দীপেন ডাক্তার খেজুর ও বাদশার মৃত্যু সম্পর্কে বলেন– "খেজুর ও বাদশার লাশ প্রকাশ্য ভ্যানে করে নিয়ে যায় বাঁশবাড়িয়া-আখনা গ্রামের সড়ক দিয়ে। সেখানে লাশের উপর বালুর বস্তা চাপা দিয়ে সেই বস্তার ওপর বাংলা বাহিনীর সদস্যরা বসেছিল। বাজারে আজকে যারা উপস্থিত ছিল তাদের অনেকেই সেটা দেখেছে, ভয়ে কেউ আজকে মুখ খুলল না।

রানীনগর থানার বরগাছা ইউনিয়নের চৌমুহনী বাজারে এসে পৌছলে স্থানীয় বাজারের পল্লী ফোন ব্যবসায়ী ও বুড়িয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী বাংলা বাহিনী বা জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) কর্তৃক অমানবিক নির্যাতনের বিবরণ দিয়ে বলেন– বাংলা বাহিনী সদস্যরা আমাকে তাদের ক্যাম্পে দেখা করতে বললে আমি কারণ জানতে চাই। তখন তারা বলে, তুমি সর্বহারা দলের সদস্য। তুমি কালকে ক্যাম্পে হাজির থাকবা। আমি তাদের কথামতো পরদিন ক্যাম্পে দেখা করতে গেলে প্রথমে তারা আমার মোবাইলটি নিয়ে নেয় (মোবাইল নং- ০১৭১-৪১৩৩২৫) এবং মারধর করতে থাকে।

ওয়াহেদ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলার সময় স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ির দুইজন সাব ইন্সপেকটর ১. এসআই সালাম, ২. এসআই সফিক উপস্থিত হয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলেন– "এখন এ এলাকায় মানুষ কিছুটা হলেও ভালো আছে। সর্বহারাদের অত্যাচারে এক সময় এ এলাকায় মানুষের চোখে ঘুম ছিল না। এখন এলাকার মানুষ পুলিশকে সহযোগিতা করছে। মানুষ সারারাত জেগে নিজেদের গ্রাম পাহারা দিচ্ছে।"

চৌমুহনী বাজারের মোড়ে উপস্থিত প্রায় ২৫-৩০ জন এলাকার মানুষ পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতেই জেএমজেবি'র কর্মকান্ড ও চাঁদাবাজির কথা বলতে থাকেন, পাশাপাশি নিকট অতীতে সর্বহারাদের অত্যাচারের কথাও বলতে থাকেন।

০৫.০৬.০৪ তারিখে নওগাঁ জেলার রানীনগর থানা এলাকায় ভেটি সিদ্দিকিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে মাদ্রাসায় স্থাপিত পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই পরিমল কুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে তার ক্যাম্প এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান– আমরা গত ২৬.০৫.০৪ তারিখে এখানে ক্যাম্প স্থাপন করেছি। ক্যাম্প স্থাপন করার পরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো আছে। এখনও কোনো ধরনের অভিযোগ ক্যাম্পে আসেনি। কোনো ধরনের ঘটনা আমাদেরও (পুলিশের) নজরে আসেনি। এখানেই বাংলাভাই প্রায় ১৫০-১৬০ সদস্য নিয়ে অবস্থান নেয় ১৯.০৫.০৪ তারিখে।

ভেটি গ্রামের মোঃ চান মিয়াও একই কথা জানান। তাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলত –আমরা সর্বহারা নিধনের জন্য এসেছি, আপনাদের এলাকা সর্বহারামুক্ত করে তবেই যাবো। তারা কোথা থেকে এসেছে জানতে চাইলে কোনো উত্তর দিতো না। তবে যখনই দেখা হতো তখনই তারা আমাদের নামাজ পড়ার জন্য পরামর্শ দিতো।

তিনি আরো জানান– আমাদের এলাকায় সর্বহারাদের উৎপাত ছিল, তবে সবার ক্ষতি তারা করত না, তবুও মানুষ আতঙ্কিত থাকত সর্বহারাদের নিয়ে। এখন অবশ্য মুজাহিদরা আসায় সর্বহারাদের কর্মকান্ড দেখা যাচ্ছে না। এলাকার মানুষ শান্তিতে থাকতে চায়, কোনো দলবল মানুষ বোঝে না। আমরা কৃষিকাজ করে খাই, আমরা এ সবের কিছুই বুঝি না। আমরা এ সব কিছু থেকে মুক্তি চাই।

ভেটি সিদ্দিকিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা সংলগ্ন বাড়ির মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান– ক্যাম্পে বিভিন্ন জায়গা

www.pathagar.com

থেকে লোকজন ধরে নিয়ে এসে নির্যাতন করত। আমি নিজেই দেখেছি, আটককৃত লোকজন বাথরুমে গেলেও মুজাহিদরা দড়ি ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত। তখন দেখতাম তারা হাঁটতে পারছে না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। এরকম বেশ কিছু আটককৃত লোক আমাদের চোখে পড়েছে। তবে আটককৃত কাউকে আমি চিনতে পারিনি, সম্ভবত তারা আমাদের এলাকার লোক না।

ক্যাম্পে আটককৃত লোকজনের মধ্যে কোনো মহিলাকে দেখা গেছে কিনা প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন –ক্যাম্পে একটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যানে করে (স্থানীয় ভাষায় নসিমন) ৬ জন মহিলাকে আনতে দেখেছি। তাদের মধ্যে একজনকে ২০-২৫ বছর, বাকিদের ৩৫-৪০ বছর বয়সী মনে হয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমার বাড়ির সন্নিকটে মাদ্রাসার টিউবওয়েলে ওজু করতে দেখা গেছে। মহিলারা ওজু করার সময়ও পেছনে মুজাহিদ বা বাংলা বাহিনীর সদস্যরা দাঁড়িয়ে পাহারা দিতো। ক্যাম্পে আটককৃত পুরুষ সদস্যদের নির্যাতনের সময় কান্নাকাটির শব্দ শোনা গেলেও কোনো মহিলার চিৎকার বা কান্নাকাটির শব্দ শুনতে পাইনি।

মিজানুর রহমানের স্ত্রী মোছাম্মৎ আদুরী জানান– হঠাৎ করে দেখি মাদ্রাসায় ১০০-১৫০ দাড়িওয়ালা লোক এসে উঠেছে। তারা বিভিন্ন সময় সমস্বরে জিগির করত। এছাড়া তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ব্যায়াম করত। তাদের হাতে লাঠি, হকিষ্টিক দেখেছি। আমরা যখন কাজের জন্য বাইরে বের হতাম, উনারা এসে আমাদের বলত, আপনারা মেয়েমানুষ যতটা সম্ভব বাড়ির ভেতরে কাজ করবেন। আর নামাজ পড়বেন, পর্দায় চলাফেরা করবেন। তখন আমরা বলতাম, এখন ধানের মৌসুম, এখন আমাদের বাইরে কাজ করতেই হবে, আমাদের তো কাজের লোক রেখে কাজ করার মতো সঙ্গতি নেই।

ফলোআপ

আমরা নওগাঁ জেলার আত্রাই রানীনগর ও রাজশাহী জেলার বাগমারা থানা এলাকায় বাংলাভাই ও তার বাহিনী (জেএমবি) কর্তৃক নির্যাতনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত নিম্নোক্ত মামলাগুলোর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে ঘটনাস্থলে যাই। তথ্য সংগ্রহের সময়সীমা ২৭ নভেম্বর ২০০৬ - ৩০ নভেম্বর ২০০৬।

সুফল কুমার সরকার, পিতা- সুশীল চন্দ্র সরকার, গ্রাম- চামটা, থানা- রানীনগর, জেলা- নওগাঁ

সুফল কুমার সরকারকে বাংলাভাই ও তার বাহিনী ১৩ মে ২০০৪ তারিখে সর্বহারা করার মিথ্যা অভিযোগে জোরপূর্বক স্থানীয় স্কুলে নিয়ে যায় স্যারেন্ডার করার জন্য। সুফল ১৩ মে ২০০৪ থেকে অদ্যাবধি নিখোঁজ। পত্রিকায় প্রকাশিত সূত্র অনুযায়ী সুফলকে বাংলাভাই ও তার বাহিনী হত্যা করেছে।

সুফলের মা জানান– আমার ছেলে আজও ফিরে আসল না। আমার ছেলেকে বাংলাভাই ও মুজাহিদরা (স্থানীয়ভাবে জেএমবি সদস্যরা মুজাহিদ নামে পরিচিত) ধরে নিয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত কেউ কোনো খোঁজ দিতে পারল না।

সুফলের ভাই বিদ্যুৎ কুমার সরকার জানান– এ বছরে (২০০৬) বাংলাভাই গ্রেফতার হওয়ার পরপরই রানীনগর থানার ওসি (ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) সৈয়দ মোহসিনুল হক আমাদের বাড়িতে এসে বলে, আপনারা থানায় একটা অভিযোগ দায়ের করেন। আইনগতভাবে থানায় এটা আপনাদের জানানো উচিত। ওসির কথা শুনে আমার বাবা থানায় একটা অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু অভিযোগ দায়েরের পর এখন পর্যন্ত থানা পুলিশের কোনো পদক্ষেপ-কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের জানানো হয়নি।

মামলাটির নম্বর- ৫, তারিখ- ১৫.৩.০৬, রানীনগর, থানা- নওগাঁ, বাদি- সুশীল চন্দ্র সরকার, আসামি- সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাইসহ অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জন মুজাহিদ (জেএমবি সদস্য)।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে থানা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানার জন্য থানায় উপস্থিত হলে ওসি রানীনগর সৈয়দ মোহসিনুল হক জানান– মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে। খুব শিগগিরই মামলার চার্জশিট প্রদান করা হবে। মামলাটির তদন্তকারী অফিসার এস আই এন্তাজউদ্দিন।

এস আই এন্তাজউদ্দিন জানান– মামলাটি খুবই স্পর্শকাতর। তদন্ত কার্যক্রম সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছে। খুব শিগগিরই চার্জশিট প্রদান করতে পারব বলে আশা করছি।

সুশান্ত চন্দ্র সরকার, পিতা- সুধীর চন্দ্র সরকার, গ্রাম- চামটা, থানা- রানীনগর, জেলা- নওগাঁ

সুশান্তের মা বলেন– আমার ছেলের বিষয়ে আপনারা অনেকবার এসেছেন কিন্তু আমার ছেলের তো খোঁজ আপনারা নিয়ে আসতে পারলেন না। আমার ছেলেকে তো ওরা (বাংলা বাহিনী) মেরেই ফেলেছে, নইলে জাগদাশ ক্যাম্প থেকে সবাই

www.pathagar.com

ফেরত চলে আসলেও আমার ছেলে সুশান্ত আর পাশের বাড়ির সুফল ফিরে আসেনি কেন।

সুশান্তের ভাই সমীর চন্দ্র সরকার জানান– বাংলাভাই গ্রেফতার হওয়ার পর রানীনগর থানার ওসি আমাদের বাড়িতে এসে আমার বাবাকে বলেন, আপনারা একটি অভিযোগ থানায় দিয়ে রাখেন, নইলে ভবিষ্যতে আপনার ছেলের বিষয়ে আইনগত সমস্যা হবে। তখন বাবা রানীনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে। আমিই দরখাস্ত নিয়ে গিয়েছিলাম বাবার পক্ষে। এরপর আর কোনো কিছু আমাদের পুলিশ জানায়নি। আমরাও থানায় যাইনি।

সমীরকে দরখাস্তের কপি আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান– না আমাকে কোনো কিছু থানা থেকে দেয়নি। আমি শুধু দরখাস্ত থানায় দিয়ে চলে এসেছি। তবে আমরা শুধু জানিয়েছি যে, আমাদের ভাই নিখোঁজ। মামলা করিনি।

রানীনগর থানার ওসি সৈয়দ মোহসিনুল হক জানান– সংশ্লিষ্ট অভিযোগটি আমরা মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করেছি। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ। মামলাটির আইও আমি নিজেই। মামলাটি তদন্তাধীন। কবে নাগাদ চার্জশিট দেয়া সম্ভব হবে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান– রানীনগর থানা থেকে আমার বদলি হয়ে গেছে মামলাটির তদন্তভার এখন অন্য কাউকে হস্তান্তর করে যেতে হবে। চার্জশিট নির্ভর করবে নতুন আইওর ওপর। তবে আশা করছি, খুব শিগগিরই চার্জশিট দেয়া সম্ভব হবে। থানা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়– সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়েরকৃত মামলা নং-০৪, তারিখ- ১৪.৩.০৬ বাদি- সুধীর চন্দ্র সরকার, আসামি- সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাইসহ অজ্ঞাতনামা ২০-২২ জন।

উল্লেখ্য, ১৩.৫.০৪ তারিখে সকালে বাজার থেকে সুশান্তকে স্থানীয় বাংলা বাহিনীর সদস্যরা জোর করে ধরে নিয়ে যায় জগদাশ হাইস্কুল ক্যাম্পে (বাংলা বাহিনীর ক্যাম্প)। এ সংবাদ শোনার পর সুশান্তর বাবা সুধীর চন্দ্র সরকার জগদাশ হাইস্কুলে গিয়ে ক্যাম্পের লোকজনকে (জেএমবি) অনুরোধ করে ছেলের সংবাদ দেওয়ার জন্য। কিন্তু ছেলেকে দেখতে দেয়নি। ১৬.৫.০৪ তারিখে বিকেল আনুমানিক ৩ টার সময় আত্মীয়-স্বজনসহ ক্যাম্পে পুনরায় গেলে শুধু সুশান্তের বাবাকে দূর থেকে ছেলেকে দেখতে দেয়। ছেলেকে ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলে মুজাহিদরা জানায়, কাল সকালে ছেড়ে দেয়া হবে। পরদিন (১৭.৫.০৪) সকালে সুশান্তের বাবা ক্যাম্পে গিয়ে দেখতে পায় ক্যাম্পের মুজাহিদরা সবাই চলে যাচ্ছে; তখন ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলে মুজাহিদরা জানায়, সুশান্তকে গত রাত্রিতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এরপর থেকেই সুশান্ত নিখোঁজ। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সূত্র থেকে জানা যায়– সুশান্তকে বাংলা বাহিনী হত্যা করেছে।

ইয়াছিন আলী মৃধা, পিতা- মোঃ ইসমাইল হোসেন মৃধা, গ্রাম- সাঁকোয়া, থানা- বাগমারা, জেলা- রাজশাহী

নিহত ইয়াছিন আলী মৃধার ভাই মোঃ ইব্রাহিম জানান– মামলার চার্জশিট হয়েছে। এজাহারে অভিযুক্তদের মধ্যে ২ জনকে বাদ দিয়েই চার্জশিট দিয়েছে মামলার আইও। আমরা আমাদের আইনজীবীর মাধ্যমে মামলা চালিয়ে যাচ্ছি। চার্জশিট দেয়ার আগে আমার কিংবা আমাদের পরিবারের কারও সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা করে নাই। যাদের অভিযুক্ত করে চার্জশিট দেয়া হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা মামলা চালিয়ে যাবো। মামলা নং- ২১, তারিখ- ৩০/৬/০৪, বাগমারা থানা রাজশাহী, বাদি- মোঃ ইব্রাহিম আলী মৃধা।

দীপঙ্কর সাহা, পিতা- দীজেন্দ্র নাথ সাহা, সাং- কাশিয়াবাড়ি, থানা- আত্রাই, জেলা- নওগাঁ

২৭ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে বাংলাভাই ও তার সহযোগীদের নির্যাতনে নিহত দীপঙ্কর সাহার উপরোল্লিখিত ঠিকানায় তথ্যানুসন্ধানে গিয়ে জানা যায় :

দীপঙ্কর হত্যা মামলায় চার্জশিট হয়েছে। দীপঙ্করের বাবা দীজেন্দ্র নাথ সাহা জানান– এজাহারে অভিযুক্ত আসামি ছিল ২৪ জন। কিন্তু মামলার আইও এসআই হামিদ বাগমারা থানা রাজশাহীর ৬ জনকে বাদ দিয়ে মোট ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে চার্জশিট দিয়েছে। আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো কথা না বলেই চার্জশিট দিয়েছে। আমি একজন উকিল ধরেছি এবং বলেছি নারাজি দেওয়ার জন্য। আমার ছেলের হত্যাকান্ডে যারা জড়িত তাদের সবার শাস্তি হোক– এটাই আমি চাই।

নিহত দীপঙ্করের ভাই দ্বীপ শঙ্কর সাহা জানান– আমি মামলার আইও এসআই হামিদকে ফোন করে বলেছিলাম, ভাই আমরা গরিব মানুষ; আমার নিরপরাধ ভাইটাকে যারা খুন করেছে তাদের (এজাহারভুক্ত আসামিদের) কাউকে আপনি বাদ দেবেন না; কেননা এলাকায় অভিযুক্তরা বলাবলি করছে– 'টাকা থাকলে কিছুই হয় না, আমাদের (অভিযুক্তরা) নাম চার্জশিট থেকে বাদ দিয়ে দেবে।' তখন এস আই হামিদ আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন– "তুমি ছোট মানুষ বেশি বুইঝ না।" চার্জশিট হওয়ার পর আসামীদের কথাই ঠিক হলো। এজাহারভুক্ত আসামিদের কয়েকজনের নাম চার্জশিটে নেই।

www.pathagar.com

বাংলাভাইয়ের ক্যাডার হাত-পা বাঁধা একজনকে বাঁশ দিয়ে পেটাচ্ছে

মোঃ খেজুর আলী, গ্রাম- শিম্বা, থানা- রানীনগর, জেলা- নওগাঁ

মোঃ খেজুর আলীর স্ত্রী জানান– বর্তমানে কোনো হুমকি নেই, আর হুমকি দিলেও আমাদের কিছু করার নেই। খেজুরের হত্যাকান্ডের বিচার হবে বলে তো মনে হয় না। মামলার বিষয়ে থানায় গিয়েছিলাম বাংলাভাই গ্রেফতার হওয়ার পর। থানা থেকে এজাহারের কপি চাইলে থানা কর্তৃপক্ষ মামলার নম্বর ও তারিখ একটা কাগজে লিখে বলেছে– মামলার কপি পেতে হলে কোর্টে যেতে হবে। এরপর কোর্টে গেলাম কাগজপত্র তোলার জন্য। আমরা তো কোনো দিন কোর্টে যাইনি, তবুও গিয়েছিলাম কিন্তু কোর্টে কাগজ তুলতে গিয়ে পড়লাম ঝামেলায়। কোর্ট থেকে বলা হলো– দেয়া হবে না। এক পর্যায়ে অনেক অনুরোধ করার পর বলল, ৫০০ টাকা লাগবে। ২০০ টাকা দিতে রাজি হওয়ার পরও দেয়নি। ৫০০ টাকা দিয়ে কাগজ উঠানোর মতো অবস্থা আমাদের এখন নেই। মামলা নং- ৪, তারিখ- ২৮.৫.০৪ রানীনগর, থানা- নওগাঁ, ধারা- ৩৬৪/৩০২/২০১, বাদি- রেনুকা বেগম (খেজুর আলীর বোন)।

রানীনগর থানার সংশ্লিষ্ট মামলার বিষয়ে খোঁজ নিলে জানা যায়, মামলার আইও হচ্ছেন এসআই মোঃ আলী হায়দার। তিনি সংশ্লিষ্ট মামলার বিষয়ে জানান– মামলার তদন্ত শেষ পর্যায়ে। আশা করছি শিগগিরই চার্জশিট দেয়া সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, মোঃ খেজুর আলী স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা। বাংলাভাই ও তার বাহিনী কর্তৃক ২০০৪ সালের ১৯ মে অপহৃত হয়। অতঃপর কয়েকদিন পর রানীনগর সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন ধানক্ষেতের মধ্যে থেকে খেজুর আলীর খন্ডিত লাশ পুলিশ উদ্ধার করেছিল।

শেখ ফরিদ, গ্রাম- ভোপাড়া, থানা- আত্রাই, জেলা- নওগাঁ

মামলার বিষয়ে কথা হয় নওগাঁ জেলার আত্রাই থানা এলাকার ভোপাড়া গ্রামে বাংলা বাহিনীর নির্যাতনে নিহত অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য শেখ ফরিদের মামলার বিষয়ে তার ভাই সিরাজুল ইসলামের (স্কুল শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা) সঙ্গে। সিরাজুল ইসলাম জানান– সংশ্লিষ্ট মামলার চার্জশিট এখন পর্যন্ত থানা কর্তৃপক্ষ দেয়নি। এসআই সিরাজুল ইসলাম মামলার আইও। বারংবার আইও এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও মামলার বিষয়ে বিস্তারিত কোনো কিছু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন তিনি। সম্ভবত আইও প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। মূল আসামি যারা শেখ ফরিদকে প্রকাশ্য নির্যাতন করেছিল (চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়) এবং শত শত মানুষ সেই নির্যাতন দেখেছিল, এমন মামলার আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে কেন যে এত সময় নিচ্ছে সেটা বুঝে উঠতে পারছি না। শেখ ফরিদ অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য, একজন বক্সিং খেলোয়াড়। এলাকার সবাই তাকে চিনত, তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা থাকা তো দূরের কথা কারও ব্যক্তিগত অভিযোগ পর্যন্ত কোনো দিন শুনিনি।

www.pathagar.com

দিনাজপুর

দিনটি ছিল ২০০৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। দিনাজপুর শহরের কালুর মোড় সংলগ্ন ছোট গুড়গোলার একটি টিনশেড বাড়িতে সকাল পৌনে ৭টার দিকে হঠাৎ করে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। পুরো বাড়ির টিনের চালা বিস্ফোরণে দুমড়ে-মুচড়ে উড়ে যায়। বাড়ির ভেতর প্রতিটি ঘর লন্ডভন্ড হলো। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আশপাশের লোকজন পালিয়ে যেতে থাকল। পুলিশ এলো, সাংবাদিক এলো।

এই বাড়ির মালিক সোহরাব হোসেন। ঘটনার ৪ মাস আগে তার কাছ থেকে রাজবাটি নিবাসী হাফেজ মোঃ শহিদুল্লাহর পুত্র হাফেজ মোঃ আনোয়ার সাদাত (ওবায়দুল্লাহ) মেস হিসেবে বাড়িটি ভাড়া নেয় এবং ৬ জন তরুণ এখানে ছাত্র হিসেবে বসবাস করতে থাকে। এই বাড়িতে দাড়ি-টুপিওয়ালা অনেকের যাতায়াত ছিল। গভীর রাতেও গাড়ি নিয়ে কোনো কোনো দাড়ি-টুপিধারী ব্যক্তি আসতেন। কিন্তু তারা জঙ্গি এমনটি কেউই কখনো মনে করেননি।

১২ ফেব্রুয়ারি পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপনের পর ১৩ ফেব্রুয়ারি সকালে পৌনে ৭টায় হঠাৎ করে বোমা বিস্ফোরণে পুরো বাড়ি উড়ে যাওয়ার ঘটনায় আশপাশের মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারা ভাবতেই পারেননি যে, এই বাড়ি জঙ্গি আখড়া হয়ে উঠেছে। বাড়িটিতে ১০ থেকে ১২টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিশ ও এলাকাবাসী মনে করে, বানানোর সময় অসতর্ক মুহূর্তে বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয়েছে। বিস্ফোরণের পরপরই একটি সাদা মাইক্রোবাসযোগে ৪ তরুণকে আহত অবস্থায় পালিয়ে যেতে দেখে এলাকাবাসী।

উদ্ধারকৃত মালসামান

ছোট গুড়গোলায় ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর পুলিশ পুরো বাড়ি ঘিরে সেখান থেকে ৩টি রিভলবার, ২২টি ছোট বোমা, ২টি বড় বোমা, শতাধিক কার্তুজ, টাইম বোমা তৈরির সার্কিট, ইলেক্ট্রনিক্স ব্যাটারি, রিমোট কন্ট্রোল একটি, মোবাইল ফোন ২টি, সাথীজনের তালিকা, সশস্ত্র সংগ্রামের কলাকৌশল সংক্রান্ত নির্দেশিকা, জঙ্গি ইসলামি সংগঠনের ব্যক্তিদের চাঁদা আদায় রসিদ, ৬টি স্টিলট্রাঙ্ক, সেনা কমান্ডোদের কয়েক জোড়াসহ এক বস্তা জুতা, কয়েক সেট সেনা পোশাক, ৪০টি লুঙ্গি, ২০টি ট্র্যাভেল ব্যাগ ইত্যাদি উদ্ধার করে।

মামলা দায়ের

কোতোয়ালি পুলিশ এ ঘটনায় ২টি মামলা স্পেশাল কোর্টে দায়ের করে। এর একটাতে এস আই ওয়াহেদুজ্জামান, অপরটিতে এস আই জমির বাদি ও ইনভেস্টিগেশন অফিসার। মুলত ছোট গুড়গোলার ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাংবাদিকরা দেশ জুড়ে জঙ্গি তৎপরতা বিষয়ক যে খবরগুলো প্রকাশ করছিলেন তার সত্যতা আছে। ঘটনাস্থল থেকে জামাআতুল মোজাহিদিনের লিফলেট, চাঁদার বই, অন্য বিষয়ক বই, ক্যাসেট, ভাষণ, অস্ত্র ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ

দিনাজপুর জেলায় যখনই জঙ্গিরা বড় ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, পুলিশ তৎপর হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুলিশের ভূমিকা নানা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে। কারণ পুলিশি ভূমিকা তখন জঙ্গিদের অনুকূলে গেছে। পার্বতীপুরে জঙ্গি গ্রেফতার ও পরবর্তী সময়ে মামলার বিষয়টি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। ২০০২ সালের ২০ মে পার্বতীপুর থানার এস আই আবু সাঈদ পেট্রোল ডিউটি করার সময় লোকজনের মুখে জানতে পারেন যে, জাহানাবাদ বাজারপাড়া এলাকায় গভীর রাতে কিছু যুবক জনগণের হাতে আটক হয়েছে। তারা তখন প্রশিক্ষণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই প্রশিক্ষণ কিসের, কি জন্য– লোকজন তা বলতে ব্যর্থ হলেও তারা একথা বলেন যে, যুবকরা অপরিচিত এবং তাদের আচরণ সন্দেহজনক। এস আই আবু সাঈদ তার সঙ্গে থাকা পুলিশ নিয়ে জাহানাবাদ বাজারপাড়া এলাকা ঘেরাও করেন এবং প্রশিক্ষণরত ৮ জঙ্গিকে গ্রেফতার করেন। জঙ্গিরা হলো–

১. মোঃ সাহাবুল ইসলাম, পিতা- আব্দুল্লাহ শেখ, সাং- চর রঘুনাথপুর, থানা ও জেলা- কুষ্টিয়া;
২. মোঃ ওবায়দুল্লাহ সুমন, পিতা- মৃত নূরুল আমিন, সাং- রাজবাড়ি, থানা- ত্রিশাল, জেলা- দিনাজপুর;
৩. মোঃ মোশাররফ হোসেন কালু, পিতা- মোঃ তারেক আলী;
৪. মোঃ আনোয়ার হোসেন, পিতা- আব্দুল মাজেদ, সাং- দরগাপাড়া, থানা- পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুর;

www.pathagar.com

৫. ওমর ফারুক, পিতা- আবু বকর সিদ্দিক, সাং- কালিকাবাড়ি, ডাঙ্গাবাড়ি;

৬. মোঃ আবু বক্কর, পিতা- মোঃ জহুরুল হক, সাং- হলদীবাড়ি, থানা- পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুর;

৭. মোঃ লুৎফর রহমান, পিতা- মৃত মনিরউদ্দিন, সাং- ভীমপুর প্রামাণিকপাড়া, থানা- তারাগঞ্জ, জেলা- রংপুর;

৮. মোঃ মোস্তাকিম, পিতা- একরামুল হক, সাং- বাঙ্গালীপুর মন্ডলপাড়া, থানা- সৈয়দপুর, জেলা- দিনাজপুর;

৯. ইয়াহিয়া (এহিয়া), পিতা- আব্দুর রহমান, সাং- হলদীবাড়ি দোলাপাড়া, থানা- পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুর।

পুলিশ গ্রেফতারের সময় এই আসামিদের কাছ থেকে ২৫টি পেট্রোল বোমা, বিপুল সংখ্যক ধারালো অস্ত্র, জামাআতুল মুজাহিদিনের লিফলেট, রেজিস্টার বই, চাঁদা বই ইত্যাদি পায়। এছাড়া কালো হাফ প্যান্ট এবং গেঞ্জিও পাওয়া যায় তাদের কাছ থেকে।

দিনাজপুরে জঙ্গি প্রশিক্ষণের অভিযোগে গ্রেফতারের এটি প্রথম ঘটনা। কিন্তু পুলিশ গ্রেফতার পরবর্তী সময়ে এই মামলাটি নিয়ে লুকোচুরি খেলে। সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করে। এই মামলায় পুলিশ বাদি হলেও পরে তারা জঙ্গিদের পক্ষ নিয়েই কাজ করেছে। মামলার সব আলামত নষ্ট করে দিয়ে বোমা, ধারালো অস্ত্র, জঙ্গি পুস্তকসহ গ্রেফতার হওয়া জঙ্গিদের বেকসুর খালাস পাইয়ে দিতে সবচেয়ে বড় সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে পুলিশ বাহিনী নিজে।

এই মামলার রায় হয় ২০০৪ সালের ৩১ মার্চ। দিনাজপুর জেলা জজকোর্টের স্পেশাল জজ জি এম সালাহউদ্দিন প্রদত্ত রায়ে গ্রেফতারকৃত সব জঙ্গিকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। রায়ে তিনি বলেন, এই মামলায় সরকার পক্ষ হতে ২৫ জন সাক্ষীকে হাজির করা হয়। এর মধ্যে মামলায় সিজারলিস্টভুক্ত সাক্ষীরা এবং অন্যান্য সাক্ষীরা ঘটনা সম্পর্কে কোনো কিছু অবগত নয় বলে আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছে। এছাড়া উদ্ধারকৃত ২৫টি পেট্রোল বোমা, আটক ব্যক্তিদের পরনের কালো প্যান্ট ও গেঞ্জি, বোমা তৈরির কাঁচামাল, ধারালো অস্ত্র এবং ইসলামি জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদিনের বিভিন্ন লিফলেট, রেজিস্টার বই, চাঁদা আদায়ের রসিদ– এসব আলামত হিসেবে জব্দ করে পাবর্তীপুর থানায় মালখানায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু এই মামলা চলাকালে এসব আলামত বাদিপক্ষ আদালতে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণ ও আলামতের অভাবে আসামিরা বেকসুর খালাস পায়।

এখানে উল্লেখ্য, এই মামলা চলাকালে বাদিপক্ষ আদালতকে জানায় যে, পার্বতীপুর থানার মালখানায় অগ্নিকান্ডজনিত কারণে আলামতগুলো নষ্ট হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, পার্বতীপুর থানায় কখনোই কোনো আগুন লাগেনি। অবশ্য এই মামলায় বেকসুর খালাস পাওয়া ওবায়দুল্লাহ সুমন দিনাজপুর আদালতে একটি বোমাবাজির মামলায় ১৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছে।

২০০৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর শহরের উক্ত জঙ্গি আস্তানা অর্থাৎ সোহরাব হোসেনের পুরো বাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এই ধ্বংসস্তূপের ছবি তোলেন কয়েকজন সাংবাদিক। কিন্তু রহস্যজনক কারণে কোতোয়ালি পুলিশ ঐ দিনই ফটো সাংবাদিকদের কৌশলে থানায় ডেকে নেন। অবশ্য ওসি শুকরানা ফিল্ম খরচ ৫০০ টাকা সাংবাদিকদের দিয়ে দেন। সাংবাদিক সালাহউদ্দিন আহমেদ জানান, ওসি শুকরানা তাকে একটি ছবি তুলতে হবে বলে ডেকে পাঠান। কিন্তু থানায় যাওয়ার পর বিনীতভাবে বলেন ক্যামেরার ফিল্ম দিতে। তিনি ফিল্ম খরচ বাবদ ৫০০ টাকা দিয়ে দেন। ফলে সালাহউদ্দিন বাধ্য হয়ে ক্যামেরা থেকে ফিল্ম খুলে ওসিকে দিয়ে দেন।

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, পুলিশ কেন এ কাজ করতে গেল? শুধু তাই নয়, যে বাড়িটি জঙ্গি বোমায় বিস্ফোরিত হয়, কোতোয়ালি পুলিশ নিজস্ব অর্থায়নে সেই বাড়ির চালা এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত আসবাবপত্র ১৫ দিনের মধ্য এমনভাবে নতুন করে মেরামত করে দেয়, যেন এখানে কখনোই কিছু হয়নি।

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম

সেখ নাসির আহমেদ

১৭ আগস্ট ২০০৫। বাংলাদেশের অস্তিত্বে জঙ্গিবাদের এক নির্মম আঘাতের দিন। এদিন দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে শুধু মুন্সীগঞ্জ জেলা বাদে ৬৩টি জেলার জঙ্গিদের বোমায় আক্রান্ত হয়। প্রায় ৫শ' বোমা নিক্ষেপের ঘটনায়– চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও সাভারে ২ জন নিহত এবং সারাদেশে শতাধিক আহত হয়। বোমা হামলার সাথে জঙ্গিরা একটি লিফলেট ছড়িয়ে দেয়– যাতে মানব রচিত আইন বাদ দিয়ে আল্লাহর আইন কায়েম করার আহ্বান জানানো হয়। মূলত বাংলাদেশে ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ যশোরে উদীচী সম্মেলনে বোমা হামলার মাধ্যমেই এই বোমা আতঙ্ক শুরু। ঐ ঘটনায় ১০ জন নিহত হয়েছিল। এরপর আলোচিত বোমা ও গ্রেনেড হামলাগুলোর মধ্যে রয়েছে রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান (১৪ এপ্রিল ২০০১ সালে, ১১ জন নিহত), বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের জনসভা (২১ আগস্ট, ২০০৪, ২৪ জন নিহত), সিলেটে শাহজালালের মাজার জিয়ারতের সময় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত (২১ মে, ২০০৪, তিনজন নিহত), হবিগঞ্জের বৈদ্যেরবাজারে সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার জনসভা (২৭ জানুয়ারি, ২০০৫, ৫ জন নিহত)। তবে ১৭ আগস্টের বোমার সাথে এর পার্থক্য হলো পৃথিবীর কোনো দেশেই দেশজুড়ে প্রায় একই সময় সমন্বিতভাবে বোমা বিস্ফোরণের কোনো নজির নেই। মনে করা হয়, এই হামলা ছিল ক্ষয়ক্ষতিকে এড়িয়ে দেশবাসীর কাছে তথা সরকারের কাছে ইসলামি জঙ্গিদের শক্তিমত্তার একটি বার্তা পৌঁছানো।

বার্তাটি হলো– মুসলিম এই জঙ্গিবাদীরা সুসংগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত। সুপরিকল্পিতভাবে প্রায় সারা দেশে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তারা তা প্রমাণও করলো। এ ঘটনার অনেক আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জঙ্গিদের অপতৎপরতা ও নৃশংসতার কথা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল। বিশেষ করে রাজশাহী, টাঙ্গাইল, বগুড়া, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, সিলেট, সাতক্ষীরাসহ দেশের বেশ কিছু জায়গায় জেএমবির নেতৃত্বে এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের কিছু মাদ্রাসাসহ গহিন জঙ্গলের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গিদের তৎপরতার সংবাদ পত্রপত্রিকাগুলো প্রকাশ করেছে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে জঙ্গিদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করলো। এর ফলে জঙ্গিদের এই উত্থান, যার দায়দায়িত্ব সরকার কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও গ্রেফতারকৃত আসামিদের জবানবন্দি থেকে জানা যায় যে, মূলত জেএমবি (জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ), জেএমজেবি (জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ) এবং হরকাতুল জিহাদের সমন্বিত একটি দল সমমনা আরও কিছু সংগঠনের সহায়তায় এ নৃশংস ঘটনা ঘটায়। উল্লেখ্য, জেএমবি মূলত আহলে হাদিসের অনুসারীদের মধ্যেই সক্রিয়। ১৭ আগস্টের বোমা হামলার ঘটনায় দেশব্যাপী অসংখ্য মামলা দায়ের করা হয়েছে। এখানে আমরা আলোচনার জন্য চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার থানাগুলোকে বেছে নিয়েছি। ঐ দিন ঐ ঘটনায় চট্ট-মেট্রোর বিভিন্ন থানায় পাঁচটিসহ পরবর্তীকালে সংগঠিত আরও তিনটি মোট আটটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রথম পাঁচটি মামলায় নির্দিষ্ট পাঁচজনকে (সদরুল আনাম, আরশাদুল আলম, আঃ সাত্তার মোল্লা, জাহাঙ্গীর আলম ও আবুল কালাম আজাদ) সন্দেহজনক গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই আহলে হাদিসের অনুসারী। একটি মামলায় ঐ পাঁচজন আসামিকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র জমা দেয়া হয়েছে। অন্য মামলাগুলোতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে। ফলে সব সন্দেহজনক গ্রেফতারকৃত আসামিগণ মামলা থেকে অব্যাহতি পান। যার অর্থ ঐ মামলাগুলোয় কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অভিযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ঐ পাঁচজন ছাড়া অন্য কোনো আসামিও তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তারা খুঁজে পাননি। উপরোক্ত তথ্যচিত্র থেকে সহজেই মামলাগুলোর তদন্তের মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

আহলে হাদিসের আমির ড. আসাদুল্লাহ গালিবের আপন ভাগ্নে উপরোক্ত পাঁচটি মামলার সন্দেহজনক আসামি সদরুল আনাম। ৩০ আগস্ট এই সদরুল আনাম ও আরশাদুল আলম ওরফে টি আসলাম চট্টগ্রামে গ্রেফতার হয়। আরশাদুল আলম পুলিশের কাছে জবানবন্দিতে জানায় যে– ৬-৭ আগস্ট ভয়ঙ্কর জঙ্গি মোহাম্মদ (বর্তমানে গ্রেফতার) ৫০ কেজি ওজনের সারের বস্তায় ২ বস্তা পাউডার জাতীয় দ্রব্য এনে দক্ষিণ পাহাড়তলীর ঝাউতলা আহলে হাদিস মসজিদে রাখে। পরে সেখান থেকে ছোট ছোট কার্টুনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়। এখানে উল্লেখ্য, আগে সদরুল আনাম চট্টগ্রাম সরকারি সার কারখানা টিএসপি কমপ্লেক্সে চাকরি করতো। ১৭ আগস্টের আগে এখান থেকে ১১৮২ টন সারের কাঁচামাল রক

www.pathagar.com

সালফারের (যা বিস্ফোরক তৈরির উপাদান) সরানো হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কারণ এগুলোর কোন হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে, এর একটি অংশ জঙ্গিদের হস্তগত হয়। অথচ সদরুল আনামসহ উক্ত পাঁচজনের বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পাননি বলে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে আইও যে তথ্য প্রদান করেছেন, অনেককে তা সন্দিগ্ধ করতেই পারে। অন্যদিকে তারা দুর্বল চার্জশিটের কারণে মামলা থেকে অব্যাহতিও পেয়ে যায়।

চট্টগ্রামের যে কয়টি মামলা নিয়ে এখানে পর্যালোচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো–

১. জি আর নং- ৬১৪/০৫, তাং- ১৭/৮/২০০৫, ধারা- ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারা, থানা- কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম। চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে।

২. জি আর নং- ৪২৪/০৫, তাং- ১৮/৮/২০০৫, ধারা- ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক আইনের ৩/৪ ধারা, থানা- ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম। চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে।

৩. জি আর নং- ৫৯৮/০৫, তাং- ১৭/৮/২০০৫, ধারা- ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক আইনের ৩/৪(এ)৬ ধারা, থানা- খুলশী, চট্টগ্রাম। এই মামলায় শায়খ আবদুর রহমান ও সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলাভাইসহ ১৭ আগস্টের কমন পাঁচজন আসামিকে (সদরুল আনাম, আরশাদুল আলম, আঃ সাত্তার, জাহাঙ্গীর আলম ও আবুল কালাম আজাদ) কে অভিযুক্ত করে একটি দুর্বল অভিযোগ পত্র জমা দেয়া হয়।

৪. জি আর নং- ৪২০/০৫, তাং- ১৭/৮/২০০৫, ধারা ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক আইনের ৩/৪ ধারা, থানা- হালিশহর, চট্টগ্রাম। চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দয়া হয়েছে।

৫. জি আর নং- ৪১৮/০৫, তাং- ১৭/৮/২০০৫, ধারা- ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারা, থানা- পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে।

৬. জি আর নং- ৭৩৯/০৫, তাং- ০৩/১০/২০০৫, ধারা- ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক আইনের ৩ক/৪ ধারা, থানা- কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম আদালতের এজলাসে বিচারকের ওপর বোমা হামলার দায়ে এই মামলাটি দায়ের করা হয়। লাল্টু ও শাহাদাতকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র প্রদান করা হয়েছে।

৭. জি আর নং- ৬৬৫/০৫, তাং- ১৪/১২/২০০৫, ধারা- ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯-ক ধারা, থানা- পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলার প্রেক্ষিতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় তাদের হেফাজতে থাকা বোমা ও বোমা তৈরির উপকরণ উদ্ধার করা হয়। এই মামলায় জাবেদ ইকবাল ওরফে মোহাম্মদ ও নাইমুজ্জামানের ২০ বছর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

উল্লিখিত আটটি মামলার পর্যবেক্ষণের দেখা যায়, ১৭ আগস্টের বোমা হামলার ঘটনায় পাঁচটি মামলা দায়ের করা হয়। এর মধ্যে কোতোয়ালী থানায় দায়েরকৃত জি আর নং- ৮৭৪/০৫ মামলাটি ব্যতীত অন্য সবক'টিতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। চূড়ান্ত প্রতিবেদনগুলো এতই অপরিপক্ব যে, তা যেকোনো সচেতন মানুষকেই বিচলিত করবে। উদাহরণস্বরূপ একটি প্রতিবেদনের আংশিক নিচে উল্লেখ করা হলো।

"সদরুল আনাম, আরশাদুল আলম, আঃ সাত্তার মোল্লা, জাহাঙ্গীর আলম, আবুল কালাম আজাদ, শফিকুল ইসলাম, প্রঃ আব্দুল্লাহ আবুল হাফিজগণ প্রত্যেকেই নিষিদ্ধ ঘোষিত জেএমবি নামক সংগঠনের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। কিন্তু তাহারা কোতয়ালী থানা এলাকায় বিস্ফোরিত বোমা হামলার সাথে জড়িত মর্মে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ...নিষিদ্ধ ঘোষিত জেএমবি নামক সংগঠনের অনুসারীরা সারা দেশে একই সাথে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাইয়া জানমালের ক্ষতি করাসহ সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে। ...মামলাটি আমার তদন্তে স্বাক্ষী প্রমাণ আলামত পর্যালোচনা ও সার্বিক পরিস্থিতি অবলম্বনে মামলার ঘটনাটি ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩ ধারা মতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু তদন্তকালে যথাসাধ্য চেষ্টা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও এই মামলার গ্রেফারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সাক্ষী প্রমাণ না পাওয়ায়... গ্রেফতারকৃত আসামীদের এই মামলায় সন্দিগ্ধ দেখাইয়া মামলার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানের... চূড়ান্ত রিপোর্ট... দাখিল করিলাম।"

চূড়ান্ত প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সবগুলো প্রতিবেদনই গৎবাঁধা, একই রকম। প্রতিটা ক্ষেত্রেই সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার কথা বলে মূল সমস্যার পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে কারণে প্রতিটি চূড়ান্ত প্রতিবেদনের বক্তব্য প্রায় একই রকম। এভাবেই কৌশলে অথবা রহস্যজনক কারণে মামলাগুলোর তদন্ত পরিপূর্ণতা পায়নি। যে কারণে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছে জঙ্গিবাদের মাধ্যমে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠায় রত দেশের ভেতর সক্রিয় ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠী।

www.pathagar.com

জঙ্গিদের অর্থ যোগানদাতা মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক এনজিও

টিপু সুলতান

ব্যাপক জঙ্গি তৎপরতা, দেশব্যাপী ধারাবাহিক বোমা হামলা, বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, গ্রেফতার করা জঙ্গিদের মামলার তদবির এবং গোপনে দলীয় যোগাযোগ, বৈঠক ও অন্যান্য কাজে দরকার বিপুল অর্থ। জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)'র এই বিপুল অর্থের উৎস কি? এ নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি এ ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতাও জনমনে অনেক প্রশ্নের উদ্রেক ঘটাচ্ছে।

এক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) দিকে অনেকেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। এরা নানাভাবে এ দেশে জঙ্গিদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জেএমবির তৎপরতার সরেজমিন খোঁজ নিতে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ঘুরে বিশ্বব্যাপী আল কায়দার সহযোগী সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত একাধিক এনজিওর তৎপরতা ও জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, বিভিন্ন দেশে আল কায়দার সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত কুয়েতভিত্তিক ইসলামি দাতব্য সংস্থা রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (আরআইএইচএস) নয় বছর ধরে বাংলাদেশে তৎপর ছিল। সন্ত্রাসের মদদদাতা হিসেবে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কালো তালিকাভুক্ত এ সংস্থাটি বন্ধ হয়ে পড়া আল কায়দার আরেক সহযোগী সংস্থা আল হারামাইনের হয়েও কাজ চালিয়েছিল।

জানা গেছে, আরআইএইচএস বাংলাদেশে কাজ শুরু করে ১৯৯৬ সাল থেকে। সংস্থার অফিস সূত্র জানায়, তারা মসজিদ, এতিমখানা, মাদ্রাসা, ওজুখানা, নলকূপ বসানোর মতো দাতব্য কাজ করে থাকে। তারা দেশের বিভিন্ন জেলায় একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, দশটি মাদ্রাসা, চারটি এতিমখানা, এক হাজার মসজিদ, এক হাজার একশ' ওজুখানা নির্মাণ ও সহস্রাধিক নলকূপ বসিয়েছে। এসব কাজের সিংহভাগই করা হয়েছে উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলা ও জেএমবির আমির শায়খ আবদুর রহমানের নিজ জেলা জামালপুরে। উল্লেখ্য, ড. গালিবের নেতৃত্বাধীন আহলে হাদিস কাজ শুরু করে ১৯৯০ সালে এবং জেএমবি কাজ শুরু করে ১৯৯৮ সালে। জানা গেছে, আরআইএইচএসের মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ কাজের ঠিকাদারদের প্রায় সবাই শায়খ আবদুর রহমান ও ড. গালিবের লোকজন। এর মধ্যে গালিবের ভাগ্নে বদরুল আনাম এবং গালিবের সহযোগী আবদুস ছামাদ সালাফি সবচেয়ে বড় ঠিকাদার। জঙ্গি তৎপরতার অভিযোগে আবদুস ছামাদ সালাফি ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রেফতার হওয়ার পর তার পক্ষে কাজ দেখাশোনা করছেন আরআইএইচএসের শিক্ষক আকমল হোসাইন।

উত্তরাঞ্চল ঘুরে দেখা গেছে, শায়খ আবদুর রহমান, ড. আসাদুল্লাহ গালিব, আবদুস ছামাদ সালাফি, সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাইসহ জেএমবির জঙ্গি নেতাদের প্রায় সবার নিজ ও কর্মএলাকায় আরআইএইচএসের কর্মকান্ড রয়েছে। যেখানেই জঙ্গিদের তৎপরতা ও প্রশিক্ষণের খবর পাওয়া গেছে সেখানেই আল হারামাইনের নির্মিত মসজিদ এবং আরআইএইচএসের মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা পাওয়া গেছে। স্থানীয় লোকজনের কাছে এগুলো সৌদি বা কুয়েতি মসজিদ-মাদ্রাসা হিসেবে বহুল পরিচিত।

জেএমবির প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় যে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়েছিল তা ছিল শিমুলতলি মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে। স্থানীয় লোকজন জানান, ওই সময় প্রায় প্রতিমাসে শায়খ আবদুর রহমান, ড. গালিব, বাংলাভাই এ মাদ্রাসায় এসে বৈঠক করতেন। ড. গালিব প্রতিষ্ঠিত তাওহিদ ট্রাস্ট পরিচালিত শিমুলতলি মাদ্রাসার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করত আরআইএইচএস। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আনা অর্থের হিসাব নিয়ে মতবিরোধকে কেন্দ্র করে ২০০০ সালে ড. গালিব ও সেক্রেটারি অধ্যাপক রেজাউল করিমের নেতৃত্বে আহলে হাদিস আন্দোলন বিভক্ত হয়ে পড়ে। এতে তাওহিদ ট্রাস্ট চলে যায় রেজাউল করিমের নেতৃত্বাধীনে। তখন বাংলাভাই এবং মাদ্রাসার দুই শিক্ষকের নেতৃত্বে সব ছাত্র একযোগে মাদ্রাসা থেকে চলে যায়। ওই ছাত্ররা পরে রাজশাহীর নওদাপাড়ায় ড. গালিবের মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। অধ্যাপক রেজাউল করিম এই প্রতিবেদককে জানান, ২০০০ সালের পর আরআইএইচএস শিমুলতলি মাদ্রাসাকে আর কোনো অর্থ দেয়নি। একইভাবে তাওহিদ ট্রাস্টের মাধ্যমে আরআইএইচএস পরিচালিত বগুড়ার নশিপুরের আল মারকাজুল ইসলামি ওয়া দারুল আইতাম, বাগেরহাটের কালিদিয়া এলাকার আল মারকাজুল ইসলামি আস সালাফী এবং সাতক্ষীরার বাকাল এলাকার আল

www.pathagar.com

মারাকাজুল ইসলামি দারুল হাদিস মাদ্রাসায়ও জেএমবির কর্মকান্ড ও বৈঠক হতো। ২০০০ সালে তাওহিদ ট্রাস্ট ড. গালিবের নিয়ন্ত্রণ থেকে চলে যাওয়ার পর আরআইএইচএস এসব মাদ্রাসায় ২০০১ সাল থেকে সব সাহায্য বন্ধ করে দেয়।

রাজশাহীর নওদাপাড়ায় বিশাল এলাকাজুড়ে প্রতিষ্ঠিত আল মারকাজুল ইসলামি আস সালাফী নামক মাদ্রাসাটির সব ব্যয় নির্বাহ করে আরআইএইচএস। এই মাদ্রাসা থেকেই ড. গালিবের সব কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। আহলে হাদিস আন্দোলন ও আহলে হাদিস যুব সংঘের প্রধান কার্যালয়ও এখানে।

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়ায় নিষিদ্ধ আল হারামাইনের একটি আঞ্চলিক অফিস এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। রংপুর শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে যমুনার তীরে প্রত্যন্ত গ্রামে বিশাল এলাকাজুড়ে ক্যাডেট কলেজের আদলে নির্মিত এই মাদ্রাসায় ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে গিয়ে দেখা যায়, হারামাইনে কর্মরত সুদানি নাগরিক নুরউদ্দিন মোহাম্মদ ইব্রাহিম সেখানে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অভিযোগ রয়েছে, এখান থেকে নানাভাবে জঙ্গিদের সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। পরিচালক নুরউদ্দিন মো. ইব্রাহিম জঙ্গিদের সহযোগিতার কথা অস্বীকার করেন। তিনি জানান, আমেরিকার চাপে সরকার আল হারামাইন বন্ধ করে দেয়ার পর তিনি আরআইএইচএস ও কাতার চ্যারিটেবল সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে কাতার চ্যারিটেবল সোসাইটির আর্থিক সাহায্য নিয়ে তিনি এ প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন বলে জানান। এখানে প্রায় ৩৫০ ছাত্র রয়েছে বলে তিনি জানান। এ অঞ্চল ঘুরে দেখা গেছে, প্রায় প্রতি দু'একটি বাড়ি পরপরই আল হারামাইন, আরআইএইচএস, কাতার চ্যারিটেবল সোসাইটি কিংবা সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তৈরি মসজিদ-মাদ্রাসা রয়েছে। নুরউদ্দিন মো. ইব্রাহিম জানান, ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কাজকর্মও ওই এলাকায় তিনি তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

ঠাকুরগাঁও, রাণীশংকৈল উপজেলা সদরে আরআইএইচএস প্রতিষ্ঠা করেছে আল ফুরকান ইসলামিক সেন্টার নামে একটি মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন সুদানের নাগরিক আবদুল্লাহ। আপত্তিকর কর্মকান্ডের কারণে এলাকাবাসীর প্রতিবাদের মুখে সংস্থা তাকে প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় আরআইএইচএসের দাওয়া বিভাগের পরিচালক শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালামেরই আপন ভাই মোজাম্মেল হককে। এই মোজাম্মেল হকের ভাতিজা নসরুল্লাহ জেএমবির প্রতিষ্ঠাকালীন শূরা সদস্য। নসরুল্লাহ ২০০২ সালে রাঙ্গামাটিতে বোমা বানাতে গিয়ে নিহত হয়। ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন এনজিওতে একের পর এক বোমা হামলা ঘটতে থাকলে পুলিশ এই মাদ্রাসায় অভিযান চালায় এবং বেশ কিছু সিডি জব্দ করে। তখন রাণীশংকৈল থানার ওসি স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেছিলেন, এই মাদ্রাসা থেকে জঙ্গি তৎপরতা পরিচালনা হয় বলে পুলিশের কাছে গোপন খবর ছিল। ১৭ আগস্ট বোমা হামলার পর এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হককে পুলিশ একাধিকবার আটক করেছিল। অবশ্য মোজাম্মেল হক এই প্রতিবেদকের কাছে জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি ড. গালিবের নেতৃত্বাধীন আহলে হাদিস আন্দোলন ঠাকুরগাঁও জেলা শাখার আমির বলে স্বীকার করেছেন।

ইতোপূর্বে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় মসজিদে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় যেসব জঙ্গি সদস্য গ্রেফতার হয়েছে, তারা প্রায় সবাই কুয়েতি মসজিদ অথবা আল হারামাইনের মসজিদ থেকে গ্রেফতার হয়েছে। জানা গেছে, রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির আরবি নাম হচ্ছে জমিয়াতুল এহয়িয়া-উৎ-তুরাজ। ২০০২ সালের ৯ জানুয়ারি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই সংস্থাটিসহ চারটি সংস্থাকে আল কায়দার সহযোগী সংস্থা হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত করে। এরপর পাকিস্তান সরকারও ওই দেশে এর সম্পদ জব্দ করে। আলবেনিয়াতে ২০০৫ সালের ১ জুন এর কার্যক্রম বন্ধ করে এক কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ ব্যাপারে তখন আলবেনিয়া সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আলবান বেকঝা বলেছিলেন, রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি, আল হারামাইন ও তাইবাহ ইন্টারন্যাশনাল দাতব্য কাজের আড়ালে গোপনে সন্দেহমূলক কর্মকান্ডে অর্থ ব্যয় করছে।

জানা গেছে, দাতব্য কার্যক্রমের আড়ালে গোপনে জঙ্গি তৎপরতায় অর্থায়ন এবং জেএমবির আমির শায়খ আবদুর রহমান ও আহলে হাদিসের আমির ড. গালিবকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার বিষয়টি কয়েক বছর আগেই গোয়েন্দা সংস্থার নজরে আসে। এ ব্যাপারে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা বিভিন্ন সময় তদন্ত করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনজিও ব্যুরোর একজন সাবেক পরিচালক জানিয়েছেন, ব্যুরোর পক্ষ থেকেও এ সংস্থার ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়েছে।

এ সংস্থার প্রধান কার্যালয় হচ্ছে রাজধানীর উত্তরায় ৪০ লেক ড্রাইভ রোডে। সরকারি নথি অনুযায়ী এ সংস্থায় ৬ জন বিদেশী নাগরিক কর্মরত আছে। এর মধ্যে সাজলী রিফাত বিন ওসমান মোহামেদ (সুদানের নাগরিক) উপ-মহাপরিচালক, জাফর এ মুসা (ইরাকি) পরিচালক, মাহমুদ ইসমাইল মাহমুদ (সুদানি) পরিচালক, কামাল হাসান (সুদানি) পরিচালক,

www.pathagar.com

আব্বাস বাইয়ো ইব্রাহীম (সুদানি) হিসাবরক্ষক, মোহামেদ আহমেদ (সুদানী) অর্থ পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। জানা গেছে, এরা সবাই ১৯৯৬ সাল থেকে বাংলাদেশে আছেন। এর মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধান সাজলী রিফাত মোহামেদ ওসমান এ দেশে আসেন ছাত্র ভিসায়। তিনি এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ করার নামে প্রকৃতপক্ষে কাজ করতেন এ সংস্থায়। ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে এ সংস্থায় তিনি যোগ দেন ২০০৪ সালে। জানা গেছে, নিষিদ্ধ আল হারামাইনের ৪ জন কর্মকর্তা আলজেরিয়ার নাগরিক আবু ইসহাক, ইসমাইল খারবুস ও আবুল মুনজির এবং ইয়েমেনের সাদেক আল নাসামী ভ্রমণ-ভিসায় পুনরায় এ দেশে এসে আরআইএইচএসে যোগ দেয়। এর জন্য তারা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমতিও ঠিকভাবে নেননি। বিষয়টি গোয়েন্দাদের তদন্তে ধরা পড়ার পর ২০০৫ সালের জুলাই মাসে তারা বাংলাদেশ থেকে চলে যায়।

উল্লেখ্য, ২০০৪ সালের ৩০ জুন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ও সৌদি সরকারের চিঠি পাওয়ার পর আল কায়দার সহযোগী সংস্থা আল হারামাইনের কার্যক্রম সরকার বন্ধ করে দেয় এবং সংস্থাটির এ দেশের ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করা হয়। তখন বাংলাদেশ শাখায় কর্মরত ১৪ বিদেশী কর্মকর্তা এ দেশ থেকে চলে যায়। এর আগে ২০০২ ও ২০০৩ সালে একই অভিযোগে এ সংস্থার বসনিয়া, সোমালিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তানজানিয়া, কেনিয়া, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের শাখাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তারও আগে ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ রাজধানীর উত্তরা থেকে আল হারামাইনের ৭ জনকে আটক ও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। কিন্তু ওই সময় সৌদি দূতাবাসের হস্তক্ষেপে তাদের দ্রুত দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

অবশ্য আরআইএইচএসের দাওয়া বিভাগের পরিচালক আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সামাদ জঙ্গিদের সহযোগিতার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তারা এ দেশে দাতব্য কাজ করছেন। কিন্তু আমেরিকা যেহেতু মুসলমানের শত্রু তাই তারা জঙ্গিদের সহযোগী হিসেবে এ সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে।

জানা গেছে, এ সংস্থার বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের মহাপরিচালক হচ্ছেন আবদুর আজিজ খালাপ মাল উল্লাহ (কুয়েতি নাগরিক)। তিনি কুয়েতে বসে বাংলাদেশের কর্মকান্ড তদারকি করেন। সরকার এ সংস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন তদন্ত শুরু করার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৬ সালের ১৪ আগস্ট তিনি বাংলাদেশে আসেন। তিনি সরকারের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলেও জানা গেছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত লিবিয়ার নাগরিক আবদুর রহমান এবং জর্ডানের আবু খোয়াব ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে আরআইএইচএসে কর্মরত ছিলেন। পরে গোয়েন্দাদের চাপে তারা চলে যায়।

পরে দেশী-বিদেশী চাপের মুখে এবং তাদের তহবিল ছাড় বন্ধ করে দেওয়ার পর আরআইএইচএস ২০০৬ সালের মাঝামাঝি এদেশ থেকে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে চলে যায়। আল কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এনাম অরনেট প্রতিষ্ঠিত বেনোভোলেন্স ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনও এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে তৎপর ছিল। ১৯৯৬ সালের পর থেকে তাদের কোনো কার্যক্রম নেই। ঢাকায় এ সংস্থাটির প্রধান ছিলেন মোহাম্মদ তাহা নামের মার্কিন পাসপোর্টধারী এক মিসরীয়। ২০০১ সালে নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ারে বিমান হামলার পর সর্বপ্রথম এ সংস্থাটিকে বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

এছাড়া আল মারকাজুল ইসলামি, কাতার চ্যারিটেবল সোসাইটি, ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনসহ মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক এনজিও সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে।

কিন্তু এসব হিসাব পরিচালনার সঙ্গে কারা জড়িত ও কীভাবে লেনদেন হয়েছে এবং এসব হিসাব খোলার সময় শনাক্তকারী কারা ছিল এ ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো এখন পর্যন্ত কোনো তদন্তও করেনি।

এদিকে জঙ্গিদের চালিকাশক্তি অর্থের উৎস বন্ধ করা তো দূরের কথা, এখন পর্যন্ত উৎস শনাক্তও করা হয়নি। এ ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতাও চোখে পড়ার মতো। অথচ জঙ্গি আস্তানাগুলো থেকে পাওয়া কাগজপত্র থেকে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমেই তাদের টাকা-পয়সা লেনদেন হচ্ছে। এছাড়া জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর অর্থের উৎস হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক যেসব বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাদের ব্যাপারেও কার্যকর কোনো তদন্তের উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন জঙ্গি আস্তানায় প্রাপ্ত কাগজপত্র এবং গ্রেফতারকৃতদের জবানবন্দি ও প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো ধারণা করছে, দেশব্যাপী জেএমবির ১৬ আঞ্চলিক কমান্ডার, ৬৪ জেলা প্রধান, শতাধিক অপারেশনাল কমান্ডার, আড়াইশ'র মতো এহসার, ২০০ তালিমপ্রাপ্ত সাথী (বোমা বানানোতে দক্ষ) এবং অন্তত ১০ হাজার তালিম ছাড়া সাধারণ সদস্য ও ৫০ থেকে ৬০টি নারী ইউনিট (১০/১২ জনকে নিয়ে একটি ইউনিট) রয়েছে। শায়খ আবদুর রহমান, বাংলাভাইসহ জেএমবির শীর্ষ নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন (টিএফআই) যে প্রতিবেদন তৈরি

www.pathagar.com

করেছে তাতে ধারণা করে বলা হয়, সারাদেশে জেএমবির বিভিন্ন পর্যায়ের ১৫ হাজার সদস্য ও সমর্থক রয়েছে। এসব সদস্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, সংগঠন পরিচালনা, অস্ত্র-বিস্ফোরক সংগ্রহ, মামলার তদবিরসহ নানা তৎপরতায় বিপুল অঙ্কের অর্থের দরকার।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের মতে, শুধু জঙ্গি সদস্যদের গ্রেফতার ও তাদের আস্তানা উদ্‌ঘাটন করে এই উগ্রগোষ্ঠীকে পুরোপুরি দমানো যাবে না। কারণ অর্থের উৎস বন্ধ না হলে নতুন নতুন নামে এ ধরনের জঙ্গিগোষ্ঠী পুনঃসংগঠিত হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। তাই তাদের অর্থের উৎস বন্ধ করা জরুরি।

পুলিশের সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, ২০০৫ সালের নভেম্বরে রংপুরে জঙ্গি আস্তানায় ঢাকা ও বগুড়ার বিভিন্ন ব্যাংকের পাসবইসহ ব্যাংক হিসাব ও এফডিআর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের ঢাকা কর্পোরেট শাখার দুটি চেক, ৫০ হাজার টাকার এফডিআর এবং ইসলামী ব্যাংক ঢাকার একটি শাখার ১ লাখ টাকার মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড পাওয়া গেছে।

এছাড়া সোনালী ব্যাংক বগুড়া কলেজ রোড শাখায় ৮ জনের নামে তিনটি যৌথ ব্যাংক হিসাবে প্রায় ১০ লাখ টাকার মতো লেনদেনের কাগজপত্র পাওয়া গেছে রংপুরের জঙ্গি আস্তানায়।

এর আগে ১৭ আগস্ট বোমা হামলার পর বাংলাদেশ ব্যাংক জঙ্গিদের ব্যাংক হিসাবের খোঁজ নিয়ে জামালপুর ও বগুড়ায় কয়েকটি ব্যাংক হিসাবের সন্ধান পায়। এর মধ্যে 'আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে ফজল ট্রাস্টে'র একটি ব্যাংক হিসাব আছে জামালপুরের ইসলামী ব্যাংক শাখায়। আবদুর রহমান এই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। ব্যাংকের একই শাখায় আবদুর রহমানের ভাই ওবায়দুর রহমানেরও একটি ব্যাংক হিসাব রয়েছে।

সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই, আবদুল আউয়াল (শায়খ রহমানের জামাতা) ও শফিকুল ইসলামের সঙ্গে যৌথভাবে একটি ব্যাংক হিসাব রয়েছে বগুড়ার আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে। এই হিসাবটি খোলা হয়েছে ২০০৩ সালে। এই হিসাবে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জমা হয়ে আবার উঠে গেছে।

সর্বশেষ শায়খ রহমানকে গ্রেফতারের পর সিলেটে তার বাসা থেকেও ঢাকা, সিলেট ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কয়েকটি ব্যাংকের চেক বই পাওয়া যায়। এসব ব্যাংকে তাদের টাকার লেনদেনেরও হিসাব পাওয়া গেছে।

দিনাজপুরঃ বিস্ফোরন স্থলে পাওয়া বোমা তৈরীর সার্কিট, ব্যাটারী, ফিউজ সহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি ও জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ এর উর্দু ও বাংলায় লেখা দুটি লিফলেট।

www.pathagar.com

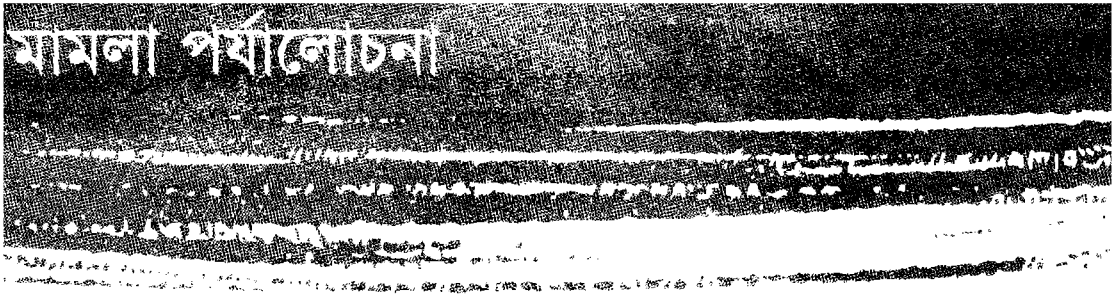

এ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে জঙ্গি হামলা সংক্রান্ত দুটি সবচেয়ে আলোচিত ও আপাতত নিষ্পত্তিকৃত মামলার রায় এবং তার পারিপার্শ্বিক বিষয়-আশয়। ঝালকাঠিতে ২ বিচারক হত্যা মামলায় ৬ জেএমবি নেতার ফাঁসি গত ৩০ মার্চ মধ্যরাতে কার্যকর করা হয়েছে। রচনাটি থেকে পাওয়া যাবে এ মামলার পটভূমি, বিচারিক কার্যক্রম, রায় বাস্তবায়নসহ আনুপূর্বিক ইতিহাস।

যশোরে উদীচী সমাবেশে বোমা হামলাটির মাধ্যমেই বলা যায় এ দেশে জঙ্গিবাদী কার্যক্রমের সশস্ত্র পর্যায়ের শুরু। তাই প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় কীভাবে এ মামলার নিষ্পত্তি হয় তা নিয়ে সবারই বেশ কৌতূহল ছিল। রায়ে আদালত সব আসামিকে খালাস করে দেন। সবাই বিমূঢ় হলেও এর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে আমাদের শাসক শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ দুর্বৃত্তায়নের সাক্ষ্যপ্রমাণ। উদীচী মামলা নিয়ে লেখা প্রবন্ধে পুরো বিষয়টিকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে।

ঝালকাঠিতে দুই বিচারক হত্যা মামলা

এ টি এম মোরশেদ আলম

ঘটনা

জঙ্গিবাদ ও বোমা হামলার ধাবাবাহিকতায় ১৪ নভেম্বর ২০০৫ ঝালকাঠিতে ঘটে বিচারক হত্যার এক ঘৃণ্য ঘটনা। ঘটনায় নিহত হন ঝালকাঠি জেলার সিনিয়র সহকারী জজ সোহেল আহমেদ এবং জগন্নাথ পাঁড়ে। নিত্যদিনের নিয়মানুযায়ী বিচারকদের বহনকারী জেলা জজ আদালতের মাইক্রোবাসটি বিচারকদের কোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়ায় সকাল ৯টার দিকে। আদালতে যাওয়ার উদ্দেশে প্রথমে গাড়িতে ওঠেন সিনিয়র সহকারী জজ জগন্নাথ পাঁড়ে, এরপর ওঠেন সহকারী জজ সোহেল আহমেদ। গাড়িচালক সুলতান আহমেদ ও অন্য একজন কর্মচারী মান্নান হাওলাদার গাড়ি থেকে নেমে সহকারী জজ আব্দুল আউয়ালকে ডাকতে যান। এ সময় গাড়িতে থাকা সহকারী জজ সোহেল আহমেদকে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি একটি দরখাস্তের কপি দিতে চায়। সোহেল আহমেদ কাগজটি নিতে অস্বীকৃতি জানানোর সাথে সাথেই অজ্ঞাত ব্যক্তিটি তার হাতে থাকা একটি ব্যাগ গাড়ির মধ্যে ছুড়ে মারে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড বিস্ফোরণে মাইক্রোবাসটির সিটসহ ছাদ উড়ে যায়। পার্শ্ববর্তী বাউন্ডারি ওয়াল ভেঙে পড়ে, প্রচন্ড শব্দে কোয়ার্টারের জানালার গ্লাস ভেঙে যায়। ঘটনাস্থলেই সোহেল আহমেদ মারা যান, তার দুটি পা'ই উড়ে যায় এবং শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাংসের টুকরাগুলোকে রাস্তার পাশে গাছের ডালে ঝুলতে দেখা যায়। গুরুতর আহত বিচারক জগন্নাথ পাঁড়েকে বরিশালের শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।[১] হামলাকারীও গুরুতর আহত হয়। পরবর্তীকালে জানা যায়, হামলাকারীর নাম ইফতেখার হাসান মামুন। সে জেএমবির আত্মঘাতী স্কোয়াডের একজন সদস্য।

১ প্রথম আলো, ইত্তেফাক, ১৫ নভেম্বর ২০০৫

www.pathagar.com

মামলা দায়ের

এ ঘটনায় গাড়িচালক সুলতান আহমেদ বাদি হয়ে ঝালকাঠি থানায় দুটি মামলা দায়ের করেন। প্রথম মামলাটি বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে এবং দ্বিতীয় মামলাটি হত্যা মামলা হিসেবে দায়ের করা হয়। পরবর্তীকালে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে আরও একটি মামলা দায়ের করা হয়।

হামলাকারী মামুনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়ার পথে সে স্বীকার করে, তার কাছে আরও একটি বোমা আছে। এ সময় তার প্যান্টের ভেতর থেকে বোমাটি বের করে ছুড়ে ফেলা হয়। পুলিশ প্রথমে তাকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারামতে গ্রেফতার করলেও পরবর্তীকালে গাড়িচালক সুলতান আহমেদ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় আসামি দেখায়। ঘটনার প্রতিবাদে বিচারক, আইনজীবীসহ সারাদেশের মানুষ উত্তাল হয়ে উঠলে পুলিশ দ্রুত অন্য আসামিদের গ্রেফতার ও তদন্তকাজ সম্পন্ন করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। ডিবি, সিআইডি ও র‍্যাবও যুক্ত হয় পুলিশের সাথে। সরকারের দু'জন শীর্ষ মন্ত্রী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হবে বলে ঘোষণা দিলেও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পুলিশ বা র‍্যাব এরকম কোনো মামলা দায়ের করেনি। যার ফলে বিস্ফোরক দ্রব্য রাখার অপরাধে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে এবং নরহত্যা করার অপরাধে হত্যার মামলা শুরু হয়।

মামলা চলাকালীন পরিস্থিতির বয়ান

বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দায়েরকৃত মামলা

ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদন্ত শেষে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩/৪/৫/৬ ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করলে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দায়েরকৃত মামলা ২ জানুয়ারি '০৬ ঝালকাঠি থেকে বরিশালের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয়।[২] এই মামলার প্রধান আসামি জেএমবি প্রধান শায়খ আবদুর রহমান এবং সেকেন্ড-ইন-কমান্ড সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলাভাইকে তখনও গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। এদিকে জেএমবির সামরিক প্রধান আতাউর রহমান সানী এবং শায়খ রহমানের জামাতা আব্দুল আউয়ালকে গ্রেফতার করা হলেও বিভিন্ন কারণে তাদের আদালতে হাজির করানো সম্ভব না হওয়ায় বারবার চার্জ শুনানির দিন পেছাতে থাকে। অবশেষে চার্জ শুনানি শেষে ১৪ ফেব্রুয়ারি '০৬ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু করা হয়। এই মামলায় চার্জশিটভুক্ত ৪৪ জন সাক্ষীর মধ্যে প্রথমদিনে আদালত ১৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ শুরুর এই প্রথম দিনেই বিচারক ও পিপির (পাবলিক প্রসিকিউটর) মধ্যে ঘটে এক অপ্রীতিকর ঘটনা। ওইদিন সকাল ৯টার দিকে সাক্ষী সুলতানকে আদালতে হাজির করানো হয় এবং এর কিছুক্ষণ পরই বিচারক এজলাসে উঠে পিপির অনুপস্থিতিতেই সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু করেন। মোবাইলে খবর পেয়ে সকাল ১০টা নাগাদ পিপি অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান নান্টু আদালতে উপস্থিত হন। তিনি সাক্ষীদের হাজিরা দেয়া ও প্রস্তুতির জন্য বিচারকের কাছে আধঘণ্টা সময় প্রার্থনা করেন। বিচারক তার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে নিজেই সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করেন এবং তা অব্যাহত রাখেন। মামলার অন্যতম প্রধান সাক্ষী ও বাদি ড্রাইভার সুলতান আহমেদকে আদালত বিভিন্নভাবে ধমক ও চাকরি যাওয়ার হুমকি দেন। বিচারাধীন মামলাটি হত্যা নয়, বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে হওয়ায় আদালত হাসপাতালের ডাক্তার ও কর্মচারীদের সাক্ষ্য অপ্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেন।[৩] ক্ষুব্ধ হয়ে পিপি বারবার আপত্তি উত্থাপন এবং বিরতির আবেদন জানালে আদালতে এক অভূতপূর্ব বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে পিপি এই মামলার কার্যক্রমের দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে আদালত ত্যাগ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে বিচারক বলেন, "আপনি সাক্ষীদের সময়মতো হাজির না করে বাসায় বসে সলাপরামর্শ করেছেন। এখানে বিচার অপছন্দ হলে অন্য কোনো আদালতে বিচারের জন্য আবেদন করতে পারেন।"[৪] এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে ওইদিন মোট ১৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলেও আদালত পিপিকে মাত্র ৬ জনের হাজিরা দেয়ার সুযোগ দিয়েছেন এবং বাকি ৯ জন সাক্ষীকে রি-কল করেছেন।

এই ঘটনার পর পিপি আদালত কক্ষে বসেই অভিযোগ করেন, "বিচারক আমাকে অবহিত না করেই সকাল ১১টার পরিবর্তে সকাল ৯টায় বিচারকাজ শুরু করেছেন। সাক্ষীদের হাজিরা এবং প্রস্তুতির আগে বিচারক স্বয়ং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করেছেন। এই মামলার নথিপত্র বিচারক তার নিজের জিম্মায় রেখেছেন। এভাবে খেয়ালখুশিমতো আদালত চালিয়ে বিচারক মূলত এই স্পর্শকাতর মামলাটি স্যাবোটাজ করছেন এবং আপিলের জন্য আসামিদের সুবিধা তৈরি করে দিচ্ছেন। পিপির সহযোগিতা ছাড়া এভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করাও নজিরবিহীন।"[৫]

---

২ ইত্তেফাক, ৩ জানুয়ারি ২০০৬

৩, ৪,৫ ভোরের কাগজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

www.pathagar.com

১৬ ফেব্রুয়ারি '০৬ এই মামলায় আরো ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। আগের দিনের মতো এই দিনও আদালত পিপির সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন, সিনিয়র আইনজীবীদের সহায়তায় অবশেষে বিতর্কের অবসান হয়।[৬]

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, বরিশাল-এর বিচারক এম আর মতিন সাক্ষীর সাক্ষ্য, জেরা ও যুক্তিতর্ক শেষে ৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ দুই দফা রায় ঘোষণা করেন। বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩/৪/৫/৬ ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক জেএমবি প্রধান শায়খ আবদুর রহমান, সেকেন্ড-ইন-কমান্ড সিদ্দিকুল ইসলাম (বাংলাভাই), সামরিক প্রধান আতাউর রহমান সানী, শুরা সদস্য এবং ঝালকাঠির বোমা হামলায় নেতৃত্বদানকারী খালিদ সাইফুল্লাহ, শায়খ রহমানের জামাতা আব্দুল আউয়াল, হামলাকারী ইফতেখার হাসান আল মামুন, বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ (কুমিল্লা র‍্যাবের ক্রসফায়ারে নিহত) মোল্লা ওমরকে ৪০ বছর করে কারাদন্ড প্রদান করেন। রাষ্ট্রপক্ষ এই রায়ে সন্তুষ্ট না হওয়ায় উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে[৭], কিন্তু আপিল দায়ের করা হয়েছে পরবর্তীকালে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

হত্যা মামলা

বোমা হামলার পর ঝালকাঠিতে উপস্থিত হয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ৭ দিনের মধ্যে মামলার চার্জশিট দেয়ার ঘোষণা দিলেও হত্যা মামলার চার্জশিট দেয়া হয় ১২ এপ্রিল ২০০৬। চার্জশিট পাওয়ার পর ঝালকাঠির প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী মাসুদুজ্জামান মামলাটি ঝালকাঠির জেলা ও দায়রা জজ আদালতে স্থানান্তর করেন।[৮]

১৮ এপ্রিল '০৬ প্রথমবারের মতো বিচারক হত্যার দায়ে শায়খ রহমান ও বাংলাভাইকে ঝালকাঠি জেলা এবং দায়রা জজ আদালতে হাজির করা হয়। এছাড়াও আতাউর রহমান সানী, ইফতেখার হাসান আল মামুন, আব্দুল আউয়াল ও সুলতান আহমেদকেও এই দিন আদালতে আনা হয়। জেলা ও দায়রা জজ মোঃ আনোয়ারুল হক হত্যা মামলাটি আমলে নেন এবং ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। শায়খ রহমান ও বাংলাভাইকে আদালতে হাজির করার পর আইনজীবীসহ সর্বস্তরের মানুষ তাদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, এমনকি একদল বিক্ষুব্ধ আইনজীবী তাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করেন, জুতাপেটা করে তাদের ক্ষোভ নিবারণ করেন।[৯]

২৩ এপ্রিল '০৬ শায়খ রহমান, বাংলাভাই, সানীসহ মোট ৮ জন আসামির বিরুদ্ধে বিচারক হত্যার দায়ে চার্জ গঠন করা হয়। ঝালকাঠির অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ বিচারক রেজা তারেক আহমেদ তাদের বিরুদ্ধে এই চার্জ গঠন করেন। দন্ডবিধির ১২০/বি, ১০২, ৩২৬, ৪২৭ এবং ৩৪ ধারায় চার্জ গঠন করে তাদের পড়ে শোনানো হলে বাংলাভাই বলেন, "আমার নাম এজাহারে নেই। আমাকে অন্যায়ভাবে এই মামলায় যুক্ত করা হয়েছে।"[১০] তার পক্ষে কোনো আইনজীবী নিয়োগ করা হয়ে থাকলে তাকে প্রত্যাহার করার জন্য বাংলাভাই আদালতের কাছে দাবি জানান। এদিকে শায়খ রহমান স্বীকার করে বলেন, "আমার নির্দেশেই দুই বিচারককে হত্যা করা হয়েছে।"[১১]

হত্যা মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয় ২৬ এপ্রিল '০৬। ইতোমধ্যেই অন্যান্য একাধিক মামলায় শায়খ রহমান ও বাংলাভাই বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন। জেল কোড এবং প্রিজনস্ অ্যাক্ট-এর বিধান অনুসারে, সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের অন্য কোনো মামলার প্রয়োজনে যদি পুনরায় আদালতে হাজির করার প্রয়োজন হয় তাহলে তাদের ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে হাজির করার কথা বলা থাকলেও শায়খ রহমান ও বাংলাভাইকে হাজির করা হয় ডান্ডাবেড়ি না পরিয়েই।[১২] অথচ এই মামলার অন্য আসামিদের ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে হাজির করা হয়।

২৭ এপ্রিল '০৬ সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হলে ড্রাইভার সুলতানসহ কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আসামিদের আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ করা হয় অ্যাডভোকেট সিদ্দিক হোসেনকে। তিনি আসামিদের পক্ষে সাক্ষীদের জেরা করতে গেলে শায়খ রহমান ও বাংলাভাই এই আইনজীবীকে বলেন, "আপনি কি আল্লার আইনে নাকি তাগুতি আইনে জেরা করতে চান? যদি তাগুতি আইনে হয় তাহলে আপনার জেরা করার দরকার নেই।"[১৩] তাদের পক্ষে নিযুক্ত

---

৬ ভোরের কাগজ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৬
৭ সমকাল, ১৮ মার্চ ২০০৬
৮ সংবাদ, ১৩ এপ্রিল ২০০৬
৯ যুগান্তর, ১৯ এপ্রিল ২০০৬
১০, ১১ জনকণ্ঠ, ২৪ এপ্রিল ২০০৬
১২ যুগান্তর, ২৭ এপ্রিল ২০০৬
১৩ প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০০৬

www.pathagar.com

আইনজীবীকে অস্বীকার করে নিজেরাই সাক্ষীদের জেরা করেন। এই আচরণের মাধ্যমে তারা আবারো প্রচলিত বিচার ব্যবস্থাকে অস্বীকার করেন।

সাক্ষীদের জেরা করার সময় শায়খ রহমান এবং বাংলাভাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে সাক্ষীদের উদ্দেশে বলেন, "কেন আপনার মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছেন? আমরা তো নিজেরাই স্বীকার করেছি যে আমাদের নির্দেশেই বিচারক দু'জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমরা ঢাকা থেকে মোবাইলের মাধ্যমে এই নির্দেশ দিয়েছি। আমরা তো কোনোদিন বরিশালে মিটিং করতে আসিনি।"[১৪]

৩০এপ্রিল ২০০৬ নিহত বিচারক জগন্নাথ পাঁড়ের স্ত্রী পল্লবী মুখার্জিসহ মোট ৮ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনের মতো এইদিনেও আসামিরা নিজেরাই সাক্ষীদের জেরা করেন।[১৫]

এরপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় ২ মে' ০৬। এদিন ২জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সাক্ষীদের জেরা করার সময় বাংলাভাই এক চাঞ্চল্যকর অথচ ভয়ানক তথ্য দেন। তাদের জন্য নিযুক্ত আইনজীবীকে অস্বীকার করে বলেন, "জেরা করার অনুমতি দিলে আমরা করব, না দিলে করব না। কারণ সাজানো নাটকের চরিত্রগুলো সম্পর্কে আমরা পরিষ্কারভাবে জাতিকে জানাতে চাই, এর নায়ক কে, খলনায়কের ভূমিকায় কে আছে, যদি আপনারা জানতে ইচ্ছুক হন, তাহলে সরকারের সাজানো খলনায়ককে আমরা এখনো দেখাতে পারি। কারণ হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালারা এখনো আছে। হ্যামিলন মারা গেছে, বাঁশি আছে আমাদের কাছে। কীভাবে সত্যের ইঁদুরকে বের করতে হয় তা আমাদের জানা আছে। আমরা বাঁশি বাজালে সরকারের কয়টা ইঁদুর বের হয় দেখেন। একটা ইঁদুরও গদিতে থাকতে পারবে না।"[১৬]

চতুর্থ দিন ৩ মে' ০৬ মোট ৭ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আগের দিন বাংলাভাই অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রদান করলেও এদিন তিনিসহ অন্য আসামিরা ছিলেন একদম চুপচাপ। সাক্ষীদের জেরা করবেন কিনা জানতে চাইলে বাংলাভাই বলেন, "আমাদের কোনো জেরা নেই। সত্য কথা বলার জন্য সাক্ষীদের ধন্যবাদ।"[১৭] আগের দিন লম্ফঝম্প পরের দিন শান্ত– এই আচরণ অনেকের মনেই সন্দেহের সৃষ্টি করে।

৪ মে ২০০৬ আবার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হলে মোট ৮ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আগের দিনের মতো অবশ্য এদিন বাংলাভাই বা শায়খ রহমান চুপচাপ ছিলেন না, এদিন তারা ছিলেন অত্যন্ত সরব। রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের জন্য নিযুক্ত আইনজীবীকে আবারো অস্বীকার করে শায়খ রহমান বলেন, "উকিল সাহেব আমাদের নির্দোষ বানাতে চান, কিন্তু আমরা তো আমাদের নির্দোষ বলি না। আমরা খালাস চাই না, বিচার চাইতেও আসিনি। যারা মিথ্যা কথা বলবে তাদেরকেই শুধু আমরা জেরা করব।"[১৮]

ষষ্ঠ দিন ৭ মে' ০৬ আদালত আরো ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। হামলাকারী মামুনের বাসা থেকে জব্দকৃত মালামাল এদিন সাক্ষীদের দ্বারা শনাক্ত করানো হয়। এসব মালামাল শনাক্ত করেন জেলার বিআরটিসি বাস কাউন্টারের ইনচার্জ আমিনুল ইসলাম। বাংলাভাই এই সাক্ষীকে জেরা করার সময় বলেন, "জব্দকৃত সুটকেসে সিল করা নেই কেন? এর মধ্যে আমাদের দুটি পিস্তল ছিল, সে দুটি কোথায়? আমরা তো মুজাহিদ, আমাদের কাছে অস্ত্র ও বোমা থাকে। এই পিস্তল দুটি সরকারি কোষাগারে জমা হয়নি, ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।"[১৯]

মে মাসের ৮ তারিখ আরো ৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। এদিন প্রথম সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেন ঢাকা মহানগর আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট শফিক আনোয়ার। হামলাকারী ইফতেখার হাসান আল মামুন ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় ২৪ নভেম্বর ২০০৫ শফিক আনোয়ার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মামুনের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি গ্রহণ করেন। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি মামুনকে পড়ে শোনানো হয়। এ সময় বাংলাভাই ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রশ্ন করেন," মামুন জবানবন্দিতে তার নাম বলেছিল কিনা?" ম্যাজিস্ট্রেট জানান, "হ্যাঁ, বলেছিল।"[২০] চার্জ গঠনের দিন থেকেই

---

১৪ ভোরের কাগজ, ২৮ এপ্রিল, ২০০৬

১৫ প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, ১ মে ২০০৬

১৬ ইত্তেফাক, প্রথম আলো, ইনকিলাব, যুগান্তর, সমকাল, ৩ মে ২০০৬

১৭ প্রথম আলো, ৪ মে ২০০৬

১৮ প্রথম আলো, ৫ মে ২০০৬

১৯ ইনকিলাব, প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, ৮ মে ২০০৬

২০ ভোরের কাগজ, ৯ মে ২০০৬

www.pathagar.com

বাংলাভাই দাবি করে আসছিলেন, জেএমবি কর্মকান্ডের সঙ্গে তিনি জড়িত কিন্তু ঝালকাঠির বিচারক হত্যার পরিকল্পনার সাথে তিনি জড়িত না। ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্যগ্রহণের পর বাংলাভাইয়ের মুখ বন্ধ হয়ে যায়।[২১]

শেষদিনের মতো সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় ৯ মে' ০৬। এদিন শায়খ রহমান বলেন, "আমরা হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে কারো মান ক্ষুণ্ন করতে চাই না। সবাই সত্য কথা বলুন, নয়তো জাতির সামনে সবার মুখোশ উন্মোচন করে দেব।"[২২] মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মুন্সি আতিকুর রহমানের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলে খালেদ সাইফুল্লাহ, আতাউর রহমান সানী, বাংলাভাই, আব্দুল আউয়াল ও শায়খ রহমান একে একে সাক্ষীকে জেরা করেন। এখানে খালেদ সাইফুল্লাহর জেরার কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো:

খালেদ: এটি একটি রাজনৈতিক মামলা। আপনি কী বলেন?

আতিক: না।

খালেদ: সানী ও আউয়াল আমার বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট দিয়েছে?

আতিক: হ্যাঁ।

খালেদ: যখন তারা স্টেটমেন্ট দেয় তারা কি সুস্থ ছিল?

আতিক: হ্যাঁ, সুস্থ ছিল।

খালেদ: আপনি মিথ্যা বলছেন। সানী, আদালতকে দেখাও তোমার প্রতি কী নির্যাতন করা হয়েছিল।

[এ সময় বাংলাভাই সানীর গায়ের জামা খুলে দেন এবং তার পিঠের বেশ কিছু জখম সবাইকে দেখান।]

খালেদ: এভাবে নির্যাতন করেই জবানবন্দি নিয়েছেন?

আতিক: না।

এই উত্তরের পর সানী বলেন, " আমাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায় করে জাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য টিভিতে মিথ্যা বক্তব্য দিতে বাধ্য করা হয়েছে।"[২৩]

এক পর্যায়ে শায়খ রহমান সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন,"নির্যাতন করে এই প্রচারণামূলক ভিডিও তার কাছ থেকে আদায় করে নেয়ার এ নির্দেশ আপনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন?" জবাবে তদন্তকারী কর্মকর্তা বলেন, " আমি জানি না এবং করিওনি।"[২৪]

এভাবেই সাক্ষী গ্রহণ ও জেরা পর্ব শেষে ১৫ মে' ০৬ শুরু হয় ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মতে আসামিদের জবানবন্দি নেয়ার কাজ। এদিন শায়খ রহমান আদালতে বলেন, "আল্লাহ তালাহ আমাদের সৃষ্টি করেছে তার আইন জমিনে বাস্তবায়নের জন্য। যারা আল্লাহর আইন মানে না বা প্রয়োগ করে না, তাদের হত্যার জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছি। এ নির্দেশ দিয়ে আমি কোনো অন্যায় করিনি। এ কাজের জন্য বিচার নয় বরং আমাকে পুরস্কৃত করা উচিত। আমি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছি। আজ হোক কাল হোক এ দেশে ইসলামি আইন বাস্তবায়ন হবে। তখন সবাই আমার কথা মনে করবে।"[২৫] এরপর শায়খ রহমান আদালতের উদ্দেশে বলেন, "আমাকে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে দেয়া হবে– এই শর্তে আমি আত্মসমর্পণ করেছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সুযোগ পাইনি। এখনও আমি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে রাজি আছি।"[২৬]

বাংলাভাইকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হলে তিনি আবারো বলেন, তাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই মামলায় জড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, "আমি জেএমবির শুরা সদস্য হিসেবে গর্বিত। আমার দলের শীর্ষ নেতা শায়খ রহমানের নির্দেশে দুই বিচারককে হত্যা করা হয়েছে। এ মামলার রায়ে কী হবে তা নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। দেখা হবে হাসরের ময়দানে, সেখানে কেইবা হবেন আসামি কেইবা হবেন বিচারক।"[২৭]

আসামি খালেদ সাইফুল্লাহ বলেন, "গাড়িতে পতাকা ওড়াতে বা লাল পাসপোর্টের আশায় দুই বিচারককে হত্যা করিনি, ঈমান রক্ষার জন্য শায়খ আঃ রহমানের নির্দেশে ঝালকাঠির দুই বিচারককে হত্যার নেতৃত্ব দিয়েছি এবং সফলভাবে নেতৃত্ব দিতে পারায় নিজেকে গর্বিত মনে করছি। আশা করি কেয়ামতের দিন এজন্য আমাকে পুরস্কৃত করা হবে।" তিনি আরো বলেন, "ইরাকের আবু গারিব এবং কিউবার গুয়ান্তানামো কারাগারে যেভাবে বন্দিদের নির্যাতন করা হয় সেইভাবেই আঃ

---

২১ জনকণ্ঠ, ৯ মে ২০০৬

২২, ২৩, ২৪ প্রথম আলো, ১০ মে ২০০৬

২৫, ২৬, ২৭ ভোরের কাগজ, ১৬ মে ২০০৬

www.pathagar.com

আউয়াল এবং সানীর ওপর নির্যাতন করে তাদের জবানবন্দি আদায় করা হয়। এমনকি আউয়ালকে ৭ দিন হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়েও রাখা হয়।"[২৮]

শুরা সদস্য আব্দুল আউয়াল বলেন, "আমি মুসলিম এবং মুজাহিদ। মুসলিম আইন ছাড়া অন্য কোনো আইন চলতে পারে না। তাগুতি আইন বাতিলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বিচার দিবসের মালিক আল্লাহ। তিনি বিচারকদের বিচারক, সেই বিচারের দিন আসল বিচার হবে।"[২৯]

আতাউর রহমান সানী বলেন, "সমাজের প্রতিক্ষেত্রে বৈষম্য ও দুর্নীতি, রাষ্ট্রের সর্বত্র দুর্নীতি। দুর্নীতিতে বাংলাদেশ পঞ্চমবারের মতো চাম্পিয়ন হয়েছে। বড় আশা করে বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধারা হয়েছে ১০তলা ভবনের দারোয়ান আর ওই ভবনের মালিক কারা তা আপনারা জানেন। এই বৈষম্য দূর করার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি, ইসলামি আইন না থাকায় সমাজের এই অবস্থা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মিশন শেষ হলো না।"[৩০]

সাক্ষী-জেরা এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের পর ১৮ মে' ০৬ যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য দিন নির্ধারণ করা হয়। পাবলিক প্রসিকিউটর জেলা জামায়াতের সাবেক আমির অ্যাডভোকেট হায়দার হোসাইন রাষ্ট্রপক্ষে এবং আসামিরা নিজেদের পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। পিপি তার বক্তব্যে ঘন ঘন কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "কুরআন এ ধরনের হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে।" এ কথার জবাবে জঙ্গি নেতারা বলেন, "রগ কাটা কি ইসলামে জায়েজ?"[৩১] পিপি হায়দার হোসাইন বলেন, "জেএমবি ইসলামকে একটি সন্ত্রাসী ধর্ম এবং বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করতে বোমাবাজি চালিয়েছে। ঠান্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে তারা দুই বিচারককে হত্যা করেছে। এই আসামিরা দম্ভভরে বোমা হামলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে পুরস্কৃত হওয়ার আশা প্রকাশ করেছেন। যতদিন ইসলামি আইন বাস্তবায়ন না হবে ততদিন বিচার সংশ্লিষ্ট সবাইকে হত্যা করা হবে বলে তারা আদালতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিয়েছেন। আদালতের কাছে আবেদন, এমন রায় দেবেন, যাতে কোনোদিন আর এ ধরনের ঘটনা না ঘটে।"[৩২]

আসামিদের জন্য রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী ও জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট সিদ্দিক হোসেন বলেন, "পিপির বক্তব্য শুনে এতক্ষণ মনে হয়েছিল এটা একটা শরিয়া আদালত। পিপি সাহেবের বারো আনা কথা এই মামলা সংশ্লিষ্ট নয়। মনে হচ্ছিল ইসলামি মাহফিল চলছে, তাই চুপচাপ বসে শুনেছি, না শুনলে যদি পাপ হয়!" তিনি বলেন,"এই মামলায় সুলতান ছাড়া অন্য সবাই দোষ স্বীকার করেছেন, তাই অন্যদের পক্ষে কিছু করার নেই। তারা আমাকে মানেনও না, আমাকে বলেন রঙ্গিলা উকিল।"[৩৩] তিনি সুলতানকে নির্দোষ দাবি করেন এবং তার মুক্তি দাবি করেন।

শীর্ষ জঙ্গিরা নিজেরাই যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য আদালতে আবেদন করলে বিচারক যেকোনো একজনকে বক্তব্য রাখতে বলেন। কিন্তু তারা সবাই বক্তব্য রাখতে চান। পরে বাংলাভাই ও শায়খ রহমান দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন।

বাংলাভাই বলেন,"আমরা যারা জামা'আতুল মুজাহিদিনের পরিচয় দিয়েছি, তাদের বিচারের রায়ে যেন কোনো বৈষম্য না হয়। বৈষম্য করে আমাদের মনোকষ্ট দেয়ার চেষ্টা করবেন না। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে- ঝিনাইদহে ১৭ আগস্টের বোমা বিস্ফোরণের মামলায় যে ২১ জনের বিরুদ্ধে রায় দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে আমরা কাউকে জেএমবির সদস্য হিসেবে চিনি না। ওটা হচ্ছে প্রহসনের রায়।"[৩৪] তিনি আরো বলেন, "আপনারা আমাকে বাংলাভাই বলেন, আমাকে আরবি ভাইও বলা যায়, কারণ আমি ফাজিল পর্যন্ত পড়েছি। আমাকে সাংবাদিক বালু হত্যার সঙ্গে জড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আমি বলতে চাই, জেএমবি এসব রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষের জন্য সৃষ্টি হয়নি। এসবের জন্য বেহায়া পুলিশ দায়ী। কে এই অরাজকতা সৃষ্টির সুযোগ দিয়েছে? আইন-শৃঙ্খলার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমি অনুরোধ করব, আমাদের সঙ্গে বসেন।"[৩৫]

শায়খ রহমান এরপর তার বক্তব্য শুরু করে বলেন,"বিজ্ঞ বিচারক এবং সরকারকে বলতে চাই, আমাদের রায় দিতে যেন তাড়াহুড়া করা না হয়। রায়টা যেন ইসলামি আইন অনুযায়ী দেয়া হয়। আমরা ছাড়া আর কেউ ইসলামি আইন চায় না। পিপি সাহেব তার বক্তব্যে কুরআনের আলোকে তাগুতের ব্যাখ্যা করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু তিনি আমাদের বিচার চেয়েছেন তাগুতি আইনে। তিনি আদালতের বিচারক হত্যার ঘটনাকে করুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। এতে আমারও কান্না আসছে, আমি অমানুষ নই। কিন্তু বিচারক সাহেবরা লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করার মতো অপরাধ করেছেন। একটি হত্যায়ও তাদের ক্ষমা হবে না। তবে সোহেল আহমেদকে (নিহত বিচারক) হয়তো আল্লাহ ক্ষমা করবেন,

---

২৮, ২৯, ৩০ ভোরের কাগজ, ১৬ মে ২০০৬

৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ২০০৬

www.pathagar.com

এ আশা করি। কিন্তু যারা এখনো তওবা করেননি তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাবেন না। তাই বিচার সংশ্লিষ্ট সবাই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।"[৩৬]

ঝালকাঠির অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রেজা তারিক আহমেদ চার্জশিটভুক্ত মোট ৫৩ জন সাক্ষীর মধ্যে ৪৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য, জেরা ও যুক্তিতর্ক শেষে ২৯ মে ২০০৬ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে সুলতান হোসেনকে বেকসুর খালাস দেয়া হয় এবং দন্ডবিধির ১২০(বি) এবং ৩০২/৩৪ ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শায়খ আবদুর রহমান, সিদ্দিকুল ইসলাম (বাংলাভাই), আতাউর রহমান সানী, আব্দুল আউয়াল, খালিদ সাইফুল্লাহ, ইফতেখার হাসান আল মামুন, বরিশাল জেএমবির আঞ্চলিক কমান্ডার আসাদুল হক ওরফে আরিফকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়।[৩৭]

যে আইনে বিচার হলো তার প্রাসঙ্গিকতা

এখন দেখা যাক যেসব ধারায় এসব বোমাবাজের শাস্তি দেয়া হলো তা কতখানি যুক্তিসঙ্গত। এ পর্যায়ে আমরা যদি বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩/৪/৫/৬ ধারা এবং দন্ডবিধির ১২০(বি) ও ৩০২ ধারার দিকে তাকাই, তাহলেই আমাদের ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রথমেই বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের দিকে নজর দেয়া যাক। এখানে আমাদের দেখতে হবে বিস্ফোরক দ্রব্য আইন কেন প্রণয়ন করা হয়েছিল। বিস্ফোরকের উৎপাদন, দখল, ব্যবহার, বিক্রয়, পরিবহন এবং আমদানি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৮৮৪ সালে সর্বপ্রথম প্রণীত হয় বিস্ফোরক আইন। এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল বিস্ফোরক দ্রব্যকে যথেচ্ছা ও স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। পরবর্তীকালে ১৯০৮ সালের পূর্বে প্রণীত বিস্ফোরক আইনকে আরও শক্তিশালী করে প্রণীত হয় বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইন।

বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩ ধারার ভাষ্য হলো, কোনো ব্যক্তি যদি বেআইনিভাবে অথবা বিদ্বেষপূর্ণভাবে কোনো বিস্ফোরক বস্তু দ্বারা বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে জীবন বিপন্ন অথবা কোনো ব্যক্তি বা সম্পত্তির গুরুতর ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ডসহ জরিমানা অথবা দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হবে। ৪ ধারায় বলা আছে, কোনো ব্যক্তি যদি বেআইনি অথবা বিদ্বেষমূলকভাবে কোনো কাজ করে অথবা কোনো ষড়যন্ত্র করে বিস্ফোরক পদার্থের বিস্ফোরণ ঘটায় অথবা বিস্ফোরক পদার্থ রাখে কিংবা বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করে যার দ্বারা কারও জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতিসাধিত হয় অথবা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি ২০ বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হবে। ৫ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে কোনো বিস্ফোরণ ঘটায় অথবা বিস্ফোরক উৎপাদন করে অথবা স্বজ্ঞানে কোনো বিস্ফোরক পদার্থ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে, যার দ্বারা যুক্তিসঙ্গতভাবে এরূপ সন্দেহের উদ্ভব ঘটে যে, কোনো অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে সে উক্তরূপ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে অথবা কোনো আইনসঙ্গত উদ্দেশ্যে তা প্রস্তুত করা হয়নি অথবা তা নিয়ন্ত্রণে রাখেনি, তাহলে উক্ত ব্যক্তি ১৪ বছর মেয়াদ পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হবে। ধারা-৬-এ বলা আছে, কোনো ব্যক্তি যদি স্থান, অর্থ, পরামর্শ অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য সরবরাহ করে এই আইনে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করে, তাহলে সে একই অপরাধে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে।

এখন আমরা যদি উপরোক্ত ধারাগুলোকে বিশ্লেষণ করি তাহলে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি শব্দ পাওয়া যাবে। প্রথমত, 'বেআইনি' এবং দ্বিতীয়তঃ 'বিদ্বেষমূলকভাবে'। এই আইনের অধীনে শাস্তি প্রদান করতে হলে এই উপাদান দুটির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। আলোচ্য ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই যে হামলাকারী বেআইনিভাবে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিচারকদের হত্যা করেছে। কিন্তু 'বিদ্বেষমূলকভাবে' শব্দটার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান। জগন্নাথ পাঁড়ে অথবা সোহেল আহমেদের সাথে হামলাকারীদের কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। তারা এই দু'জন বিচারককেই হত্যা করার উদ্দেশ্যে হামলা চালায়নি। তাদের জায়গায় অন্য কোনো বিচারক থাকলে তিনিই এই হত্যাকান্ডের শিকার হতেন। হামলাকারী নিজেও বলেছেন যে, তারা প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা মানেন না, তারা চান আল্লাহর আইনে বিচার হোক। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে নিহত বিচারকদের সাথে হামলাকারীদের ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা বা বিদ্বেষ ছিল না। তাদের বিদ্বেষ ছিল বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এর অর্থ হলো তাদের বিদ্বেষ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তারা বিচারকদের

৩৬প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ২০০৬

৩৭প্রথম আলো, ৩০ মে ২০০৬

www.pathagar.com

ওপর হামলা করার মতো ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করেছে। সুতরাং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ ধরনের বিদ্বেষ পোষণ করার জন্য অবশ্যই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কোনো মামলা হওয়া উচিত ছিল।

এখন আমরা দন্ডবিধির ১২০(বি) এবং ৩০২ ধারার দিকে একটু নজর দিই। এসব ধারার বিধান অনুসারেই বোমা হামলাকারীদের মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে। কী আছে এসব ধারায়? ১২০(বি) ধারায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তির কথা বলা আছে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো অপরাধমূলক কাজ করার জন্য সম্মত হলে উক্ত সম্মতিকে বলা হবে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র। ১২০(বি) ধারায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা দুই বা ততোধিক বছর মেয়াদের কারাদন্ডের কথা বলা আছে। এদিকে দন্ডবিধির ৩০২ ধারা সম্পর্কে আমরা সবাই কমবেশি অবগত। ৩০২ ধারায় খুনের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি খুন করবে সে এই ধারা অনুসারে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হবে। এছাড়া যে ব্যক্তি খুনের কাজে সহায়তা করবে দন্ডবিধির ৩৪ ধারা অনুসারে সেও একই অপরাধে অপরাধী হবে।

দন্ডবিধির উপরোক্ত ধারাগুলোকে যদি আমরা বিচারক হত্যা মামলার আলোকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো, কতিপয় ব্যক্তি একটা ষড়যন্ত্র অবশ্যই করেছিল, কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র জগন্নাথ পাঁড়ে বা সোহেল আহমেদকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র নয়, এই দু'জনের জায়গায় অন্য কোনো বিচারক হলেও কোনো অসুবিধা ছিল না। মূলত তাদের ষড়যন্ত্র ছিল বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ৩০২ ধারায় শাস্তি প্রদান করতে হলে ৩টি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হয়; ১. কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, ২. অভিযুক্ত ব্যক্তির কাজের দ্বারাই তার মৃত্যু হয়েছে, ৩. অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যেই উক্ত কাজ করেছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, আলোচ্য মামলায় এই তিনটি উপাদানই বিদ্যমান। হত্যা করার উদ্দেশ্যেই বোমা হামলা চালনা হয়েছিল এবং হামলার ফলে দু'জন বিচারকের মৃত্যুও হয়েছে। সুতরাং আসামিদের এই ধারার অধীনে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা যদি হামলা চালানোর উদ্দেশ্যের দিকে তাকাই, তাহলে ঘুরেফিরে আবার সেই একই কথা চলে আসবে। যদিও হত্যা মামলার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য কোনো বিচার্য বিষয় নয়। যে উদ্দেশ্যেই হোক, হত্যা হয়েছে এটাই আসল কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই উদ্দেশ্যের দিকে একটু নজর দেয়া আমাদের উচিত ছিল। যদি উদ্দেশ্যের দিকে নজর না দেয়া হয় তাহলে অপরাধীরা বড় অপরাধ করে ছোট অপরাধের জন্য শাস্তি পাবে। রাষ্ট্রদ্রোহিতা কিংবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবশ্যই হত্যার চেয়ে বড় অপরাধ।

যে ধারায় মামলা হতে পারত

হামলাকারী মামুনের কাছ থেকে পুলিশ ২৫টি লিফলেট উদ্ধার করে,[৩৮] যাতে লেখা ছিল আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে হবে। মামুন নিজেও স্বীকার করে যে, সে জেএমবির সদস্য। শায়খ রহমান এবং বাংলাভাইয়ের নির্দেশেই সে হামলা চালিয়েছে এবং শায়খ রহমান ও বাংলাভাইও তা স্বীকার করে। সুতরাং এটা পরিষ্কার, মামুনের এই বোমা হামলা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। তারা হামলা চালিয়েছে আমাদের পুরো বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এই বিচার ব্যবস্থাকে তারা মানে না, তারা চায় আল্লাহর আইনে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন না হবে ততদিন পর্যন্ত তারা হামলা চালিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের সম্পূর্ণ বিচার ব্যবস্থাকেই তারা ভেঙে ফেলবে এর প্রমাণও তারা দিয়েছে। ১১ নভেম্বর ২০০৫ দেশের বিভিন্ন আদালতে তারা একসাথে বোমা হামলা চালিয়েছে, এখানেই শেষ না, এরপর তারা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন আদালত, বিচারকের এজলাসেও হামলা চালিয়েছে।

আমরা জানি, রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করার জন্য রয়েছে তিনটি বিভাগ। শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। শাসন বিভাগের কাজ হলো দেশের প্রশাসন যন্ত্রকে ঠিকমতো পরিচালনা করা, আইন বিভাগের কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা এবং বিচার বিভাগের কাজ হলো আইনানুযায়ী বিচার পরিচালনা করা। এই তিনটি বিভাগের সমন্বয়েই হলো রাষ্ট্র। কেউ যদি একটা বিভাগকে অস্বীকার করে তাহলে সে সমগ্র রাষ্ট্রকেই অস্বীকার করবে। সুতরাং জেএমবি বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে যে জিহাদ (তাদের ভাষায়) ঘোষণা করেছে তা প্রকারান্তরে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই জিহাদ। ১৮৬০ সালের দন্ডবিধিতে এ ধরনের জিহাদের শাস্তির কথাও বলা আছে, অথচ সরকার হামলাকারীদের বিরুদ্ধে এসব ধারায় মামলা দায়ের না করে মামলা করেছে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে এবং হত্যার অপরাধে।

বিস্ফোরক দ্রব্য আইন কিংবা দন্ডবিধির ১২০(বি)/৩০২ ধারায় বিচারের আগে দন্ডবিধির ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১২১ থেকে ১৩০ ধারার দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই ধারাগুলোকে অবজ্ঞা করা হয়েছে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে পাশ

---

৩৮ প্রথম আলো, ১৫ নভেম্বর ২০০৫

www.pathagar.com

কাটানো হয়েছে।

ঝালকাঠি মামলায় আদালতে হাজির হওয়ার সময় শায়খ ও বাংলাভাই

দেখা যাক, কী আছে এসব ধারায়? দন্ডবিধির ১২১ ধারায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা বা যুদ্ধে সহায়তা করার দন্ডের কথা বলা আছে। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা অনুরূপ যুদ্ধের উদ্যোগ করে বা অনুরূপ যুদ্ধে সহায়তা করে সেই ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে। যুদ্ধ আক্রোশ করে হতে পারে, বিদ্রোহ করেও হতে পারে। যুদ্ধ বাংলাদেশের ভেতরে থেকেও হতে পারে আবার বাইরে থেকেও হতে পারে। ১২১ক ধারায় বলা হয়েছে যে, ১২১ ধারার অপরাধগুলো সংঘটনের ষড়যন্ত্র করলেও একইরূপ শাস্তি হবে। ১২২ ধারায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের অভিপ্রায়ে প্রস্তুতি গ্রহণের মতলবে লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ সংগ্রহ করে বা প্রকারান্তরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা ১০ বছরের বেশি যে কোনো মেয়াদের কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে। দন্ডবিধির ১২৪-ক ধারার ভাষ্য হলো, যে ব্যক্তি কথা, লেখা বা সঙ্কেত বা অন্য কোনোভাবে আইন বলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞার সৃষ্টি করে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে অথবা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন। এই ধারার অপরাধকেই বলা হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ।

দন্ডবিধির ১২১, ১২২ এবং ১২৪-ক ধারাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে ঝালকাঠির বিচারক হত্যা মামলাসহ জেএমবির বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি মামলায় এসব ধারার উপাদান খুবই স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত একটি মামলায়ও এসব ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কোনো এক সময় বলেছিলেন, রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন, কিন্তু তারা হামলাকারীদের মৃত্যুদন্ড দিতে চান। এ কারণেই তাদের বিরুদ্ধে ১২৪-ক ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হয়নি।

১৭ আগস্ট বোমা হামলার পর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের মামলা দায়ের করা হবে তা নির্ধারণ করার জন্য সরকার বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ে টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন (টিএফআই) গঠন করেছিল। এই টাস্কফোর্স জঙ্গিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করার সুপারিশ করেছিল বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৩৯] স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কথাতেই আবার ফিরে আসি, তিনি বলেছিলেন ১২৪-ক ধারার শাস্তি মৃত্যুদন্ড না, কিন্তু তারা জঙ্গিদের মৃত্যুদন্ড দেখতে চান। এ কারণেই তাদের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় মামলা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, আপনি ১২১ ধারায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অপরাধের মামলা দায়ের করতে পারতেন, সেখানেও শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা আছে।

বিচারিক কার্যক্রমের ত্রুটি

জঙ্গিবাদ দমনে তৎকালীন সরকারের সফলতা দেশের জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য সরকার দ্রুততার সাথে বিচার সম্পন্ন করতে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করে তা ঝালকাঠি থেকে বরিশালের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করে। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালও অতি দ্রুতগতিতে বিচারকাজ সম্পন্ন করে এবং প্রত্যেক আসামিকে ৪০ বছর করে কারাদন্ড

৩৯ প্রথম আলো, ৬ মার্চ ২০০৬

www.pathagar.com

প্রদান করে। এদিকে হত্যা মামলার বিচার হয় ঝালকাঠির অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতে, সেখানে ৭ জন আসামিকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। দুই আদালতে দুটি মামলার বিচার হলেও ঘটনা কিন্তু একই। অর্থাৎ বোমা মেরে বিচারক হত্যার দায়ে দুই আদালতে দুটি মামলার বিচার হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদের স্পষ্ট বিধান হলো, একই অপরাধের জন্য দু'বার বিচার করা যাবে না। এক্ষেত্রে একই অপরাধের জন্য দু'বার দুই আদালতে বিচার করা হয়। হাইকোর্টে যদি উত্থাপিত হতো তাহলে বিষয়টি যথেষ্ট যুক্তিতর্কের অবতারণা করতো এবং এই যুক্তিতর্কের অন্তরালে জঙ্গিদের জন্য কোনো সুবিধা থাকলেও থাকতে পারত।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ অনুসারে আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না। অভিযুক্ত জঙ্গিরা প্রচলিত বিচার ব্যবস্থাকে স্বীকার করে না, এজন্য তারা তাদের পক্ষে কোনো উকিল নিয়োগ করেনি, কোনো উকিলও তাদের পক্ষে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণত সরকার আসামিদের পক্ষে উকিল নিয়োগ করে থাকে। তাদের জন্যও করা হয়েছিল কিন্তু তারা সেই উকিলের নাম দিয়েছেন 'রঙ্গিলা উকিল' অর্থাৎ তারা সেই উকিল সাহেবকে স্বীকার করেন না। যার ফলে আসামিরা নিজেরাই সাক্ষীদের জেরা করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে আইনজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সহায়তা ছাড়াই বিচারকাজ শেষ হয়েছে এবং তাদের মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়েছে। হাইকোর্টে যখন মামলাটি শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল তখন সংবিধানের ৩১ ধারায় প্রদত্ত মৌলিক অধিকারটি একটি বড় প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিতে পারত। বেনিফিট অব ডাউটের সুবাদে এসব অভিযুক্তরা কোনোরূপ সুবিধা পেলেও আশ্চর্য হওয়ার অবকাশ থাকতো না।

সর্বশেষ অবস্থা

রায় ঘোষণা করার পর শায়খ আবদুর রহমান একটা লিখিত বক্তব্যে আবারও প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি তাদের অনাস্থার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের উচ্চ ও নিম্ন আদালতে আল্লাহর আইন উপেক্ষা করে ব্রিটিশ প্রণীত তাগুতি আইনে বিচার করা হয়।" এই কারণে তারা উচ্চ আদালতে আপিল করবেন না। সেই সাথে উচ্চ আদালতে ইসলামি জুরি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে তাদের বিচার করার আহ্বান জানান।[৪০] আনুষ্ঠানিকভাবে তারা আপিল দায়ের না করলেও বিধি অনুযায়ী মৃত্যুদন্ডের আদেশ নিশ্চিত করার জন্য মামলার নথি উচ্চ আদালতে প্রেরণ করা হয়। দীর্ঘ শুনানী শেষে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ৩১ আগস্ট ২০০৬ সাত জঙ্গির মৃত্যুদন্ড নিশ্চিত করে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখেন। এর রায়ের বিরুদ্ধে তারা আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করলে ২৮ নভেম্বর ২০০৬ প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছির হোসেনের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ আপিল খারিজ করেন এবং নিম্ন আদালতের আদেশ বহাল রাখেন। ২১ জানুয়ারি ২০০৭ আপিল বিভাগের আদেশ কারা কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছায়। কারাবিধির ৯৯১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৭ দিনের মধ্যে দন্ডপ্রাপ্তরা রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাইতে পারবেন। ক্ষমা না চাইলে সুপ্রিমকোর্টের আদেশ কারা কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানোর ২১ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে ফাঁসি কার্যকর করতে হবে। ২৮ জানুয়ারি '০৭ আসাদুল হক আরিফ ছাড়া অন্য ছয় জঙ্গি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন। আরিফ বোমা হামলার পর থেকেই পলাতক। এখানে উল্লেখ করে রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রপতির কাছে তারা যে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেছে সেটাও প্রচলিত আইনানুযায়ী করা হয়নি। তারা সাদা কাগজে রাষ্ট্রপতির কাছে এই আবেদন করেন। এ ধরনের আবেদন মার্সি পিটিশন হিসেবে গণ্য হবে কি হবে না এ নিয়ে অনেক বিতর্কও চলে, অবশেষে ঐ আবেদনকেই মার্সি পিটিশন হিসেবে গণ্য করে আবেদন পাওয়ার ১ মাস ৫ দিন পর রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ৫ মার্চ '০৭ ফাঁসির দন্ডাদেশ মওকুফের আবেদন নাকচ করেন এবং মৃত্যুদন্ডাদেশের অনুমোদনপত্রে স্বাক্ষর দান করেন। রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো মার্সি পিটিশন নাকচ হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি ২২ মার্চ '০৭ কারা কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছায়।[৪১]

কারা কর্তৃপক্ষ তাদের সব প্রস্তুতি শেষ করেছে। সারা দেশের বিভিন্ন কারাগারে ১৫টি ফাঁসির মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে, জল্লাদ নিয়োগ করা হয়েছে, ফাঁসির জন্য ব্যবহৃত ম্যানিলা দড়ি কিনে আনা হয়েছে, জল্লাদদের দিয়ে নিয়মিত মহড়াও দেয়া হচ্ছে। দন্ডপ্রাপ্তদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে শেষবারের মতো দেখা করানোর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। অর্থাৎ সময়মতো ফাঁসি কার্যকর করার সব আয়োজন শেষ এখন শুধু নির্ধারণ করা হবে তাদের কোনদিন ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। পত্রিকায় প্রকাশিত

---

৪০ প্রথম আলো, ৩০ মে ২০০৬

৪১ আজকের কাগজ, ২৩ মার্চ ২০০৭

www.pathagar.com

এমন খবরে যখন দেশব্যাপী আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করছে, তখন সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে ফাঁসি কার্যকর করা হয়। হিসাব অনুযায়ী ১১ থেকে ১৮ এপ্রিল '০৭-এর মধ্যে কার্যকর করার কথা থাকলেও ৩০ মার্চ '০৭ মধ্যরাতে ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

উপসংহার

জঙ্গিদের শাস্তি হোক তা আমরা সবাই চাই। কিন্তু শাস্তিটা যখন ফাঁসি অর্থাৎ মৃত্যুদন্ড তখন একটা কথা না বললেই নয়। শাস্তি দেয়ার দর্শন হলো অপরাধীকে সংশোধন অথবা অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, যাতে পরবর্তীকালে আর কেউ একই অপরাধ করতে উৎসাহিত না হয়। শায়খ রহমান বা বাংলাভাইদের সংশোধিত করা হয়ত সম্ভব ছিল না, তাই তাদের শাস্তি দেয়া হয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই। কিন্তু তাদের ফাঁসি কার্যকর হয়ে যাওয়ায় বারবার তারা মিডিয়ার সামনে যে কথা বলতে চেয়েছেন তা আর বলা হলো না। এ দেশে জঙ্গিবাদের উত্থানের পেছনে কী কারণ ছিল, কারা ছিল এর পেছনে, অস্ত্র কোথা থেকে এসেছে, কারা সাহায্য করেছে, অর্থের জোগান দিয়েছে কে বা কারা ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন থেকে গেল অমীমাংসিত, অজানা।

www.pathagar.com

যশোর উদীচী বোমা হামলা ও হত্যা মামলা

মিল্লাত হোসাইন

১৯৯৯ সালের ৪-৬ মার্চ এ ৩ দিন যশোর টাউন হল মাঠে চলছিল উদীচীর দ্বাদশ কেন্দ্রীয় সম্মেলন। ৩ দিনই নির্বিঘ্নে চলার পর ৭ মার্চ মধ্যরাতের (৬ মার্চ দিবাগত রাত) পরও অনুষ্ঠান চলছিল। স্থানীয়, ঢাকা এবং ভারত থেকে আগত শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করছিলেন। মামলার সাক্ষীদের বক্তব্য অনুযায়ী রাত আনুমানিক ১টার পর মঞ্চের বাঁ পাশের পেছনে অকস্মাৎ একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এর কিছুক্ষণ পর ডান পাশে দ্বিতীয় বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ঘটনাস্থলে ৫ জন এবং পরবর্তী সময়ে আরও ৫ জনসহ মোট ১০জন নিহত হন। এরা হলেন–

১. সন্ধ্যারানী ঘোষ, গৃহবধূ;
২. শেখ নাজমুল হুদা (তপন), উদীচী কর্মী;
৩. রামকৃষ্ণ রায় (কুষ্টিয়া), উদীচী কর্মী;
৪. রতন রায়, উদীচী কর্মী;
৫. শাহ আলম, উদীচী কর্মী;
৬. ইলিয়াস মুন্সি, দিনমজুর;
৭. নূর ইসলাম, দিনমজুর;
৮. বাবুল সূত্রধর, স্বর্ণ শ্রমিক;
৯. শাহ আলম মিলন, কলেজ ছাত্র ও
১০. বুলু[১] নামের এক কিশোর এবং আহত হয় ১৫০ জনেরও বেশি মানুষ।[২] আহতদের মধ্যে ১২ জন চিরপঙ্গুত্ববরণ করতে বাধ্য হয়েছেন।[৩] ৭ মার্চ যশোর কোতোয়ালি থানার এস আই মোঃ আবদুল আজিজ এ ঘটনায় একটি এজাহার দায়ের করেন।

যশোর উদীচী বোমাবিস্ফোরণে পঙ্গু হয়ে যাওয়া সুকান্ত দাস

তদন্ত

মামলা তদন্তের ভার পড়ে সেসময় যশোরে এএসপি (সিআইডি) হিসেবে কর্মরত মোঃ দুলাল উদ্দিন আকন্দের ওপর। ৯ মাস তদন্ত শেষে ১৯৯৯-এর ১৪ ডিসেম্বর তিনি বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতা এবং মন্ত্রী তরিকুল ইসলামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে ২টি চার্জশিট দাখিল করেন। এতে ৬৭ জনকে সাক্ষী করা হয়।[৪] অন্য আসামিরা হলেন–

১ প্রথম আলো, ২৯ জুন, ২০০৬
২ ডেইলি স্টার, ২৯ জুন, ২০০৬
৩ নিউএজ, ২৯ জুন, ২০০৬
৪ সংবাদ, ২৯ জুন, ২০০৬

www.pathagar.com

মহিউদ্দিন আলমগীর, সিরাজুল ইসলাম, আবদুল খায়ের, মোঃ নুরুন্নবী, আশরাফুল আলম, মেহেদী হাসান, মোকাদ্দেস হোসেন, আহসান কবির, মিজানুর রহমান, ভেজাল মুরাদ, সাইদুর রহমান, নওশের, শরিফুল, রবিউল, সাইফুল, মোস্তফা, সোহরাব, সুলতান দাউদ সরদার, আসাদুজ্জামান, তবি মোড়ল, অশোক কুমার ও মহসীন।

চার্জশিটে আসামিদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয় তা হচ্ছে–

"যশোর জেলার কোতোয়ালি থানাধীন যশোর টাউন হল ময়দানে উদীচী শিল্পগোষ্ঠীর দ্বাদশ সম্মেলনের প্রাক্কালে বিগত ২৫/২/৯৯ ইং তারিখ হইতে ৬/৩/৯৯ ইং তারিখ দিবাগত রাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আসামিগণ বিএনপিদলীয় সাবেক মন্ত্রী তরিকুল ইসলামের যশোর শহরস্থ বাসায় একত্রিত হয়ে শলাপরামর্শ করিয়া উদীচীর উক্ত সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আসামিগণ ৪/৩/৯৯ ইং তারিখে প্রাক্তন মন্ত্রী তরিকুল ইসলামের বাড়িতে উপস্থিত হয়। ৫/৩/৯৯ ইং তারিখে আসামি সিরাজুল ইসলাম ও আবুল খায়ের বোমা ভর্তি কার্টন আসামি মোকাদ্দেস হোসেন বাবু ওরফে বাবু চেয়ারম্যানের বাড়িতে লইয়া যায়। উক্ত ৫/৩/৯৯ ইং তারিখে সন্ধ্যায় আসামি সিরাজুল ইসলাম যশোরস্থ দোকানে অন্য আসামিদের উপস্থিতিতে উদীচী অনুষ্ঠানের বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে আলোচনা করে। তৎমূলে আসামিগণ ৬/৩/৯৯ দিবাগত রাত্রি অনুমান ১-১:৩০ মিনিটের দিকে অর্থাৎ ৭/৩/৯৯ ইং তারিখে রাত্রি ১-১:৩০ ঘটিকার সময় টাউন হল ময়দানের মঞ্চে উত্তর ও দক্ষিণ পাশে ২টি উচ্চশক্তিক্ষমতা পূর্ণ বোমা বিস্ফোরণ ঘটান।"[৫]

২০০০ সালের ১৯ জুলাই আসামিদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারামতে হত্যার অভিযোগ গঠন করা হয়।

বিচার প্রক্রিয়া

আদালত মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরুর দিন ধার্য করেন ১৬ আগস্ট ২০০০। ইতোমধ্যে আসামিদের আইনজীবীরা চার্জশিট থেকে তাদের মক্কেলদের নাম বাদ দেয়ার জন্য উচ্চ আদালতের দ্বারস্ত হলে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু করা যায়নি এবং ৬ সেপ্টেম্বর পরবর্তী দিন ধার্য হয়। ইত্যবসরে তরিকুল ইসলাম ২টি মামলা থেকেই অব্যাহতি পাওয়ার জন্য হাইকোর্ট বিভাগে ক্রিমিনাল রিভিশন (৭৯১/২০০০) ও ক্রিমিনাল আপিল (১৯০৬/২০০০) দায়ের করেন। ফলে হাইকোর্ট বিভাগ নিম্ন আদালতে মামলার কার্যক্রম স্থগিতের আদেশ দেন। ১৪ নভেম্বর হাইকোর্ট বিভাগ তরিকুল ইসলামের আবেদন নামঞ্জুর করেন। এর বিরুদ্ধে তিনি আপিল বিভাগে দুটি লিভ টু আপিল আবেদন দাখিল করেন। আপিল বিভাগ আবেদন দুটি গ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে ২০০১ সালের ১৮ নভেম্বর একটি আপিল বেঞ্চ উক্ত কোয়াশমেন্ট (মামলায় গুরুতর অনিয়মের জন্য সেটাকে শুরু থেকেই বাতিল করে দেয়) আবেদনদ্বয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিম্ন আদালতে মামলার কার্যক্রম স্থগিতের আদেশ দেয়। অতঃপর ২০০৩-এর ১২ আগস্ট আপিল বিভাগ তরিকুল ইসলামকে মামলা দুটি থেকে অব্যাহতি দেয়ার আদেশ দেন, ২০০৪ -এর ২৬ অক্টোবর মামলার কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহৃত হয় এবং সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য হয় ওই বছরের ২৪ নভেম্বর। এরপর দফায় দফায় তারিখ পেছানোর পর ২০০৫ সালের ২৭ জুলাই সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়, শেষ হয় ২০০৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

সরকারপক্ষ আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের জন্য ৬৭ জন সাক্ষীর মধ্যে ৩১ জনকে আদালতে উপস্থাপন করতে সমর্থ হয়। আসামিরা তাদের পক্ষে কোনো সাক্ষী হাজির করবে না বলে জানায়।

রায় পর্যালোচনা

মামলার রায় ঘোষণার তারিখ ধার্য করা হয়েছিল চলতি বছরের ৩০ মে। কিন্তু ওই দিন বিচারক মামলার অধিকতর শুনানির প্রয়োজন আছে বলে ২৭ জুন পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন। অবশেষে দীর্ঘ ৭ বছর ৩ মাস ২২ দিন পর ২৮ জুন যশোর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ (জেলা জজ) আবুল হোসেন ব্যাপারী মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে তিনি মামলার ২৩ আসামির সবাইকে বেকসুর খালাস দেন। বিচারক তাঁর রায়ে বলেন,

'ফৌজদারি মোকদ্দমার মূল প্রতিপাদ্য বিচার্য বিষয় হইতেছে, আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরকার পক্ষকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে হইবে... অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সরকারপক্ষের ৩১ জন সাক্ষীর মধ্যে কোনো সাক্ষী এজাহার কিংবা অভিযোগপত্রে উল্লেখিত বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। উপরন্তু বিভিন্ন

৫ রায়ের নকল, পৃ. ১৮-১৯

www.pathagar.com

সাক্ষী তাহাদের সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, ঘটনার সময় তাহারা উপস্থিত ছিল না। অনেক সাক্ষী তাহাদের সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, বোমা বিস্ফোরণ হয়, কিন্তু কে বা কাহারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় তাহারা দেখে নাই এবং শোনে নাই। বিএনপিদলীয় মন্ত্রী তরিকুল ইসলামের সহায়তায় এইরূপ একটি হত্যাকান্ড সংঘটিত হইয়াছে তাহা প্রমাণে আসে নাই।[৬]

রায়ে বলা হয়, সাক্ষীদের মধ্যে নুর ইসলাম, আবদুল গফফার, সাইফুল ইসলাম, আবদুল কাদের, কামরুজ্জামান, আবদুর রহিম ও সুকুমার মজুমদার এই ৭ জন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারামতে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দেন। কিন্তু আদালতে দেয়া সাক্ষ্যে তারা বলেন, সাদা পোশাকধারী লোকজন তাদের জোর করে ঢাকায় নিয়ে কাগজে যা লেখা আছে তাতে সই না করলে বোমা ও হত্যা মামলার আসামি করা হবে মর্মে ভয় দেখিয়ে তাতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এর বিপরীতে সরকারপক্ষ সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে হাজির করে উক্ত জবানবন্দিগুলো প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়নি।

ফলে বিচারক হাইকোর্ট বিভাগের এ সংক্রান্ত ৩টি রায় যথাক্রমে শুনু মিয়া গং বনাম সরকার (৩ বিএলডি,প-৪৪১), বিমলচন্দ্র বনাম সরকার (৫১, ডিএলআর,প-৪৬৬) এবং অপর একটি নজির (১৫ বিএলডি, প-৪৫৯) উল্লেখ করে উক্ত জবানবন্দিগুলো সাক্ষ্য হিসেবে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করেন।

তদুপরি, এ মামলার ৫ জন আসামি মহিউদ্দিন, সিরাজুল, রবিউল ইসলাম, নুরুন্নবী ও আহসান কবির ১৯৯৯ সালের যথাক্রমে ১২ এপ্রিল, ৮ সেপ্টেম্বর, ১১ অক্টোবর, ৩ অক্টোবর ও ২৮ অক্টোবর তাদের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারামতে দেয়া জবানবন্দি যথাক্রমে ২৬ ডিসেম্বর ৯৯, ১৪ নভেম্বর ৯৯, ১৯ জুলাই ২০০০, ২৪ নভেম্বর ৯৯ এবং ১৯ জুলাই ২০০০ সালে প্রত্যাহারের জন্য আবেদন জানান।

এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে হাজির করে কিংবা অন্য কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষ্য দ্বারা সে জবানবন্দিগুলো প্রমাণ করা যায়নি। ফলে ৭ সাক্ষীর মতো এ ৫ আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সাক্ষ্য হিসেবে অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয়।

মামলার সবচেয়ে উত্তুঙ্গ মুহূর্ত হাজির হয় তখন, যখন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জেরার মুখে স্বীকার করেন যে, "কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করি নাই। শুধু আসামি ও সাক্ষীদের কাছ থেকে জোর করে ১৬৪ ধারার জবানবন্দি ফর্মে সই নিয়েছি। মন্ত্রী তরিকুল ইসলামকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে হয়রানি করার জন্য এই মোকদ্দমা সাজাই।"[৭]

এ অবস্থায় এসে মামলাটির (মামলা, ঘটনা নয়) বিশ্বাসযোগ্যতা হাস্যকর অবস্থায় উপনীত হয়। বিচারক মন্তব্য করেন যে, আইও সঠিকভাবে মোকদ্দমাটি তদন্ত না করে প্রতিপক্ষকে হয়রানি করার জন্য বানোয়াট ও মিথ্যা অভিযোগপত্র দাখিল করেন। ফলে তা আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এর বুনিয়াদে আসামিদের অভিযুক্ত করা যায় না।

সবকিছু বিচারবিশ্লেষণ করার পর বিচারক মন্তব্য করেন যে, এটা একটি সাক্ষ্যবিহীন মামলা। যেক্ষেত্রে সরকারপক্ষের সাক্ষীরা আসামিদের সাথে মামলার সম্পৃক্ততার কথা না বলে সরকারপক্ষের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়, সেক্ষেত্রে আদালতের কিছুই করার থাকে না। বিচারক, মামলার স্ব-স্বীকৃত মিথ্যা অভিযোগপত্র দাখিল করার জন্য আইওর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও জোর সুপারিশ করেন।

জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা

মামলার রায়ে একটি জাতীয় দৈনিকে[৮] প্রকাশিত প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয়। সেখানে মুফতি আবদুল হান্নান উদীচী অনুষ্ঠানে বোমা হামলা করে হরকাতুল জিহাদ, মর্মে র‍্যাবের কাছে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়। বিচারক বলেন, প্রমাণ ছাড়া পত্রিকার খবর সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। খবর প্রকাশিত হয় ২০০৫ সালের ১০ অক্টোবর। কিন্তু সরকারপক্ষ এ খবরের ওপর ভিত্তি করে তা প্রমাণের জন্যও কোনো উদ্যোগ নেয়নি। পরবর্তীকালে একই দৈনিকে রায় হওয়ার পর *'উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলা করেছিল হরকাতুল জিহাদ?'* নামে আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়, বোমা হামলার ৫ দিনের মাথায় ১১ মার্চ যশোর থেকে মদিনা হুজুর নামে আফগানিস্তানে প্রশিক্ষিত এক জঙ্গিকে আটক করা হয়। তিনি নিজেকে হরকাতুল জিহাদের সংগঠক নামে পরিচয় দেন। তাকে রিমান্ডে নেয়ার পর

---

৬ রায়ের নকল, পৃ. ১৯

৭ রায়, পৃষ্ঠা, ২৯

৮ প্রথম আলো, রায় পৃ. ২০

www.pathagar.com

সিআইডির এক কর্মকর্তা স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেছিলেন, মদিনা হুজুর উদীচীর বোমা হামলায় জড়িত। প্রতিবেদনে সিআইডির এসপি হাসান ফরিদ বলেন, *মদিনাকে গ্রেফতার আমাদের গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট। এটা বোমা হামলার তদন্তে সহায়ক হবে।*[৯] পরবর্তীকালে তাকে ঢাকায় জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে (জেআইসি) এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও এরপর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। মামলার তদন্তে এ বিষয়গুলোকে পুরোপুরিই অগ্রাহ্য করা হয়।

এ ঘটনার সাথে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তমের বক্তব্য থেকেই এর আভাস মিলেছিল। ৯ মার্চ, ১৯৯৯ জাতীয় সংসদে উদীচী বোমা হামলা সম্পর্কে তিনি বলেন, *"সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ও মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তির যোগসাজশে এই হত্যাকান্ড ঘটেছে।"*[১০]

২০০৫-এর অক্টোবরে হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি আবদুল হান্নান গ্রেফতার হওয়ার পর রিমান্ডে তিনি বিভিন্ন বোমা বিস্ফোরণ ও হামলার পেছনে হরকাতুল জিহাদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন বলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে সিলেটে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরীর ওপর বোমা হামলা, কবি শামসুর রাহমানের ওপর হামলা ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, জেএমবি বা জেএমজেবি অনেকগুলো বোমা বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করলেও উদীচী, রমনা বটমূল, পল্টনে সিপিবি সমাবেশে হামলাসহ আরও বেশ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। বাংলাদেশে উদ্দেশ্যমূলক বোমা হামলার উত্থানের পেছনে হরকাতুল জিহাদ নামক উগ্র ধর্মীয় জঙ্গিবাদী সংগঠনের সংশ্লিষ্টতা দিন দিন জোরালো হয়ে উঠছে। এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তদন্ত করা দরকার।

বারী কমিশনের তদন্ত

চারদলীয় জোট সরকার (২০০১) ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পূর্ববর্তী সরকারের আমলে সংঘটিত বোমা হামলাগুলোর তদন্তের জন্য ২০০১ সালের ২৯ ডিসেম্বর হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল বারীকে চেয়ারম্যান করে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। কমিশনের অপরাপর সদস্যরা ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব মোস্তাফিজুর রহমান এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব একেএম কামালউদ্দিন। কমিশন যশোর উদীচী, খুলনার কাদিয়ানি মসজিদ, পল্টনের সিপিবি সমাবেশ, রমনা বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠান, গোপালগঞ্জের বানিয়ারচর ক্যাথলিক গির্জা, খুলনার মোল্লার হাট এবং নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা হামলার তদন্ত করে। এ ঘটনাগুলোতে কমপক্ষে ৬৮ জন নিহত এবং কয়েক শতাধিক আহত হয়েছেন। ২০০২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কমিশন তার প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনে আলোচ্য যশোর উদীচী বোমা হামলার পেছনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, উদীচী কেন্দ্রীয় সভাপতি সৈয়দ হাসান ইমাম এবং যশোর আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট আবদুর রকিব জড়িত ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া খুলনায় কাদিয়ানি মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের জন্য তারাই দায়ী এবং অপর ৫টি ঘটনায়ও আওয়ামী লীগ জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১১]

প্রতিবেদনটিতে যেসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে সেসব অত্যন্ত দুর্বল, অনুমাননির্ভর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে হাস্যকর বলে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয় এবং ফলত মামলার তদন্ত বা বিচার প্রক্রিয়ায় কোনোভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি।

মামলার ভবিষ্যৎ

এ মামলার যে রায় হয়েছে তাতে সম্ভবত আসামিরা ছাড়া আর কেউ খুশি হয়নি। বাংলাদেশে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, একই সাথে লক্ষ্যবস্তুকেন্দ্রিক এ বিশেষ ধাঁচের বোমা হামলার শুরু এ ঘটনা থেকে। ফলে মামলার কী রায় হয় তা নিয়ে পুরো দেশের মানুষেরই এক ধরনের ঔৎসুক্য ছিল। দৃশ্যত এবং স্পষ্টতই সবাইকে বিমূঢ় করে দিয়েছে এ রায়। মামলা চলাকালে বিচারক এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, তদন্ত যথাযথ হয়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং প্রসিকিউশন পাল্টাপাল্টি রাজনৈতিক চাপে বশীভূত হয়ে আসামিদের খালাস দেয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেন বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা। আর এ সাজানো ও পাতানো তদন্তের ওপর ভিত্তি করে যে রায় হলো তা উচ্চ আদালতে খন্ডন করাও অত্যন্ত কঠিন হবে বলে মনে করছেন তারা। বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, *উদীচীর ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে এজাহার করা হয়েছে। তাই*

---

৯ প্রথম আলো, ৩০ জুন ২০০৬

১০ ভোরের কাগজ, ১০ মার্চ ১৯৯৯

১১ জনকণ্ঠ, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০২

www.pathagar.com

ঘটনা প্রমাণের দায়িত্বও ছিল তাদের। প্রসিকিউশন বা সরকারপক্ষে নিয়োজিত আইনজীবীরা মামলা প্রমাণে চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়নি।[১২] অপর এক আইন বিশেষজ্ঞ বলেন, আসামি হাজির করতে না পারা প্রসিকিউশনের ব্যর্থতা। তবে এটাও *ঠিক যে, বোমা হামলার চাক্ষুষ সাক্ষী যদি চার্জশিটে না থাকে তবে তাকে হাজির করার তো প্রশ্নই ওঠে না। আদালতে কাউকে এসে তো বলতে হবে, অমুক ব্যক্তি বোমা হামলা করেছে বা অমুক ব্যক্তির নির্দেশে কারা হামলা করেছে।*[১৩]

প্রশ্ন হলো, এক্ষেত্রে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ কী হতে পারে? এ বিষয়ে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী বলেন- *"আপিল করতে হবে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে, আর তা করবে সরকার। বাদিপক্ষ করতে পারে রিভিশন, এজন্য তাদের সলিসিটর অফিসের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।"*[১৪]

বর্তমান অবস্থায় রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আপিল করতে হবে সরকারপক্ষকে। তারা তো নিম্ন আদালতেই আসামিদের সাজা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিছু করেননি। বরং এখন সরকারপক্ষ আসামিদের সাথে তাল মিলিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার ওপর পুরো দোষ চাপিয়ে নিজেদের বাঁচাতে তৎপরতা দেখাচ্ছে। ফলে সে পক্ষ কোন্ যুক্তি দেখিয়ে আপিল করবে, তা বোধগম্য নয়।

ড. শাহদীন মালিকের ভাষায়– *"মামলার যে রায় হয়েছে তার বিরুদ্ধে আপিল করা একটি দুরূহ কাজ। যদিও কেউ কেউ দায়মুক্ত হতে আপিল করতে পারেন। পুলিশের তদন্তটাই যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ, সেখানে আপিলের জায়গাটা থাকে না। আপিল করবে কে? যিনি আপিল করে বলবেন নিম্ন আদালতের রায় সঠিক হয়নি, তিনি সেই আদালতে গিয়ে কেন বিচার চাইলেন না? আমার মনে হয়, তদন্তকারী কর্মকর্তা জেনেশুনেই তদন্তে ঘাপলা করেছেন। অথবা এমনও হতে পারে, তার ওপর হয়তো রাজনৈতিক কোনো চাপ ছিল। এ সুযোগে তিনি আসামিদের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধাও পেতে পারেন।"*[১৫]

এরপর যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে তা হলো– তদন্ত যথাযথ হয়নি এটা নিশ্চিত হওয়ার পরও বিচারকের রায় ঘোষণা করাটা সঠিক ছিল কিনা? এর জবাবে বিচারপতি রাব্বানী বলেন- *"এক্ষেত্রে বিচারকের হাত-পা বাঁধা থাকে। প্রসিকিউশন পক্ষ থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ ঠিকমতো উপস্থাপন করা না হলে বিচারক কী করবেন? বিচারক নিজেও যদি বুঝতে পারেন যে, ওই লোকটা খুনি বা অপরাধী তবুও তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যতীত সাজা দিতে পারেন না। বড়জোর বিব্রত হতে পারেন।"*[১৬]

এখন ঘটনার প্রকৃত হোতা যারা তাদের বিচারের মুখোমুখি করার জন্য যে পথ খোলা আছে তা হলো– একমাত্র হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে এ মামলার পুনর্তদন্ত হতে পারে। সেটা দু'ভাবে হতে পারে। প্রথমত, রাষ্ট্রপক্ষকে আপিল করতে হবে হাইকোর্ট বিভাগে; দ্বিতীয়ত, হাইকোর্ট বিভাগ স্বঃপ্রণোদিত হয়েও (সুয়োমোটো) পুনর্তদন্তের আদেশ দিতে পারে।

এ বিষয়ে ভারতের উচ্চ আদালতের ২টি রায়ের উল্লেখ করা যায়।

১৯৯৯ সালে জেসিকা লাল নামের এক ভারতীয় মডেল সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন। ২০০৬-এর ২১ ফেব্রুয়ারি দিল্লির একটি দায়রা আদালত মামলায় অভিযুক্ত সব আসামিকে বেকসুর খালাস দেন। কিন্তু প্রকাশ্য প্রায় শ'পাঁচেক লোকের উপস্থিতিতে একটি বারে ঘটা এ ঘটনায় কারো বিচার না হওয়ায় তা ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে। পরে পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ওপর ভিত্তি করে দিল্লি হাইকোর্ট স্বঃপ্রণোদিত হয়ে মামলার আইওকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে দুর্বল তদন্তের জন্য ব্যাখ্যা চান। শুনানি শেষে আদালত নতুন করে এজাহার দায়ের করার আদেশ দেন। বর্তমানে মামলাটির পুনর্তদন্ত চলছে।[১৭]

অন্যদিকে বহুল আলোচিত গুজরাটের 'বেস্ট বেকারি' মামলায় নিম্ন আদালত পুলিশের অভিসন্ধিমূলক তদন্তের ওপর ভিত্তি করে আসামিদের খালাস দেন। পরে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশে মামলাটির পুনর্বিচার হয়, যাতে ৯ জন আসামির যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়।[১৮]

শেষের কথা

মামলার রায়ের পর আসামিপক্ষের আইনজীবী শেখ হাসান ইমাম তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন– *'সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো*

---

১২ বিচারপতি রাব্বানী, যুগান্তর ২৯ জুন ২০০৬
১৩ ড. শাহদীন মালিক, ঐ
১৪, ১৫, ১৬ যুগান্তর, ২৯ জুন ২০০৬
১৭, ১৮ প্রথম আলো, ২ জুলাই ২০০৬

www.pathagar.com

এর নায়ক, মহানায়ক ও কুশীলবদের খুঁজে বের করা হয়নি।"[১৯] তার আসামিপক্ষের উকিল এ ভূমিকা উহ্য রেখে যদি বিবেচনা করি তাহলে এটি সচেতন যেকোনো নাগরিকের মনের কথা। আসলে কাউকেই খুঁজে বের করা হয়নি। শত শত মানুষ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখের সামনে দুটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। মানুষ মারা গেছে, আহত ও পঙ্গু হয়েছে। অথচ কারো শাস্তি হয়নি!

বিস্ফোরণে নিহত নূর ইসলামের স্ত্রী রায়ের পর বলেন- *"ঘটনার সাথে কে জড়িত আর কে নয় সেটা আমার কাছে বিবেচ্য নয়। কারা এই জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের শাস্তি হোক। তাহলে আমার স্বামীর আত্মা শান্তি পাবে।"*[২০]

ঘটনায় পা হারিয়ে পঙ্গু যুবক সুকান্ত দাস বলেন- *"জগাখিচুড়ি মার্কা তদন্ত যখন হয়েছে তখনই এ মামলার রায় কী হবে তা জানা হয়ে গেছে।"*[২১]

পঙ্গু হয়ে যাওয়া আরেকজন নাহিদ– *"প্রচলিত আইনব্যবস্থার এই ঘাতকদের বিচার হবে না মনে করে বলেন, আমি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছি। তিনি তাদের বিচার করবেন।"*[২২]

হামলার দিন বিকেলে (৭ মার্চ ১৯৯৯) পল্টনের জনসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এজন্য বিএনপিকে দায়ী করে বলেছিলেন, *"বোমা মারার পথ ছেড়ে সংসদে আসুন।"*[২৩]

এর জবাবে ১১ মার্চ, ১৯৯৯ তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া আরেক জনসভায় বলেন- *"সরকারই যশোরে বোমা ফাটিয়েছে চলমান আন্দোলন ও সরকারের ব্যর্থতা ঢাকা দিয়ে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর জন্য।"*[২৪]

বোমা হামলা নিয়ে শুরু হয়ে গেল আমাদের দুই প্রধান দলের পারস্পরিক দোষারোপের 'চাপান-উতোর'। পরবর্তীকালে এ ধরনের যতোগুলো বোমা হামলা হয়েছে সব ক্ষেত্রেই এটা ঘটেছে। মামলাটি এ 'চাপান-উতোর' সংস্কৃতির একটি ক্ল্যাসিক উদাহরণ হতে পারে। মামলার তদন্তের সময় ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ। বলা হচ্ছে, তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপির ওপর দোষ চাপাতে তদন্তে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব বিস্তার করেছে। এর সাথে জঙ্গি সংগঠনের সম্পৃক্ততাকে আমলে নিতে দেয়নি। অন্যদিকে বিচারের সময় ক্ষমতায় আসে বিএনপি। বলা হচ্ছে, আসামিরা বিএনপির সাথে সম্পর্কিত থাকায় নিজেদের লোককে বাঁচাতে সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে নিষ্ক্রিয় থেকেছে। বিষয়টা যদি সেরকমই হয়ে থাকে তাহলে দৃশ্যত তারা উভয়েই নিজ নিজ উদ্দেশ্যসাধনে সফল।

কিন্তু সত্য হলো এই, একে অপরকে টিট করার এ গ্রাম্য মোড়েলিপনার রাজনীতির মাঝখানে জীবন হারিয়েছে যে ১০ জন; পঙ্গু-আহত হয়েছে আরো কয়েকশ' তারা কেউই বিচার পাননি।

সর্বশেষ খবর হলো– রায়ের পর ২৯ জুন ২০০৬ বিবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর এ মামলার পুনর্তদন্ত করতে উদ্যোগ নেয়ার ঘোষণা দেন। কিন্তু এর সপক্ষে এখনো কোনো পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে বলে জানা যায়নি।

পুনশ্চ: এই লেখাটি শেষ হয় বেশ কয়েক মাস পূর্বে। পরবর্তীকালে হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি হান্নান এ হত্যাকান্ড ও বোমা বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছেন।

---

১৯ প্রথম আলো ২৯ জুন,০৬
২০, ২১, ২২ ৮৩ সংবাদ, ২৯ জুন, ২০০৬
২৩, ২৪ প্রথম আলো, ৩০ জুন ২০০৬

www.pathagar.com

আইন পর্যালোচনা

বিশ্বব্যাপী জঙ্গি তৎপরতার একটি অসহনীয় অনুষঙ্গ হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও অধিকারকে খর্ব করে এমন সব নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন করার প্রবণতা। বাংলাদেশেও টেলিফোনে আড়িপাতার বৈধতা দিয়ে আইন করা এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।
নূরুল কবীরের 'টেলিফোনে আড়িপাতা : জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ' প্রবন্ধে নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্রচিন্তার প্রেক্ষাপট থেকে উক্ত প্রবণতার অসারতা সম্পর্কে তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো হয়েছে। প্রবন্ধটি গত ২০ এপ্রিল ২০০৬, ইংরেজি দৈনিক নিউএজে প্রকাশিত হয়েছে। নূরুল কবীর এই দৈনিকের সম্পাদক। ইংরেজি থেকে তর্জমা করেছেন মিল্লাত হোসাইন।

টেলিফোনে আড়ি পাতা
জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

নূরুল কবীর

> *"...অবিশ্বাস দেশের স্থায়ী অধিবাসীদের– মনে হয় দেশের সাধারণ লোকের চেয়ে যেন সরকারি গোয়েন্দা বিভাগ অধিক দেশপ্রেমিক এবং দেশরক্ষায় সুদক্ষ। তাই যদি হয় তাহলে দেশের যাবতীয় গোপন তথ্য কেমন করে বিদেশিরা অবগত? কেমন করে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সজ্ঞান সহযোগিতায় দেশে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য বিদেশে পাচার হচ্ছে এবং বিদেশি মাল দেশে আসছে।"*[১]

একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা প্রত্যেক নাগরিকের একটি অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত এবং সরকার কর্তৃক এ ধরনের একটি গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘন, তা বৈধ কিংবা অবৈধ যে পন্থায়ই হোক না কেন, একদিকে যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারমূলক অপব্যবহার, অন্যদিকে তেমনি জনগণ কর্তৃক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে কোনো সরকারের ওপর ন্যস্ত করা বিশ্বাসেরও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

নাগরিকদের মধ্যেকার আন্তঃব্যক্তিক টেলিযোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং তা ধারণ করা (Intercept and record), নতুন আইন প্রণয়নের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অবৈধ এমন একটি কাজকে বৈধতা দেয়ার ব্যবস্থা সংবলিত আইন পাস করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার, ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী অপব্যবহার এবং বিশ্বাস ভঙ্গ উভয় অপরাধেই অপরাধী।

জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে বলীয়ান বর্তমান শাসক জোট, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মূলত টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত একটি পুরনো আইনকেই সংশোধন করেছে। এ আইনের বলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যে কোনো কর্মকর্তা

১ আত্মস্মৃতি, আবু জাফর শামসুদ্দিন, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পূর্ণ সংস্করণ, পৃ. ৪৯২। তদানীন্তন পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাঁর ছেলের প্রেরিত পত্র আটক করাতে মন ও মননে বিক্ষুব্ধ শামসুদ্দিন– তাঁর কালের অন্যতম প্রগতিশীল বাঙালি মনীষী ১৯৭১ সালের ৯ জানুয়ারি তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে একথাগুলো লেখেন।

www.pathagar.com

নাগরিকদের যে কোনো ফোনালাপ এবং ইলেকট্রনিক বা অন্য যে কোনো ধরনের বার্তা বিনিময়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং তা ধারণ করতে পারবেন।[২] একই সাথে গ্রাহকদের মধ্যেকার বাচনিক এবং বৈদ্যুতিক কথপোকথনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং তা ধারণ করার জন্য সরকারি হুকুম তামিল করতে ফোন কোম্পানিগুলো যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের জন্যও আর্থিক ও শারীরিক উভয়বিধ দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে এ আইনে।[৩]

বিষয়টির সাথে জড়িত সরকারি সংস্থাগুলো সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে এ আইনের ব্যাপক প্রয়োগসাধনে দৃশ্যত অতি তৎপর। বাংলাদেশ টেলি কমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) মার্চ মাসের ১৬ তারিখে বেসরকারি মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোকে দু'মাসের মধ্যে তাদের ১ কোটি ১০ লক্ষাধিক গ্রাহকের পুনঃনিবন্ধন এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্যের ইলেকট্রনিক ডাটাবেস তৈরির নির্দেশ দিয়েছে, যাতে করে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পক্ষে ফোন ব্যবহারকারীদের কথাবার্তায় আড়ি পাতা সহজ হয়।[৪] বিটিআরসি ইতোমধ্যে রাষ্ট্রীয় টেলিসেবা প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ অ্যান্ড টেলিফোন বোর্ডকেও (বিটিটিবি) এর প্রায় ১০ লাখের মতো গ্রাহককে পুনঃনিবন্ধনের আওতায় আনতে বলেছে, যাতে সেখানেও আড়ি পাতা যায়।[৫]

যা হোক, জনগণের এই একান্ত পরিমণ্ডলে অবাধ পুলিশি হানা অনুমোদনকারী এ আইন যদি বলবৎ হতে থাকে তাহলে তা জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং তাদের চিন্তা ও বাক-স্বাধীনতার মতো গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের মাধ্যমে তাদের নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই কেবল নস্যাৎ করবে না, অধিকন্তু সরকার নিয়ন্ত্রিত তথ্য-ভাণ্ডারে গণতান্ত্রিক প্রচার মাধ্যমের প্রবেশের পথকে আরও রুদ্ধ করবে। কঠোর আইনি বেড়াজালে প্রচার মাধ্যমগুলোর এমনিতেই যেখানে দমবন্ধ অবস্থা, সেখানে এর ফলে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নাগরিকদের ওয়াকিবহাল রাখার যে গণতান্ত্রিক দায়িত্ব প্রচার মধ্যমগুলোর রয়েছে সেটাও বাধাগ্রস্ত হবে। এটা সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো বিনির্মাণের পথে এ আইন জন্ম দিয়েছে আরেকটি প্রতিবন্ধকতার। কেন এবং কীভাবে?

ব্যক্তিস্বাধীনতার চিরায়ত গণতান্ত্রিক ধারণা

চিরায়ত গণতান্ত্রিক ধারণা বিকাশের পথে প্রধান চিন্তকদের অন্যতম জঁ জাক রুশো বিশ্বাস করতেন, 'মানুষের স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্য ও অহস্তান্তরযোগ্য।' তাঁর কাছে 'স্বাধীনতা খর্ব করা মনুষ্যত্বের অবনমনেরই নামান্তর।' গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শগুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে রুশো যেটাকে 'সমস্যা' হিসেবে গণ্য করেছেন সেটা হলো, এমন একটি সাংগঠনিক কাঠামো খুঁজে বের করা যা প্রতিটি সংঘের প্রতিটি ব্যক্তিকে একটি সাধারণ ক্ষমতা পরিমণ্ডলের আওতায় নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষা করবে এবং যেখানে প্রত্যেকেই নিজেকে অন্য সবার সাথে ঐক্যবদ্ধ করার পরও চালিত হবে কেবল নিজের নিজের ভাবাদর্শে এবং থাকবে মুক্ত, যেমনটি তারা আগে ছিল।[৬]

রুশো এর জবাব খুঁজে পেয়েছেন জনগণের 'সাধারণ ইচ্ছা'র ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সামাজিক চুক্তির ভেতর। এ সামাজিক চুক্তির শর্তগুলো হবে, 'সর্বত্রই অভিন্ন, সর্বত্রই স্বীকৃত ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। ...শর্তগুলো যথাযথভাবে অনুধাবনের পর তা একটি মাত্র শর্তে রূপায়িত হতে পারে, সেটা হলো প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার অধিকারসহ পুরো সমাজের সাথেই একীভূত হয়ে যাওয়া।'

সমাজের কাছে 'নিজের সব অধিকার' বিলিয়ে দেয়ার পরও ব্যক্তি আসলে তার কোনো অধিকারই হারায় না। 'আমাদের প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিসত্তা এবং ক্ষমতা, সাধারণ ইচ্ছার চূড়ান্ত নির্দেশনার অধীন একটি একক সত্তায় অর্পণ করে এবং নিজেদের সংঘ-কাঠামোয় আমরা এর সব সদস্যকেই সম্পূর্ণতার এক একটি অচ্ছেদ্য অংশ বলে গ্রহণ করি', বলছেন রুশো। তিনি আরও বলেন, 'প্রত্যেকে নিজেকে সবার মাঝে বিলিয়ে দিয়ে আসলে যেভাবে কারও কাছেই বাঁধা পড়ে না আর অন্যদের জন্য যে নিজেকে যতটুকু ছাড় দেয় তার ঠিক ততটুকু তাকে ফিরিয়ে দিতে অসমর্থ কোনো সাংগঠনিক কাঠামোর অনস্তিত্বের কারণেই সে যা হারায় তার সমপরিমাণ আবার ফিরে পায়। একই সাথে তার যা কিছু আছে তার সুরক্ষার জন্যও বাড়তি শক্তি লাভ করে।'

ব্যক্তিস্বাধীনতার গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সজাগ এ ফরাসি চিন্তাবিদ বিশদ করে দেখিয়েছেন যে, সামাজিক চুক্তির

---

২ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধনী) আইন, ২০০৬-এর ৯৭(ক) অনুচ্ছেদ

৩ প্রাগুক্ত, ৯৭(গ) অনুচ্ছেদ

৪ নিউএজ ঢাকা, ১৮ মার্চ ২০০৬

৫ প্রাগুক্ত, ৩০ মার্চ ২০০৬

৬ The Social Contract and Discourses, এভরিম্যানস লাইব্রেরি, লন্ডন, ১৯৬৮, পৃ. ১২

www.pathagar.com

দ্বারা মানুষ যা হারায় তাহলো তার প্রকৃতিগত বা সহজাত এবং যেকোনো কিছু পেতে চাওয়া এবং তা পূরণ করতে পারার অবারিত স্বাধীনতা। এখানেই রুশো সহজাত স্বাধীনতা থেকে আলাদা করেছেন নাগরিক স্বাধীনতাকে। তাঁর যুক্তি হলো, যেখানে সহজাত স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যক্তির সামর্থ্য ও শক্তির দ্বারা, সেখানে নাগরিক স্বাধীনতার নিয়ন্তা হলো সাধারণ ইচ্ছা।

রুশো বলেছেন– যখনই 'সামাজিক চুক্তি' করা হয়, 'তখনই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সব পক্ষের ব্যক্তিসত্তার স্থলে এ যৌথ কর্মকাণ্ড থেকে গড়ে ওঠে একটি নৈতিক ও সামাজিক সংগঠন। এর সদস্য হয় ঠিক ততজন যতজন উক্ত যৌথ কার্যক্রমে অংশ নেয়। আর এর ঐক্য, একই সাধারণ পরিচিতি, প্রাণশক্তি ও ইচ্ছার জন্ম হয় এ যৌথ কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়েই।

এভাবেই অপরাপর সব ব্যক্তি– সংঘ থেকে জন্ম নেয় যে গণসত্তা তার পোশাকি নাম হয় নগর (City), যা বর্তমানে প্রজাতন্ত্র (Republic) নামে খ্যাত। সদস্যরা একে পরোক্ষ অর্থে রাষ্ট্র (State), প্রত্যক্ষ অর্থে সার্বভৌম (Sovereign) এবং তারই মতো অপর কোনো গণসত্তার সাথে তুলনামূলক অর্থে শক্তি (Power) নামে অভিহিত করে থাকে। আর যাদের নিয়ে তা গঠিত তাদের সমষ্টিগতভাবে জনগণ (People) এবং পৃথক পৃথক সত্তায়, সার্বভৌমের অংশীদার হিসেবে বলা হয় নাগরিক (Citizen) আর রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় প্রজা (Subjects)।[৭] যথার্থভাবে বলতে গেলে নাগরিক সংঘ নির্মাণের শর্তগুলোই হচ্ছে আইন।[৮]

ব্যক্তির একান্ত পরিসরে হানা দেয়ার অজুহাত

প্রজাতন্ত্র নামে অভিহিত কোনো নাগরিক সংঘের প্রণীত কোনো 'আইন' বা 'শর্ত' গণতন্ত্রসম্মত কিনা তা নিরূপণের জন্য একদিকে তা জনগণের 'সাধারণ ইচ্ছা'[৯] যা 'সামাজিক চুক্তি'র শর্তগুলো কিংবা অন্য অর্থে রাষ্ট্রের সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এবং প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোয় তা 'নাগরিকদের' 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'কে নিশ্চিত করতে পারছে কিনা এ দুটো বিষয়ই খতিয়ে দেখতে হবে। তদুপরি, রাষ্ট্র অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিলগুলোর মধ্যে যেগুলোর পক্ষভুক্ত সেগুলোর সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেটাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। সংবিধানকে জনগণের সাধারণ ইচ্ছার যথার্থ অভিব্যক্তিরূপে প্রকাশের জন্য যে চিরায়ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বাংলাদেশের মূল সংবিধান প্রণয়নের সময় তা করা হয়নি। অধিকন্তু, অতীতে বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক সরকারের দ্বারা নির্দয়ভাবে কাটাছেঁড়ার পর আমাদের সংবিধানের বর্তমান ধাঁচটিকে কোনোক্রমেই আর 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি'রূপে অভিহিত করা যায় না। তা সত্ত্বেও, এখনো পর্যন্ত এটা 'আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধসাপেক্ষে' জনগণের 'চিঠিপত্র ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়।'[১০]

প্রশ্নবিদ্ধ সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য অনুচ্ছেদে (Object clause) জনগণের আন্তঃব্যক্তিক টেলিযোগাযোগে 'প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও তা ধারণ করা'র বিধানের পেছনে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা হলো, 'বিভিন্ন অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির হোতাদের যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুমিত অপরাধীদের মধ্যে যোগাযোগ যখন যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে বিচ্ছিন্ন করে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব নিশ্চিত করা।'[১১] যদিও এতে কোনো ধরনের অপরাধীদের টেলিফোনে আড়ি পেতে খোঁজা হবে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু দুর্ধর্ষ ছিনতাইকারী এবং দেশে ধর্মীয় রাষ্ট্র কায়েমের লক্ষ্যে ভয়াবহ রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত ইসলামি মৌলবাদীদের ধরার জন্য এ আইনের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে বেশ কিছুসংখ্যক সরকারদলীয় নেতার রাখা প্রকাশ্য বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট অনুমান করা যায়।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, বাক-স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় তথ্যের অবাধ প্রবাহ ভোগ করার মতো জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করাকে বৈধতা দিতে সরকার যে যুক্তিগুলো দেখিয়েছে তার কোনোটিকেই ততটা 'যুক্তিসঙ্গত' বলে মনে হচ্ছে না। কেননা অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, ঘাগু অপরাধীরা সব সময়ই রাজনীতিবিদদের বিশেষত

---

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(২) অনুচ্ছেদ যেখানে 'সংবিধানকে' 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে ঘোষণা করা হয়েছে।

১০ বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৩(খ) অনুচ্ছেদ , যেখানে বলা হয়েছে– রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের... চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকবে।

১১ ডাক ও টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬, পৃ. ৬-৭।

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীনদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ছত্রছায়া এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সরাসরি সহযোগিতায় বেড়ে ওঠে। বড় ধরনের ছিনতাই থেকে সবসময় বখরা পাওয়া এসব রাজনীতিবিদ ও পুলিশ কর্তারা সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের সম্পর্কে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল থাকেন। কেবল সদিচ্ছা থাকলেই রাষ্ট্রযন্ত্রের এসব নিয়ন্তা এ অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কেননা, কোনো রাজনৈতিক কাঠামোতেই কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রযন্ত্রের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, ইসলামি জঙ্গিদের নির্মূলে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোটের সদিচ্ছা আছে, এটা বিশ্বাস করার পক্ষে কোনো যুক্তি পাওয়া দুষ্কর। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশসহ শাসক মোর্চার একাধিক শরিক স্পষ্ট করে বলেছে যে, তারা জোটবদ্ধ হয়েছে কেবল এ কারণেই যে, এর মাধ্যমেই তারা তাদের কোরানি আইন প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে পারবে; যে ভাবাদর্শ গোড়া থেকেই জাগতিক বিষয়-আশয় থেকে ঐশ্বরিক ধর্মকে বিযুক্ত করার আদর্শ প্রচারকারী গণতন্ত্রের ঠিক বিপরীত একটি ধারণা।

তাছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক ভাবাদর্শগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে জামায়াত যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সন্ত্রাস-সহিংসতা। বছরের পর বছর ধরে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মকাণ্ডে হামেশাই তার প্রতিফলন দেখা যায়।

জামায়াত যা একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি রাজনৈতিক আন্দোলনের বাংলাদেশি শাখামাত্র, যে কেবল দেশের অভ্যন্তরেই রাজনৈতিক সহিংসতার আশ্রয় নিচ্ছে তা নয়, এটা দেশের বাইরেও জিহাদি আন্দোলনের সমর্থকদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। স্মর্তব্য যে, এ দল 'নিপীড়িত আফগান জনগণ'-এর জন্য ২০০১ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে একটি তহবিল গঠনের প্রকাশ্য উদ্যোগ নিয়েছিল এবং এর মাধ্যমে সংগৃহীত ১২ লক্ষাধিক টাকা থেকে প্রায় দেড় লাখ টাকা উক্ত দুর্গত আফগানদের কাছে স্ব-উদ্যোগে পাঠিয়েছে বলে স্বীকারও করেছে। পরের সপ্তাহে মোল্লা ওমরের নেতৃত্বাধীন মৌলবাদী তালেবান সরকারের পতনের পর দলটি উক্ত তহবিলের জন্য চাঁদা তোলা বন্ধ করে দেয়।[১২]

জামায়াত এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন শাসক মোর্চার অপরাপর শরিকরা ছাড়াও আছে দুই শীর্ষ জঙ্গি, যথাক্রমে শায়খ আবদুর রহমান ও সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) ও জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ নামক দুটি দল, যারা দেশের আইন ব্যবস্থাকে অনৈসলামিক আখ্যা দিয়ে গেল। বছরের শেষাশেষি দেশের বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে ধারাবাহিক বোমা হামলা চালিয়েছে বলে স্বীকার করেছে, যার ফলে মারা গেছে রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন বেশ কিছু মানুষ। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন কোনো মানুষই এসব প্রগতিবিরোধী খুনিদের প্রতিহত করার বিরোধিতা করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এ কাজের জন্য যারা দায়িত্বশীল, তাদের এসব ধর্মান্ধ মৌলবাদীকে সমূলে উচ্ছেদ করার কোনো সদিচ্ছা আছে বলে মনে হচ্ছে না। বিশেষত যখন বিএনপির অভ্যন্তরেরই কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বারংবার প্রকাশ্যে দাবি করছেন যে, দেশে ইসলামি জঙ্গিবাদীদের এ উত্থান এবং প্রসারের পেছনে ইন্ধন যুগিয়েছে খোদ শাসক বিএনপিরই কিছুসংখ্যক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য। এসব ইসলামি জঙ্গিদের পেছনে সমর্থন যোগানোর জন্য কিছুসংখ্যক মন্ত্রী ও সাংসদকে অভিযুক্ত করে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেয়ার অপরাধে ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে রাজশাহী-৩ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচিত সাংসদ আবু হেনাকে গত বছরের ২৪ নভেম্বর দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।[১৩] আইন-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সময় একজন প্রতিমন্ত্রী এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ করেছে, বাংলাভাই পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালীন একাধিকবার তদন্তকারীদের এ তথ্য জানানোর ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর এ অভিযোগ শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৪]

পরিহাস এই যে, সহিংস অপরাধ দমনে নাগরিকদের টেলিযোগাযোগে আড়িপাতার মতো বেআইনি কাজকে বৈধতা দেয়ার ধারণা যিনি কেবিনেটে উপস্থাপন করেন, সেই ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হকের বিরুদ্ধেই মৌলবাদী বাংলাভাই ও তার খুনিচক্রকে মদদ এবং আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়ার নানা অভিযোগ রয়েছে। অতএব, মৌলবাদীদের দ্বারা সংঘটিত সহিংস অপরাধ মোকাবিলায় নাগরিকদের টেলিযোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও তা ধারণ করাকে বৈধ করতে যেসব কারণ দর্শানো হয়েছে সেগুলো বিশ্বাস করার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।[১৫] বরং এর পেছনে রয়েছে একটি অনুচ্চারিত উদ্দেশ্য। সেটা হলো, বিরোধী শিবিরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, দলের ভেতরেই দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ভিন্নমত

---

১২ সাপ্তাহিক হলিডে, ঢাকা, ৮ মার্চ, ২০০২
১৩ নিইএজ, ঢাকা, নভেম্বর ২৫, ২০০৫
১৪ প্রাগুক্ত, মার্চ ২৩ ও ২৫, ২০০৬
১৫ প্রাগুক্ত, ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৫

www.pathagar.com

পোষণকারী, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং কিছু ব্যবসায়ী নেতার ফোনে আড়িপাতা। এদের শীর্ষে রেখে সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি তালিকা ইতোমধ্যেই গণমাধ্যম কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। স্পষ্টতই এ আইন প্রয়োগ করা হবে ব্যক্তির 'চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষা'র সাংবিধানিকভাবে নিশ্চয়তা দেয়া অধিকার লঙ্ঘন করেই।

এসব অস্বাভাবিকতা আমাদের জর্জ অরওয়েলের দুঃস্বপ্নের মতো উপন্যাসগুলোর অন্যতম 'Eighty Four'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে পাঠক এমন এক ক্ষমতা কাঠামোর সাথে পরিচিত হয়, যা কেবল তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে এমন অপরাধের মধ্যে নিকৃষ্টতম, ব্যক্তির চিন্তা ও স্মৃতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

সুতরাং এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এ আইনটি 'রিপাবলিক' নামে অভিহিত 'নাগরিক সংঘের' একটি গণতান্ত্রিক 'শর্ত' হিসেবে গণ্য হতে পারে না। কেননা আন্তঃব্যক্তিক টেলিযোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও তা ধারণ করে দুর্ধর্ষ অপরাধী এবং ইসলামি মৌলবাদীদের ধরার যে কারণ দেখিয়ে সরকার এ আইনটি প্রণয়ন করেছে, তা অসত্য এবং সাধারণ নাগরিকদের ওপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তাও পুরোপুরিই অযৌক্তিক। কেননা তা প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোর অধীনে 'সামাজিক চুক্তি'র প্রধানতম শর্ত সংবিধান কর্তৃক নিশ্চয়তা দেয়া চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে।

উপরন্তু এটা অধিকার সংক্রান্ত প্রধান আন্তর্জাতিক দলিলের অন্যতম ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে, 'কাউকেই তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা... অথবা যোগাযোগের... ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারমূলক হস্তক্ষেপের অধীন করা যাবে না।'[১৬]

বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ

যদি আলোচ্য আইনটি বলবৎ থাকে তাহলে তা নাগরিকদের 'গোপনীয়তা ও যোগাযোগের' গণতান্ত্রিক অধিকারে কেবল স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপই করবে না একই সাথে তা বাংলাদেশের সংবিধান কর্তৃক নিশ্চয়তা দেয়া, বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার মতো মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার, যদিও তা শর্তযুক্ত, তাকেও খর্ব করবে।[১৭]

বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, সাংবিধানিকভাবে নিশ্চয়তা দেয়া আরেকটি অধিকার 'চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা' চর্চার জন্যও অপরিহার্য।[১৮] মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে– 'কোনো রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বীয় মতামত ধারণ করা এবং যে কোনো মাধ্যমের সাহায্যে দেশ-কালের সীমানা ব্যতিরেকে অবাধে যে কোনো ধরনের চিন্তা ও তথ্যের সন্ধান, আহরণ এবং আদান প্রদানের স্বাধীনতা।'[১৯]

নাগরিকদের মধ্যে 'তথ্য ও চিন্তার সন্ধান, আহরণ ও আদান-প্রদানের প্রধানতম মাধ্যমই যেহেতু সেলুলার বা নন-সেলুলার টেলিফোন, সেহেতু তাদের মধ্যেকার বৈদ্যুতিক বা অন্য যে কোনো ধরনের টেলিযোগাযোগে 'প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও তা ধারণ' করার বিধান সর্ব অর্থেই তাদের সাংবিধানিকভাবে নিশ্চয়তা দেয়া চিন্তা ও বিবেক, বাক এবং ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার মতো গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপেরই নামান্তর। মনে করা যেতে পারে যে, ১৯৯৭ সালে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট টেলিফোনে আড়িপাতাকে অসাংবিধানিক বলে রায় প্রদান করেছে এ যুক্তিতে যে, 'যখন একজন ব্যক্তি টেলিফোনে কথা বলে তখন সে মূলত তার বাক-স্বাধীনতারই চর্চা করে। আর ফোনে আড়িপাতা, যদি তা বিধিনিষেধের আওতায় না পড়ে, তা হচ্ছে তার বাক-স্বাধীনতার লঙ্ঘন![২০] অতএব, প্রশ্নবিদ্ধ আইনটি জনগণের চিন্তা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, যা অপরাপর প্রাণীকুল থেকে মানুষকে পৃথক সত্তায় উত্তীর্ণ করার সৃষ্টিশীল উপাদানগুলোর মধ্যে প্রধান, তার

---

১৬ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা, ১৯৪৮-এর ১২ অনুচ্ছেদ

১৭ বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদ, যাতে বলা হয়েছে– রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং (খ) সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হলো

১৮ প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৩৯(১), এতে বলা হয়েছে, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল

১৯ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা, ১৯৪৮-এর ১৯ অনুচ্ছেদ

২০ Peoples Union of Civil Liberties vs India, AIR 1997-SC 8, উদ্ধৃত, Constitutional Law of Bangladesh, মাহমুদুল ইসলাম, ২য় সংস্করণ, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ২৪২

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। অতএব, এটিকে প্রজাতন্ত্র নামে আখ্যায়িত 'নাগরিক সংঘের' একটি অগণতান্ত্রিক শর্তরূপে চিহ্নিত এবং ফলত গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায় অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষের কাছে অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা যায়।

সরকারি তথ্যপ্রবাহের গতিরোধ

রাষ্ট্রীয় তথ্যের অবাধ সঞ্চালন গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা সেটা ছাড়া কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকদের পক্ষে প্রধানত রাজনীতিবিদ ও আমলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্ক তথ্য সমর্থিত মতামত গঠন করা এক কথায় অসম্ভব। এ দুয়ের মাঝে অবস্থান, জনগণকে রাষ্ট্রীয় তথ্য সম্পর্কে অবহিত রাখার প্রধানমত বাহন, গণমাধ্যমে যা প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে জনগণের মধ্যে সম্পাদিত 'সামাজিক চুক্তি'র শর্তগুলো যাতে রাষ্ট্রের নির্বাহীরা যথাযথভাবে অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু আলোচিত আইনটি সরকারি তথ্যের অবাধ প্রবাহের গণতান্ত্রিক ধারণাটির কফিনে যেন ঠুকে দিয়েছে শেষ পেরেকটিও।

কারণটি অতিসরল: যে আইনি কাঠামোয় সরকারি কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয় তাতে মন্ত্রী-আমলা কারও পক্ষেই রাষ্ট্রীয় তথ্য গণমাধ্যমের কাছে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মন্ত্রীরা 'দায়িত্ব পালনকালে' যেসব বিষয় তার বিবেচনার জন্য আনা হবে বা তিনি অবগত হবেন তা 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে', 'কোন ব্যক্তির নির্বাকে', জ্ঞাপন বা তার কাছে প্রকাশ না করতে শপথবদ্ধ।[২১]

অন্যদিকে আমলাদের চাকরির 'আচরণবিধি' অনুযায়ী, কোনো সরকারি দলিলের বিষয়বস্তু 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে', কোনো 'দপ্তরবহির্ভূত ব্যক্তি' বা 'গণমাধ্যমে'র কাছে প্রকাশ করা অথবা 'সরকারি দায়িত্ব পালনকালে তার আয়ত্তে আসা কিংবা ঐ দায়িত্বপালনকালে তার দ্বারা প্রস্তুতকৃত বা সংগৃহীত কোনো তথ্য অন্যের কাছে প্রকাশ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়।[২২]

এ আচরণবিধিটি সরকারি চাকুরেদের বিরুদ্ধে কতোটা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য গণমাধ্যমের কাছে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে, একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ থেকে তার সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

গত বছরের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তার দু'জন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছে এ 'কথিত' অভিযোগের ভিত্তিতে যে, তারা শিল্পোন্নত দেশের বাজারে স্বপ্নোন্নত দেশের (LDC) পণ্যের প্রবেশাধিকার বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) আলোচনা সংক্রান্ত কিছু তথ্য পাচার করেছে।[২৩] এর পূর্বে একটি সংবাদপত্র এ মর্মে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে, হংকং মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনায় বিতর্কের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে প্রথম যে খসড়া প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছিল, তাতে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পণ্য বাদবাকি বিশ্ববাজারে 'অবাধ প্রবেশাধিকার' দিতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু শিল্পোন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত ও পাকিস্তানের মতো কিছু উন্নয়নশীল দেশ সরাসরিভাবে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে।[২৪]

ডব্লিউটিওর বাণিজ্য আলোচনায়, জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার কারণে এ আলোচনার প্রতিটি পর্যায় এবং জনগণের টাকায় জীবনযাপন করা আমলা, অন্য কথায় জনগণের সেবকরা সেখানে কিছু ভূমিকা পালন করছেন সে সম্পর্ক জনগণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষজ্ঞদের বিশেষভাবে হালনাগাদ রাখা ছিল খুবই জরুরি। এ উভয় ক্ষেত্রে জনগণকে তথ্য সরবরাহ করাটা ছিল সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সরকার জনগণের প্রতি তার দায়িত্বের বরখেলাপই শুধু করেনি, জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থের অগ্রগতির বিষয়ে ওয়াকিবহাল রাখতে উদগ্রীব গণমাধ্যমের কাছে 'কথিত' তথ্য পাচারের অপরাধে চাকরিচ্যুত করেছে দু'জন আমলাকে। আচরণবিধির এ ধরনের গণবিরোধী ব্যবহার যে কেবল এ সরকারই করেছে তা নয়, পূর্ববর্তী সরকারগুলোও হেঁটেছে একই পথে।

এ ধরনের একটি অগণতান্ত্রিত আইনি রাজনৈতিক পরিবেশে জনগণকে অবহিত রাখার গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনে যতদূর সম্ভব সচেষ্ট থেকেছে দেশের গণমাধ্যমগুলো। এখন নাগরিকদের এমনকি অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময়ের ক্ষেত্রেও 'প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও তা ধারণ করার মতো বৈধ আইনি হাতিয়ার সরকারের হাতে থাকার কারণে, অনেক সাংবাদিকই বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে অনুসন্ধানী তদন্ত চালাতে ইতস্তত বোধ করবেন। এরপরও যদি কেউ তদন্ত চালাতে প্রয়াসী হন, তখন অপর প্রান্তে থাকা মন্ত্রী অথবা আমলা, সরকারের রক্তচক্ষুর ভয়ে গণমাধ্যমের

---

২১ গোপনতার শপথ (বা ঘোষণা), অনুচ্ছেদ ১৪৮(২) (খ) বাংলাদেশ সংবিধান, ৩য় তফসিল।
২২ ধারা-১৯, সরকারি চাকরিজীবী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯
২৩ নিউএজ, ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর ২০০৫
২৪ প্রাগুক্ত, ২৮ নভেম্বর, ২০০৫

www.pathagar.com

কাছে মুখ খুলতে চাইবেন না এবং এর ফলাফল সুস্পষ্ট। বিতর্কিত এ আইনটি সম্পূর্ণ করেছে বাংলাদেশ নামক গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রকে চৌকিদারি রাষ্ট্রে (Police state) পরিণত করার প্রকল্পে, যেখানে সরাসরি সংস্থাগুলো একদিকে রাষ্ট্রীয় তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করতে অস্বীকৃত হচ্ছে, অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে নাগরিকদের চিন্তার জগৎকে। প্রকৃতপক্ষে আইনটি আবির্ভূত হয়েছে, অরওয়েলের পরিভাষা ধার করে বললে বলতে হয়, একটি অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'চিন্তার চৌকিদার' (Thought police) হিসেবে। এ যেন এক দোধারী তলোয়ার, একদিকে যে রুদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় তথ্যের অবাধ প্রবাহ, অন্যদিকে ভিন্নমত ও চিন্তার প্রসার।

প্রতিরোধই গণতান্ত্রিক কর্তব্য

এটা এখন পুরোপুরি স্পষ্ট যে, সদ্য প্রণীত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধনী) আইন, ২০০৬ নাগরিকদের ব্যক্তিজীবনে নাক গলাতে, তাদের ভাব প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকারকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ক্ষুণ্ন করতে এবং সরকারি তথ্যের অবাধ প্রবাহকে সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করতে প্রতিটি সরকারের কাছে এক বিরাট আইনি সহায় হিসেবে কাজ করবে।

ভাগ্যের কী পরিহাস, এ রকম একটি অপ্রত্যাশিত আইন প্রণীত হয়েছে 'জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত' এবং 'রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব' পুনরুদ্ধারের নামে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি সরকারের কাছে এমন বেদনাদায়ক আচরণ কোনো মুক্ত জাতি প্রত্যাশা করতে পারে না।

একথা সত্য যে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আইনের এ প্রস্তাবিত সংশোধনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় বিরোধী দল আওয়ামী লীগের দু'জন আইন প্রণেতা এ যুক্তি দেখিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন যে, যদি এ সংশোধনীটি গৃহীত হয় তাহলে তা জনগণের গোপনীয়তা বজায় রাখার মৌলিক অধিকারকে গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ন করবে।[২৫] তবুও ভবিষ্যতের কোনো সরকারের কাছে এমনকি আগামী নির্বাচনে ক্ষমতার পটপরিবর্তন যদি হয়, এ ধরনের চরম অগণতান্ত্রিক আইন বাতিল করার স্বতঃস্ফূর্ত কোনো উদ্যোগ, রাজনীতিসচেতন কোনো নাগরিকই আশা করতে পারে না।

লক্ষণীয় যে, এ পর্যন্ত কোনো সরকারই ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা প্রণীত, ১৮৮৫ সালের টেলিগ্রাফ আইন যা 'রাষ্ট্রীয় সঙ্কট' অথবা 'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার' নামে যে কোনো মানুষের কাছে বা তার দ্বারা প্রেরিত যে কোনো বার্তা বা বার্তাগুচ্ছ[২৬] সম্প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা বন্ধ করে দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দিয়েছে এবং ১৮৬৯ সালের ডাকঘর আইন যা প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে লেখা কোনো সংবাদপত্র বা বই আছে এমন সন্দেহ হলে, ডাকঘর কর্তৃক বহন করার সময় যে কোনো ডাকসামগ্রী আটক করতে যে কোনো ডাক কর্মকর্তাকে ক্ষমতাবান করেছে,[২৭] এ আইন দুটি বাতিল করেনি। ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভকারী পাকিস্তান এবং পরে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের কোনো সরকারই সে সময়ের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দমন করার জন্য তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক প্রণীত এ আইনগুলো বাতিলের কথা এমনকি চিন্তায়ও আনেনি। কারণ বোঝা খুব একটা শক্ত নয়। আমাদের শাসকশ্রেণীর অত্যন্ত পছন্দের একটি ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ছাড়াই স্বেচ্ছাচারী শাসন কায়েম করার জন্য এ ধরনের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত আইনি বাতাবরণ অত্যন্ত সহায়ক।

যাই হোক না কেন, যেসব নাগরিক ব্যক্তির মুক্তিকে প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় গণতান্ত্রিক জীবনধারার একটি অলঙ্ঘনীয় উপাদান বলে মনে করেন, তারা কোনো একটি রাজনৈতিক দলের এরূপ স্বেচ্ছাচারী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কোনোভাবেই বরদাশত করতে পারে না। তাছাড়া অ্যালেক্সেই দ্য টকোভিল (Alexis De Tocoueville) তার বিখ্যাত 'The old regime and French Revolution' গ্রন্থে যেভাবে বলেছেন, কেবল স্বাধীনতাই পারে জনগণের মাঝে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে এবং জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বে উত্তীর্ণ করতে– সেভাবে বাংলাদেশেরও দরকার দেশপ্রেম ও মহত্ত্ব। আর এ কারণেই দেশের অর্থনৈতিক অথবা নাগরিক, রাজনীতি অথবা সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই বাধার প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা টেলিযোগাযোগ (সংশোধনী) আইন, ২০০৬-এর মতো সব কালাকানুনের বিরুদ্ধে একটি গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই।

---

২৫ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

২৬ টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫, ধারা ৫(১)(খ)

২৭ ধারা-২৭বি(আই)(এ)(আই) ডাকঘর আইন, ১৮৬৯, সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৭৩ পর্যন্ত

www.pathagar.com

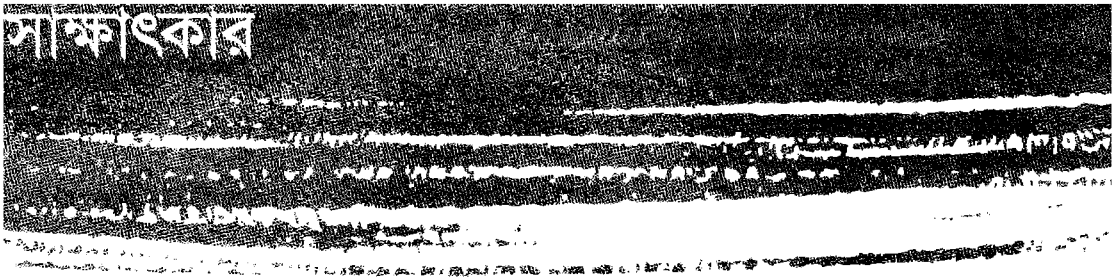

সাক্ষাৎকারে অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস বাবু ও অ্যাডভোকেট নিজামুল হক নাসিম জঙ্গিদের বিচার প্রক্রিয়ার নানা দিক সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন। অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বাংলাদেশের জঙ্গি তৎপরতাকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এর বৈশ্বিক ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে, যার কেন্দ্রে অবস্থান করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এ দেশের সরকারি পর্যায়ের চুক্তিগুলো ও সম্পর্ক।

"বিদ্যমান আইনেই তাদের বিচার করা সম্ভব এবং তা করা উচিত"

রুহুল কুদ্দুস বাবু
অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট

আসক : আপনার কাছে আমরা জানতে চাই– এই যে জঙ্গিদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, তাদের বিচার প্রক্রিয়াটা কতটা আইনসঙ্গতভাবে চলছে? এবং তারা যে অপরাধ করেছে বিদ্যমান আইনেই তার উপযুক্ত বিচার সম্ভব, নাকি নতুন আইনের প্রয়োজন রয়েছে?

রুহুল কুদ্দুস বাবু : এই বিচার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত না থেকেও পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনের খবর থেকে যতটুকু বুঝতে পারি তা হচ্ছে, এই বিচার প্রক্রিয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনসঙ্গতভাবে চলছে না। যেমন, অনেক কিশোর জঙ্গি গ্রেফতার হয়েছে, অথচ তাদের বিচার শিশু আইন অনুযায়ী হচ্ছে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে অনাবশ্যক দীর্ঘমেয়াদি রিমান্ড বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। ক'দিন আগে পত্রিকায় দেখলাম, বাংলাভাই নিজেই অভিযোগ করেছেন তাকে আদালতের সামনে কথা বলতে দেয়া হচ্ছে না। অথচ ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান অনুযায়ী আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও সাক্ষ্য সম্পর্কে আসামির বক্তব্য প্রদান ও তা যথাযথভাবে রেকর্ড করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আপনার পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরে আমি মনে করি, বিদ্যমান আইনেই তাদের বিচার করা সম্ভব এবং তা করা উচিত। সরকার সন্ত্রাসবিরোধী কঠোর আইন প্রণয়নের কথা বলছে কেবল তার সাথে জঙ্গিবাদের সংশ্লিষ্টতাকে আড়াল করার জন্য এবং যদি তারা নতুন আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয় তবে আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, নিশ্চিতভাবেই তা মানবাধিকার লঙ্ঘনে অপব্যবহার করা হবে।

আসক : আপনি কি শুরুতে একটু বলবেন, এই যে শায়খ, বাংলাভাই এবং তাদের গংদের যে ক্রাইম, একজন আইনজীবী হিসেবে দেশের বিদ্যমান আইনকে মাথায় রেখে কীভাবে এটাকে সংজ্ঞায়িত করবেন? এটা কি 'সন্ত্রাসবাদ'?

রু.কু.বা : 'সন্ত্রাসবাদ' একটি রাজনৈতিক পরিভাষা। তাই ফৌজদারি আইনে এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। তবে 'সন্ত্রাসবাদের' মধ্যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নরহত্যার অপরাধ, মানুষকে আহত করার অপরাধ, সরকারি কাজে বাধাদান, বোমাবাজি, অবৈধ অস্ত্র প্রয়োগ ইত্যাদি অপরাধগুলো আছে। এই অপরাধগুলোর প্রত্যেকটাই আমাদের বিদ্যমান ফৌজদারি আইনে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং প্রত্যেকটির জন্যই শাস্তির বিধান রয়েছে।

www.pathagar.com

আসক : তাহলে জেএমবি যে কাজটা করছে অর্থাৎ বোমা হামলা করে তারা যে একটা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে– এটাকে আপনি 'সন্ত্রাসবাদ' বলবেন নাকি 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' বলবেন?

রু.কু.বা : ঐ যে বললাম, 'সন্ত্রাসবাদের' মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার উপাদান আছে।

আসক : হ্যাঁ, আমরা বুঝেছি যে, 'সন্ত্রাসবাদের' মধ্যে খুন আছে, রাষ্ট্রদ্রোহিতা আছে। কিন্তু আমাদের যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার আইন, সেটা কিন্তু 'সন্ত্রাসবাদ'কে অন্তর্ভুক্ত করছে না।

রু.কু.বা : তা করছে না তবে 'সন্ত্রাসবাদের' যে ব্যবহারিক কর্মকাণ্ড তা কোনো না কোনো অপরাধের মধ্যে অবশ্যই পড়বে।

আসক : দুটোকে একইভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চাচ্ছেন?

রু.কু.বা : তা করছি না। তবে এ দুটো পরস্পর সম্পর্কিত। দণ্ডবিধির ১২১ ধারায় আছে, "যে ব্যক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা অনুরূপ যুদ্ধের উদ্যোগ করে, বা অনুরূপ যুদ্ধে সহায়তা করে সেই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।" এটা অবশ্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার কথা বলছে না। এটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সন্ত্রাসবাদ তো অবশ্যই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কারণ রাষ্ট্রের এই আইন কাঠামো আপনি মানছেন না। গায়ের জোরে রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে চাচ্ছেন নিজের পছন্দমতো আইন প্রণয়ন করার জন্য। এটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলো না? আজকে জেএমবি যেটা করছে, সেটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। দণ্ডবিধির ১২৪ ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহের সংজ্ঞা দেয়া আছে, "যে ব্যক্তি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বা সরকারকে, যে কোন প্রণালীতে রাষ্ট্রপতির বা সরকারের যে কোন আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য বা প্রায়োগ করা হতে বিরত করার জন্য প্রলুব্ধ বা বাধ্য করার অভিপ্রায়ে রাষ্ট্রপতি বা সরকারকে আক্রমণ করে বা অবৈধভাবে বাধা দেয়, কিংবা অবৈধভাবে বাধা দেয়ার উদ্যোগ নেয়, অথবা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের ভান করে ভীত করার উদ্যোগ নেয়, সে ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে– যার মেয়াদ সাত (৭) বৎসর পর্যন্ত হতে পারে- দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।" এই আইনটা করা হয়েছিল ১৮৬০ সালে ব্রিটিশদের সময়। কারণ তখন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যাতে কোনো বিদ্রোহ না হয়, সেজন্যই এই আইনটা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সুতরাং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এক কথা নয়। আমাদের সংবিধানে বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার পরে এই ১২৪ ধারা কিন্তু একদিক থেকে অসাংবিধানিক হয়ে গেছে। কিন্তু ১২১ ধারা আছে। জেএমবি যা করছে ১২১ ধারা অনুযায়ী তা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

আসক : তারা একটা বড় অভিযোগ করছে যে, প্রচলিত বিচারব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। যে কারণে তারা তাদের মতো বিচারব্যবস্থা তৈরি করতে চাইছে।

রু.কু.বা : এখন এই ন্যায়বিচার বলতে তারা বোঝাচ্ছে যে, এখানে শরিয়া আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শরিয়া আদালত কি একটা আদালত হিসেবে আদৌ চিহ্নিত হতে পারে? আমি অন্তত এটা বলতে পারবো না যে, শরিয়া আদালত মানুষের অধিকার রক্ষাকারী একটি আদালত। হ্যাঁ, আমাদের কোর্ট ম্যানেজমেন্টে ত্রুটি আছে, আমাদের বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি আছে। সে ইস্যুগুলোকে এড্রেস করে এটাকে সংশোধন করতে হবে এবং এটাকে পারফেকশনে নিয়ে আসতে হবে। সেটি একটি এপ্রোচ। কিন্তু তারা বলছে যে, মানুষের তৈরি এই বিচারব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক মতবাদ ও সংবিধান বাদ দাও এবং আল্লাহর তৈরি আইন প্রতিষ্ঠা করো।

আসক : সুতরাং আপনি বলতে চাচ্ছেন যে, আমাদের এখন নতুন আইন করার দরকার নেই, প্রচলিত যে আইন আছে তা দিয়েই জেএমবির অপরাধের যথাযথ বিচার করা সম্ভব?

রু.কু.বা : না– আমি বলতে চাচ্ছি যে, 'সন্ত্রাসবাদ' এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এবং যদি কোনো সঠিক উদ্দেশ্যে মানুষ সশস্ত্র সংগ্রাম করে, সেটাকে 'সন্ত্রাসবাদ' বলা হবে কিনা। সরকার কিন্তু অনেক আগে থেকেই নানা রকম আইন করার উদ্যোগ নিয়েছিল। যেমন এনজিওদের ওপর আরো বেশি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার উদ্যোগ নিয়েছিল। তখন সন্ত্রাসবাদ ছিল না। এখন সরকার নিজেই এই সন্ত্রাসবাদকে লালন-পালন করে, এটাকে একটা সমস্যা হিসেবে সৃষ্টি করে আইনগুলো প্রণয়ন করার চিন্তা করছে। সেটার অর্থটা কী? তার অর্থ যে, 'সন্ত্রাসবাদ'কে তারা একটা অজুহাত হিসেবে নিয়েছে। তাদের লক্ষ্যটাই হচ্ছে যে, মানুষের অধিকারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা এবং এখানে মানবাধিকারের পক্ষে যারা কাজ করছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা। সেই লক্ষ্যেই সরকার এই আইনগুলো করতে চাচ্ছে বা করছে বলে আমি মনে করি। যেমন ধরুন, টেলিটেপিং আইন বাংলাদেশে মানুষের যোগাযোগে গোপনীয়তার অধিকারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক অধিকারকে হরণ করছে। এ ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিই, আপনি জামার নিচে বা আপনার কোমরের নিচে পিস্তল নিয়ে চলতে পারেন এবং এই পিস্তল জননিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং আপনি জামাটা এবং

www.pathagar.com

প্যান্টটা খুলে হাঁটবেন। এ রকম একটা আইন প্রণয়ন করা যেরকম অযৌক্তিক এবং হাস্যকর, সন্ত্রাসের অজুহাতে এই টেলিটেপিং আইন প্রণয়ন করাটাও একই রকম হাস্যকর বলে আমি মনে করি।

আসক : আচ্ছা আমরা একটু বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলি। জঙ্গিদের বিচার প্রক্রিয়াটা যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখবো যে, তারা এখন পর্যন্ত বেশ কিছু মামলায় ৪০ বছর, ৩৭ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। বিস্ফোরক আইনে তাদের এ দণ্ড হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, তারা যথেষ্ট ডিফেন্সের সুযোগ পাচ্ছে না। তাদের পক্ষে ল'ইয়ার নেই এবং রাষ্ট্রও তাদের পক্ষে কোনো ল'ইয়ার দিচ্ছে না। বিষয়টা যখন উচ্চ আদালতে যাবে, তখন এটা কি তাদের জন্য কোনোভাবে পজিটিভ হয়ে যেতে পারে না? কিংবা তাদের যে দীর্ঘদিনের রিমান্ডে নেয়া হচ্ছে। তার ফলই-বা আলটিমেটলি কী হবে, মানে উচ্চ আদালতে গিয়ে বিষয়টা কী রকম দাঁড়াবে?

রু.কু.বা : যে অপরাধে তাদের বিচার হচ্ছে সেই অপরাধের শাস্তি যদি ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হয়, তাহলে রাষ্ট্রের আবশ্যিক দায়িত্ব তাকে কম্পিটেন্ট স্টেট ডিফেন্স দেয়া এবং স্টেট ডিফেন্স তাদের দিতেই হবে। স্টেট ডিফেন্স ছাড়া তাদের বিচার হচ্ছে এ রকম কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য আমার কাছে নেই। দ্বিতীয়ত, তারা নিজেরাও তাদের ল'ইয়ার এনগেজ করেনি। তারা যথেষ্ট অর্থবান, নিজেদের পক্ষে ল'ইয়ার এনগেজ করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে। কিন্তু পত্রপত্রিকা থেকে যেটা দেখছি যে, তারা বলেছে– এই আদালত কাঠামোর কাছে তারা সারেন্ডার করতে চায় না। কারণ এই বিচার ব্যবস্থাটাকেই তারা অনৈতিক, তাদের ভাষায় 'তাগুতি' মনে করে। অর্থাৎ মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে এটা দাঁড়িয়ে আছে। এ কারণে তারা ল'ইয়ার এনগেজ করছে না। কিন্তু তারপরও রাষ্ট্রের দায়িত্ব আছে তাদের স্টেট ডিফেন্স দেয়ার। যদি কোথাও স্টেট ডিফেন্স না দেয়া হয় তবে অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে, বিচার প্রক্রিয়ায় ত্রুটি রেখে দেয়ার জন্য এটি করা হচ্ছে। রিমান্ডের কারণে কতটুকু সুবিধা পাবে, সেটা এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না। কিন্তু এ ধরনের রিমান্ডও বেআইনি। আইনে যেখানে ১৫ দিনের বেশি রিমান্ড মঞ্জুর করে না, সেখানে জঙ্গিদের রিমান্ডের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে দীর্ঘদিন রিমান্ড মঞ্জুর করা হচ্ছে। এই রিমান্ডে মূলত নেয়া হচ্ছে তাদের কিছুদিন জামাই আদরে নিজেদের কাছে রাখার জন্য। গ্রেফতারকৃত জঙ্গিদের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, বিভিন্ন সময় পত্রিকায় এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে তাদের যে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, ওসির সামনে চেয়ারে বসে কমলা/আপেল খাওয়া, মুফতি হান্নানের নাশতা এবং সেহরির যে বিবরণ আমরা পত্রিকায় পড়েছি, তাতে করে আমার এই ধারণাই সৃষ্টি হয়েছে। তবে নিঃসন্দেহে এই দীর্ঘমেয়াদি রিমান্ড আইনসম্মত নয়।

আসক : আর একটা বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একই বিষয়ে অনেক মামলা হচ্ছে। যেমন চাঁদপুর, বরিশাল, সিলেট– বিভিন্ন স্থানে একই ব্যক্তির নামে বিস্ফোরক আইনে মামলা হচ্ছে। এটি তো মাল্টিপ্লিসেটি অব অ্যাকশন, একই বিষয়ে অনেক মামলা। এটা তো আমাদের ফৌজদারি আইন অনুমোদন করে না। সেক্ষেত্রে আপনি কী বলবেন?

রু.কু.বা : অনেক জেলায় একসাথে বোমাবাজি হয়েছে এবং এসব জেলায় বোমাবাজির নির্দেশ দিয়েছে যারা, তাদের এই অপরাধের হুকুমদাতা হিসেবে যদি প্রত্যেকটি জেলায় মামলায় অভিযুক্ত করা হয়, তাহলে এটা ডাবল জিওপার্ডি বা একই অপরাধের জন্য দু'বার বিচারের আওতায় পড়বে না। কারণ অপরাধ তো পৃথক স্থানে পৃথকভাবে হচ্ছে। ৬৩টি জেলায় এই অপরাধ ঘটানোর নির্দেশ তারা দিয়েছে। এই অপরাধ ঘটানোর জন্য তারা রসদ সরবরাহ করেছে, অর্থ সরবরাহ করেছে এবং তারা এর মূল পরিকল্পনাকারী। ৬৩ জেলায় তো অপরাধ পৃথক পৃথকভাবে ঘটেছে। আপনি যদি আমাকে খুন করেন, তারপর আপনি যদি আরেকজনকে খুন করেন তাহলে দুটি খুনের দায়ে আপনার বিচার হবে না? এখানে ৬৩টা সেপারেট ক্রাইম হয়েছে। সিলেটে বিপ্লব গোস্বামীকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। সেটি একটি অপরাধ। আবার ঝালকাঠিতে দু'জন বিচারককে হত্যা করা হয়েছে, সেটি পৃথক অপরাধ। সুতরাং এগুলো প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক অপরাধ। যেখানে পৃথক অপরাধের বিচার হবে, সেখানে ডাবল জিওপার্ডি হবে না।

আসক : আচ্ছা, স্পিডি ট্রায়াল ট্রাইব্যুনাল নিয়ে তো বর্তমান সরকার অনেক খুশি। জঙ্গিদের কি এই ট্রাইব্যুনালের আওতায় আনা হচ্ছে?

রু.কু.বা : কোথাও কোথাও আনা হয়েছে। আমি সঠিক পরিসংখ্যান দিতে পারব না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রসিকিউশন পক্ষ এবং দায়িত্বরত পিপিরা বলতে পারবেন নিশ্চয়ই।

আসক : যদি এমন হয় যে, একই ধরনের অপরাধে কাউকে কাউকে স্পিডি ট্রায়াল ট্রাইব্যুনালের আওতায় আনা হলো, আবার কাউকে সাধারণ ফৌজদারি আদালতে আনা হলো। এটা কি বিচার প্রক্রিয়াকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে?

রু.কু.বা : আমি তো প্রথমেই বলেছি যে, শুরু থেকেই এই সরকারের উদ্দেশ্যগুলো কিন্তু খুব একটা সৎ উদ্দেশ্য না। এই যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল যেটি করা হয়েছে, এই ট্রাইব্যুনালে ৬ ধরনের অপরাধের বিচার করার এখতিয়ার রয়েছে। তবে এই ৬ ধরনের অপরাধের সব মামলা দ্রুত বিচারে যাবে, তা কিন্তু নয়। সেটা হোম মিনিস্ট্রি এবং তাদের একটা কমিটি আছে

www.pathagar.com

সেই কমিটি নির্ধারণ করবে। সুতরাং এখানে 'পিক এন্ড চুজ'-এর একটা সুযোগ সরকার খুব ভালোভাবে রেখে দিয়েছে এবং সরকার এটার চর্চা করছে। সরকার এটা সব ক্ষেত্রেই করবে। তবে একই মামলায় কাউকে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এবং কাউকে সাধারণ ফৌজদারি আদালতে বিচারের কোনো আইনগত সুযোগ নেই।

আসক : ঝালকাঠিতে বিচারকদের হত্যা করা হলো। এখন তারই সহকর্মীর কোর্টে এদের বিচার হচ্ছে। এক্ষেত্রে কি আপনার মনে হয় যে, তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার সমস্যা হতে পারে? মানে বিচারকরা কোনোভাবে বায়াস হয়ে যেতে পারেন কিনা।

রু.কু.বা : বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জজই তো কোনো না কোনোভাবে আরেকজন জজের সহকর্মী। তাহলে আপনি বিচারটা কোথায় করবেন? কোনো না কোনো কোর্টে তো করতেই হবে। যারা মারা গেছেন তারা দু'জন সহকারী জজ ছিলেন। আর যেখানে এই বিচার কাজটি হচ্ছে সেটা একটা স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল। অর্থাৎ উনি ডিস্ট্রিক/সেশনস জজের সমকক্ষ একজন বিচারক। অর্থাৎ নিহত বিচারকদের ঊর্ধ্বতন বিচারক। সুতরাং আপনার এই আশঙ্কা এক্ষেত্রে ঠিক হবে বলে আমার মনে হয় না। তথাপি অভিযুক্তরা যদি মনে করে যে, বিচারকের কোনো আদেশে বায়াসনেস প্রকাশ পাচ্ছে, তাহলে তারা তো কোর্ট ট্রান্সফারের জন্য আবেদন করতে পারে। সে অধিকার তাদের রয়েছে।

আসক : আমি আবার একটু আগের প্রশ্নে ফিরে যেতে চাচ্ছি, যেটা এখনও ক্লিয়ার হয়নি। এই যে আপনি বললেন, সন্ত্রাসবাদের বিচার আমরা দণ্ডবিধির ১২১ ধারায় করতে পারি। কারণ, সন্ত্রাসবাদের মধ্যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উপাদান বিদ্যমান। এখন পর্যন্ত কিন্তু এ ধারায় কোনো মামলা করা হয়নি। এ বিষয়টাকে আপনি কীভাবে দেখেন ?

রু.কু.বা : এটা সরকারের পলিসির সাথে সম্পর্কিত ব্যাপার। এটা তো নিছক একটি বোমাবাজির অপরাধ নয়, নিছক একটি নরহত্যার অপরাধ নয়। তাদের একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, যে উদ্দেশ্যটা সাধন করতে গেলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় এবং সেই যুদ্ধ তারা ঘোষণা করেছে। শুধু ঘোষণা করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। প্রকাশ্য আদালতে তাদের নেতা শায়খ আবদুর রহমান বলেছে যে, বিচারক হত্যা আরও চলবে। সুতরাং সরকারের পলিসিটা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের পলিসি হচ্ছে যে, এটা দেখিয়ে মানুষের অধিকার হরণ করার জন্য তারা আইন প্রণয়ন করবে, কিন্তু সমস্যাটি সমাধান করবে না। আর ততটুকুই করছে বলে তারা দেখাবে, যতটুকু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নিজেদের ফেস সেভ করার জন্য দরকার। যদি তারা আন্তরিকই হতো, তাহলে এখানে ১২১ ধারায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা হতো। বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪ ধারায় যে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে ওই মৃত্যুদণ্ড আর ১২১-এর মৃত্যুদণ্ড তো এক নয়। আর সবার যে এখানে মৃত্যুদণ্ড হবে তাও তো নয়। এটা তো বিচারে নির্ধারিত হবে যে, কার কি সাজা হবে। কিন্তু সরকার এটাকে একটা বিচ্ছিন্ন অপরাধ হিসেবে দেখাতে চাচ্ছে। এটাকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে দেখাতে চাচ্ছে না, এটাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে দেখাতে চাচ্ছে না। তারও কারণ আছে, কারণ সরকারের যারা পার্টনার, তারা তো প্রকাশ্যেই এই সন্ত্রাসবাদীদের বা জঙ্গিবাদীদের রাজনৈতিক আদর্শ বা উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে।

আসক : আপনার হয়তো মনে আছে যে, যখন শীর্ষ জঙ্গিদের অ্যারেস্ট করা হলো তখন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বললেন, আমরা যদি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করতে যাই তাহলে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে পারবো না। তার মানে উনি বুঝিয়েছিলেন যে, মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন না বা যাবজ্জীবন দিতে পারবেন না। এটা প্রমাণ করা কঠিন হয়ে যাবে। আপনি এ বিষয়ে কী মনে করেন?

রু.কু.বা : যেখানে তারা স্বেচ্ছায় জবানবন্দি দিচ্ছে, সেখানে প্রমাণের তো কোনো ব্যাপার নেই। ওরা নিজেরা স্বেচ্ছায় জবানবন্দি দিয়ে কোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে। সেটা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিতেও তারা বলছে। এখন এই কথাটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মধ্যে পড়ে কিনা, এটা তো 'কোশ্চেন অব ইন্টারপ্রিটেশন অব ল'। এখানে প্রমাণের তো কিছু নেই। এখানে তদন্ত বা অনুসন্ধানেরও কিছু নেই। তাদের রিমান্ডেই-বা নেয়া হচ্ছে কেন? সত্য কথা তো তারা ডকে দাঁড়িয়েই বলে দিচ্ছে।

আসক : তাহলে আপনি বলছেন যে, ক্ষমতাসীন জোটে বিএনপি ছাড়াও বিশেষ করে আরও যে দুটি রাজনৈতিক দল আছে তাদের উদ্দেশ্যের সাথে এদের উদ্দেশ্যের মিল থাকার কারণেই সরকার এই বিষয়টাকে আনতে চাচ্ছে না প্রকাশ্যে।

রু.কু.বা : হ্যাঁ, ঠিক তাই। উপরন্তু বিএনপির মধ্যেও এদের পৃষ্ঠপোষকরা আছে।

আসক : জামায়াতে ইসলামীও তো বলে যে, তারা আল্লাহর আইন এবং সৎ লোকের শাসন চায়। এটাকে কি আপনি জেএমবির সাথে এক করতে চাচ্ছেন?

রু.কু.বা : ঠিক তাই। তারা তো একই কথা বলছে যে, আমরা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তারা বলেছে, গণতন্ত্র মানুষের সৃষ্টি একটি মতবাদ। সুতরাং মানুষের সৃষ্ট মতবাদকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করতে হবে। এটা ইসলামী ঐক্যজোট, জামায়াতে ইসলামী ও জেএমবি সবাই বলে। শুধু তাই নয়, এদের গোপন সম্পর্কটা কী? শায়খ রহমান নিজেই বলেছে যে, গোলাম আজম এবং মাওলানা মওদুদী হচ্ছে তার আদর্শ। গোলাম আজমের বই তার ডেরা থেকে উদ্ধার হয়েছে কিন্তু পুলিশ সেটাকে সিজার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করছে না। আবার শায়খ রহমানের কাছে ধরা পড়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যে মোবাইলটি তার কাছে ছিল, সেটাও অন্তর্ভুক্ত হয়নি। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি ঘটনা যদি এনালাইসিস করেন– বাড্ডার অস্ত্র উদ্ধার হলো যার বাড়ি থেকে সেই বাড়ির একটি লোক জামায়াতে ইসলামী করে অথবা একসময় করতো, ময়মনসিংহের যে বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার হলো সেই বাড়ির একটি লোক জামায়াতে ইসলামী করতো এক সময়। এই ঘটনাগুলো কি কাকতালীয় নাকি তাদের সাথে তাদের একটা গোপন সম্পর্ক আছে, এটাও তো রাজনৈতিকভাবে বিশ্লেষণ করার মতো ব্যাপার। এবং যখনই ওই জামায়াতের লোকের আইডেন্টেটি প্রচার করা হচ্ছে সাথে সাথে জামায়াতে ইসলামী একটি প্রেস কনফারেন্স করে বলছে, না ওরা তো আমার দল করে না। ৫ বছর আগে বহিষ্কার করা হয়েছে। তার বহিষ্কারের নথি কে পরীক্ষা করছে। এমন তো হতে পারে যে, জামায়াত তাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংগঠন থেকে বাইরে অন্য শাখার দায়িত্ব পালন করতে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, যখন একটি লোককেও গ্রেফতার করা হয়নি তখন ফজলুল হক আমিনী পল্টনে জনসভা করে সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বললেন "দাড়ি-টুপিওয়ালা লোকদের যেন গ্রেফতার না করা হয়। তাহলে জেহাদ হয়ে যাবে এ দেশে।" কেন জেহাদ হবে? কোনো দাড়ি-টুপিওয়ালা নিরপরাধ মানুষকে তো গ্রেফতার করা হয়নি। আর দাড়ি-টুপি এ দেশের অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষের লেবাস। অর্থাৎ তারা এখানেও এই ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে জেএমবিকে রক্ষা করতে চাইছে। তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়ার চেষ্টা করছে।

আসক : জঙ্গিদের বিচার উচ্চ আদালতে যাওয়ার বিষয়টা কীভাবে হবে? তারা এ বিচার প্রক্রিয়াকে মানছেই না, ফলে তারা তো নিশ্চয়ই যাবে না আপিলে।

রু.কু.বা : আপিলে না গেলেও এটা ডেথ রেফারেন্স হিসেবে তো আসবে, যদি কোথাও কোনো মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়ে থাকে। তারা যেহেতু প্রকাশ্যে কোনো ল'ইয়ার এনগেজ করেনি এবং বলেছে যে, এই আদালতের কর্তৃত্ব তারা মানে না। তাদের এই বক্তব্য ঠিক হয়ে থাকে তাহলে তাদের আপিল করার কথা না। আর সেই কেসগুলোই হাইকোর্টে আপনাআপনি আসবে, যেখানে মৃত্যুদণ্ড থাকবে।

আসক : শায়খ, বাংলাভাই তাদের কথা বাদ দিলাম। আরও যারা আছে জেএমবির কর্মী, যারা ক্যাডার, ৫০ জন, ৩০ জন করে নিয়মিত অ্যারেস্ট হচ্ছে, এদের কীভাবে বিচার প্রক্রিয়ায় আনা যায়? তারাও তো একই অপরাধে অপরাধী।

রু.কু.বা : প্রচুর লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই জেএমবি কিনা এটাও খতিয়ে দেখা দরকার। এজন্যই দরকার যে, সরকারের উদ্দেশ্য তো জেএমবি নিধন বা দমন নয়। সরকারের উদ্দেশ্য জাতিকে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এটি দেখানো যে, তারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে খুব কার্যকর একটা ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং এখানে দাড়িওয়ালা বা টুপিওয়ালা নিরপরাধ মানুষকে গ্রেফতার করেও যদি তাদের জেএমবি বলে চালানো যায়, তাহলে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হয়। এখন যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, এই অপরাধের সাথে তারা কতটুকু সম্পর্কিত সেটা তো 'তথ্যগত প্রশ্ন'। সেটা বিচারে প্রমাণ হবে। সবাই যে অপরাধী তা কিন্তু নয়। সবাই তো জেএমবির সাথে যুক্ত নাও হতে পারে।

আসক : সর্বোপরি আপনি কি বলবেন যে, কীভাবে এ সমস্যাটা আন্তরিকতার সঙ্গে ট্যাকেল করা যায়?

রু.কু.বা : আমি মনে করি যে, এটা একটা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই জঙ্গিবাদের উত্থানের বীজ নিহিত আছে। তারপর এখানে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে দারিদ্র্য, তা থেকে মানুষের মধ্যে হতাশার জন্ম হয়, সে হতাশা থেকে মানুষ অদৃশ্যবাদে আক্রান্ত হয় এবং অদৃশ্যবাদ থেকে মানুষ মৌলবাদের দিকে টার্ন নেয়। সেই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো এড্রেস করার জন্য যদি উদ্যোগ গ্রহণ না করা হয়, তাহলে এখানে মৌলবাদের উত্থানের সম্ভাবনা থেকেই যাবে। এখানে যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ, তা যদি বদলানোর চেষ্টা না করা হয়, তাহলে এখানে মৌলবাদের উত্থানের সম্ভাবনা থেকে যাবে। সুতরাং তাদের বিদ্রোহকে দমন, বিদ্রোহীদের বিচারের আওতায় আনার পাশাপাশি এই কাজগুলো করতে হবে। সমস্যা সমাধান করতে হলে এর আর্থ-সামাজিক যে কারণগুলো আছে, সেগুলো চিহ্নিত করে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমাধান করতে হবে। তবেই জঙ্গিবাদ ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে পরিপূর্ণভাবে পরিত্রাণ পাব আমরা।

আসক : ধন্যবাদ, সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য।

রু.কু.বা : আপনাকেও ধন্যবাদ।

জুলাই ২০০৬

www.pathagar.com

"এই সন্ত্রাসমূলক অপরাধ অবশ্যই আমাদের বর্তমানে প্রচলিত সন্ত্রাসমূলক অপরাধ নয়"

নিজামুল হক নাসিম
অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট

আসক: জেএমবি যে হত্যা, বোমাবাজি, সহিংসতা, আত্মঘাতী হামলা ইত্যাদি চালিয়েছে তাদের এসব অপরাধকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়?

নিজামুল হক নাসিম : এসব অপরাধকে সন্ত্রাসমূলক অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। তবে এই সন্ত্রাসমূলক অপরাধ অবশ্যই আমাদের বর্তমানে প্রচলিত সন্ত্রাসমূলক অপরাধ নয়। কারণ, বর্তমান আইনে সন্ত্রাসমূলক অপরাধ বলতে হাইজ্যাকিং, চাঁদাবাজি, ভাঙচুর, মারামারি ইত্যাদিকে বোঝায়। কিন্তু জঙ্গিদের এ অপরাধগুলো একটি দেশের মূলনীতিকে আঘাত করার জন্য ঘটানো হয়েছে। বর্তমানে যদিও তাদের আঘাতগুলো শুধু বিচারব্যবস্থার ওপর পরিচালিত হচ্ছে, কারণ বর্তমান বিচারব্যবস্থা নাকি তাদের ভাষায় 'আল্লাহর আইনের বিরোধী'। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, তাদের ভাষায় আল্লাহর আইনের বিরোধী বলতে শুধু বিচারব্যবস্থাই নয়, দেশের গণতন্ত্র, সংসদ, শাসনতন্ত্র ইত্যাদি সব কিছুকেই বোঝায়। অবস্থা এমন যে তারা এক্ষেত্রে আত্মঘাতী হামলা পর্যন্ত চালাচ্ছে। এ অপরাধগুলো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে, যা দণ্ডবিধির ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা আছে।

আসক : জেএমবির শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিরা ধরা পড়েছে। এখন তাদের বিচারও চলছে। কিছু মামলার রায়ও হয়েছে (ঝালকাঠি)। তাদের গ্রেফতার এবং বিচারের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনার মতামত কি?

নি.হ.না : বলা হচ্ছে জেএমবির শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিরা ধরা পড়েছে, আসলে তারা শীর্ষ ছিল কি না তা আমরা জানি না। কারণ তাদের মদদদাতা, বুদ্ধিদাতা, অর্থদাতা লোকেরা এখনো ধরা পড়েনি, তাদের ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে এমন খবরও আমাদের জানা নেই। তারা ধরা পড়ার পরেই বোঝা যাবে যে, যারা ধরা পড়েছে তারা শীর্ষস্থানীয় কি না। তাদের গ্রেফতার এবং বিচারের প্রক্রিয়া নিয়ে আমার মনে হয় সারা দেশের জনগণের মনে প্রশ্ন আছে। তড়িঘড়ি করে বিচার শেষ করার নামে যেভাবে তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছে, তা কতটুকু আইনসম্মত এবং বাস্তবসম্মত একমাত্র ভবিষ্যৎই তা বলতে পারবে। কারণ বিষয়গুলো সুপ্রিমকোর্টে বিচারাধীন। তবে রাষ্ট্রদ্রোহ সম্পর্কে কোনো চার্জ না করে বিচারটি করায় আমার কাছে বিচারটিকে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

আসক : তাদের এই বিচার প্রক্রিয়া কি আইনানুগভাবে চলছে? প্রচলিত আইনি কাঠামোয় তাদের কৃত অপরাধের যথার্থ বিচার সম্ভব, না কি নতুন করে আইন প্রণয়নের দরকার আছে?

নি.হ.না : তাদের বিচার প্রক্রিয়া আইনানুগভাবে চলছে কিনা তাও মামলা চলাকালীন সময়ে বলা ঠিক নয়। কারণ বিষয়টি সাব-জুডিস। তবে আমি মনে করি আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ হলে প্রচলিত আইনের কাঠামোতেই তাদের বিচার সম্ভব। নতুন কোনো আইনের দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।

আসক : জঙ্গিদের হামলার লক্ষ্যবস্তু বিবেচনা করলে দেখা যায় আদালত, আইন, বিচারক, আইনজীবীরাই প্রধান টার্গেট। তাদের যুক্তি, এ বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার হচ্ছে না, এটা 'তাগুতি'। ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী বিচার হতে হবে। কিন্তু বিচার ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটাতে পারে দেশের পার্লামেন্ট– বিচারক বা আইনজীবীরা না। এটা কি তাদের একান্তই বোঝার ভুল, নাকি এটা সরকারের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পলিসির অংশ করে নেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টির প্রয়াস?

নি.হ.না : ন্যায়বিচারের নামে তাদের বক্তব্য অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থা তাগুতি, ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী বিচার হতে হবে– আমি মনে করি এটা তাদের বোঝার ভুল নয় বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ দেশের সব বিচার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নিজেদের মর্জিমাফিক আইন প্রণয়ন করাই তাদের উদ্দেশ্য এবং এ ব্যাপারে তাদের চোখে যারা প্রধান বাধা, তাদেরকেই তারা টার্গেট করেছে। সরকারের মধ্যে এবং বাইরের একটি অংশ এ ব্যাপারে তাদের মদদ দিচ্ছে বলে মনে হয়। কারণ তাদের ধারণা এটা চালিয়ে যেতে পারলে প্রগতিশীল মানুষেরা তাদের দাবি-দাওয়া উত্থাপনে এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণেও সংযত হবে

www.pathagar.com

এবং তাতেই তাদের লাভ। তবে বাস্তবে তা হওয়ার নয়।

আসক : জঙ্গিদের বিচারের ভবিষ্যৎ কি? অর্থাৎ বিচার কি যথাসময়ে শেষ হয়ে রায় বাস্তবায়ন করা হবে, নাকি একটা পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াবে, যেমনটা আরও বেশ কিছু মোকদ্দমার ক্ষেত্রে হয়েছে?

নি.হ.না : এ সম্পর্কে এখনো বলার সময় আসেনি। তবে বিচার শেষ পর্যন্ত থমকে দাঁড়াবে কিনা বা রায় বাস্তবায়ন করা হবে, সময়ই তা বলবে। এক্ষেত্রে রাজনীতিই নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

আসক : হামলায় যারা মারা গেছে তাদের পরিবার এবং যারা আহত/পঙ্গু হয়ে গেল তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য এ বিচার প্রক্রিয়া বা আইন-আদালত কি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারে? পারলে কীভাবে আর বর্তমান আইনি কাঠামো যদি তার জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে কী পদক্ষেপ নেয়া যায়?

নি.হ.না : এখন পর্যন্ত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ব্যতীত অন্য কোনো আইনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা নেই। ফলে বর্তমান আইনি প্রক্রিয়ায় জঙ্গি হামলার ভিকটিমদের সাহায্য-সহযোগিতার কোনো সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে অন্য আইন দরকার নতুবা অন্য পদক্ষেপ নেয়া যায়, যেমন– তাদের জীবনমাল রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য সরকার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে পারে।

আসক : শীর্ষ জঙ্গিদের এই বিচার প্রক্রিয়া তাদের মূলোৎপাটনে কতোটা সহায়ক বলে মনে করেন?

নি.হ.না : এ বিচার প্রক্রিয়া তাদের মূলোৎপাটনে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি না। তাদের মূলোৎপাটন করতে হলে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তার সাথে শক্ত হাতে দোষীদের এবং সহায়তাকারী মদদকারীদের ন্যায়নিষ্ঠভাবে বিচার করা দরকার।

আসক : জঙ্গিবাদের উত্থান থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের সরকারের ভূমিকাকে (নীতি/আইন প্রণয়ন, যেমন– টেলিটেপিং আইন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত যুক্তি ইত্যাদি) কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

নি.হ.না : জঙ্গিবাদ উৎখাতে আমাদের সরকারের ভূমিকাকে আমি যথেষ্ট মনে করি না। আমার কাছে মনে হয়, সরকারের মধ্যের একটা বড় শক্তি এবং বাইরেরও কিছু কিছু শক্তি এ উত্থানকে সহায়তা করছে এবং সরকার এ ব্যাপারে কিছু ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন– টেলিটেপিং আইন। কিছু লোকের অবৈধ কার্যকলাপ ঠেকাতে সমগ্র জনসাধারণের মৌলিক অধিকারকে পদদলিত করে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা যায়, হাতের ফোঁড়া কাটতে হাত কেটে ফেলা, এটা কোনোক্রমেই সঠিক পদক্ষেপ নয়।

আসক : বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী তৎপরতায় জেএমবি ছাড়াও অন্য অনেক জঙ্গি সংগঠনের সংশ্লিষ্টতা দেখা গেছে। কিন্তু এখন বিচার প্রক্রিয়া বা আলোচনায় জেএমবি ছাড়া অন্যরা তেমন নেই। বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

নি.হ.না : এ প্রসঙ্গে আমি আগেই বলেছি, জেএমবি ছাড়াও সরকারের মধ্যে এবং বাইরে কিছু গোষ্ঠী জড়িত আছে। বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ মহল তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। যার ফলে ভবিষ্যতে হয়তো জেএমবি থাকবে না কিন্তু জঙ্গি সংগঠন থেকে যাবে। বিষয়টি আমাদের গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

আসক : উদীচী মামলার রায় সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

নি.হ.না : উদীচী মামলার রায় সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন হলো, আমি রায়ে কোনো ভুল দেখছি না। মামলার আইও যদি বলেন, মামলা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করা যায়নি বা হয়নি তাহলে সে মামলার আসামিদের শাস্তি দেয়া যায় না। তবে মামলাটির অবশ্য পুনর্তদন্ত হওয়া উচিত এবং সঠিক আসামিদের বিচারে সোপর্দ করা উচিত।

সেপ্টেম্বর ২০০৬

www.pathagar.com

"বাংলাদেশে ইসলামপন্থি রাজনীতির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা ঐতিহাসিক যোগসূত্র আছে"

আনু মুহাম্মদ
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

আসক: বাংলাদেশের সাম্প্রতিক জঙ্গিবাদী তৎপরতা দমনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

আনু মুহাম্মদ : গত কয়েক বছরে বেশ কিছু সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মসজিদ, গির্জা, সিনেমা হল ইত্যাদিতে একের পর এক বোমা হামলা একটা নতুন ধরনের সন্ত্রাসী আবহ তৈরি করেছে। ১৯৯৯ থেকে যে বোমা হামলাগুলো হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, সবসময় সরকার ঘটনার পরপরই কারা এটা করতে পারে সে সম্পর্কে একটা রায় দিয়েছে। যেমন– আওয়ামী লীগ আমলে আমরা শুনতাম যে এটা 'মৌলবাদীরা' করেছে। বিএনপি আমলে আমরা শুনি যে এটা 'আওয়ামী লীগ' করছে। কখনো শুনি যে এটা পাকিস্তানি 'আইএসআই' করেছে, আবার কখনো শুনি যে ভারতীয় 'র' করেছে; জানি না দু'জনই এই ব্যাপারে সক্রিয় কিনা। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হলো যে, আমরা সবগুলো ঘটনাতেই দেখলাম যে, প্রতিটি সরকারই নাম দেয়ার ব্যাপারে যতটা আগ্রহী, অপরাধী শনাক্ত করা ও ধরার ব্যাপারে ততটাই অনাগ্রহী। কোনোবারই তড়িৎ ও কার্যকর তদন্ত তো হয়ইনি, উপরন্তু কাগজপত্র-আলামত ইত্যাদি নষ্ট হয়েছে এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে তদন্ত একদমই থেমে গেছে। মোটামুটি আমরা এই একটা ধরন দেখতে পাচ্ছি। এখন পর্যন্ত এই চলছে এবং সবকিছুর মধ্যে জনগণকে না জানানো কিংবা জনগণের কাছ থেকে আড়াল করা, গোপনীয়তা এবং জনগণের নিরাপত্তাহীনতাকে ব্যবহার করে অন্য কিছু করার একটা প্রবণতা আছে। আসল অপরাধী না ধরার এই প্রবণতা থাকলেও সবকিছুর মধ্যে আমরা একটা অভিন্ন ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি যে, 'আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন' কিংবা 'সন্ত্রাস দমন'-এর অজুহাতে নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ, তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী আইন করা এবং সরকারি যে বলপ্রয়োগকারী সংস্থা আছে সেগুলোকে অধিকতর শক্তিশালী করা। সেগুলোর আধুনিকীকরণ করার নামে অনেক রকম কারিগরি দক্ষতা/সক্ষমতা বাড়ানো, সেটার জন্য তহবিল বরাদ্দ করা ইত্যাদি। তার মানে আপনি বলতে পারেন যে, একদিকে সন্ত্রাসী তৎপরতা বাড়ছে, সেই সন্ত্রাস দমন করার ক্ষেত্রে সরকারের অযৌক্তিক ধরনের অদক্ষতাও দেখা যাচ্ছে; আর পাশাপাশি এই সন্ত্রাসের যুক্তি দেখিয়েই সন্ত্রাসবিরোধী আইন বা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা নতুন ধরনের আয়োজন চলছে। সন্ত্রাস দমনের নামে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রকাশ্য-গোপন নানা চুক্তি হচ্ছে, তাদের সামরিক কর্মকর্তারা ঘন ঘন এ দেশ সফর করছেন। আর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ বিশেষত বাংলাদেশের খনিজসম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ খুবই অযৌক্তিক ধরনের শর্তে, বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ পরিণতি আনার মতো বিনিয়োগের নামে দখল করার প্রক্রিয়াও জোরদার হচ্ছে। এখন সন্ত্রাস বৃদ্ধি ও দখল প্রক্রিয়া, দুইয়ের মধ্যেএকটার কারণে আরেকটা কিনা অথবা একটার ফলাফল আরেকটা কিনা– সেটা আমি দলিলপত্র দেখিয়ে বলতে পারবো না। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত বিচার করলে এবং কান্ডজ্ঞান প্রয়োগ করলে এসবের দিকে মনোযোগ দেয়া জরুরি হয়ে পড়ে।

সাম্প্রতিককালে আমরা দেশে যে সন্ত্রাসী তৎপরতার আবহ দেখছি তার একটা বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে। এর মানে, বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বলতে যেগুলো বোঝানো হয় সেটা বুঝতে গেলে কিংবা সেটার ফলাফলের ধরনটা দেখতে গেলে আমার মনে হয় বৈশ্বিকভাবে যা যা ঘটছে সেদিকে দৃষ্টি দেয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী একটা কথা এখন খুব চালু করা হয়েছে– 'ওয়ার অন টেরোরিজম'। এটার প্রবক্তা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এমনভাবে পুরো জিনিসটা মিডিয়া এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থিত করা হচ্ছে যে, বিশ্বজুড়ে একটা বড় ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতা চলছে যার জন্য পুরো বিশ্ব ভয়াবহ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছে এবং সেটার জন্য দায়ী হচ্ছে 'আল কায়দা' বা এই ধরনের সংগঠন। বলা হচ্ছে, এর বিরুদ্ধেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লড়াই করছে এবং তাকে দমন করে পৃথিবীতে শান্তি আনতে চাইছে। পুরো ব্যাপারটাই বড় আকারের মিথ্যা প্রতারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটা এ রকম ঘটনা না যে আল কায়দা নামে একটা প্রতিষ্ঠান হঠাৎ করে সন্ত্রাস

www.pathagar.com

শুরু করলো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাস দমন করতে উঠে পড়ে লাগলো। এইভাবে দেখার এবং এইভাবে জিনিসটা উপস্থাপন করতে চাওয়াটার মধ্যেই বড় ধরনের সমস্যা আছে। সন্ত্রাস কী? কে আলকায়দা? কে যুক্তরাষ্ট্র? সন্ত্রাস বলতে আমরা যদি বুঝি যে নিরীহ মানুষের ওপর সশস্ত্র হামলা, বিভিন্ন দেশে কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলে কোনো না কোনো সংগঠিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্দেশ্যমূলকভাবে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি, সম্পদ দখল বা লুণ্ঠনের রাস্তা তৈরি, অন্য দেশের ওপর নিরাপত্তার হুমকি সৃষ্টি করা, জনগণের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করা, সহিংসতাকে উস্কানি দেয়া, অনুপ্রবেশ করা, গুম-খুন থেকে গণহত্যা ইত্যাদি, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই ক্ষেত্রে যার সবচেয়ে কলঙ্কময় রেকর্ড সেটি হলো– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই হিসেবে এটি হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংগঠিত সন্ত্রাসী শক্তি। বাস্তবে পরিস্থিতি এমন যে, এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে কোনো সন্ত্রাসী শক্তির দীর্ঘদিন টিকে থাকা এবং বড় আকারের কোনো অপারেশন চালানো কঠিন। কারণ সিআইএ যে মাপে সারা দুনিয়ায় অপারেশন চালায়- তার আধুনিক প্রযুক্তি, লোকবল, অর্থবল ইত্যাদি যেভাবে ব্যবহার করে এবং যে ধরনের নেটওয়ার্ক তার আছে, তাতে তাদের সঙ্গে কোনো না কোনো ধরনের যোগাযোগ ছাড়া আন্তর্জাতিক কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়।

আসক : বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিষয়টি কী রকম?

আ. মু : এখানে সরকার এমন একটা ভাব করতে যাচ্ছে যে, তারা নতুন করে সন্ত্রাস নির্মূল করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে এবং এই যে র‍্যাব, কোবরা, চিতা–এসব বাহিনীকে সেজন্যই গঠন করা হয়েছে। এই বাহিনীগুলোকে যেভাবে তারা সন্ত্রাস দমন করার কথা বলে দাঁড় করাচ্ছে, যেভাবে তারা পরিচালনা করছে– একটা সমাজে সন্ত্রাসের ব্যাপারটা কতো ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি করলে মানুষ সেটাকে গ্রহণ করে, এ তার প্রমাণ। গত কয়েক বছর ধরে এটা সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার মনে হয় আমার কাছে। প্রকাশ্যে বিনাবিচারে এবং কোনো রকম আইনগত ব্যবস্থার মধ্যে না গিয়ে একজনকে কিংবা একাধিক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করছে রাষ্ট্র এবং বলা যায়, রাষ্ট্রীয় একটা হত্যাযজ্ঞ চলছে। সেটাকে মানুষজন আবার একভাবে গ্রহণও করছে। এটা খুবই একটা বিপজ্জনক ব্যাপার এবং এটা যখন গৃহীত হয়ে যায় সামাজিকভাবে, তখন যে কোনো ধরনের ভিন্নমত কিংবা যেকোনো ধরনের প্রতিবাদী ভূমিকাই সন্ত্রাসী হিসেবে পরিগণিত হবে এবং তাকে যদি এভাবে গুলি করে হত্যা করা হয় তখনও জনগণের দিক থেকে আপত্তি করার কিংবা জনগণের দিক থেকে এটাকে বিরোধিতা করার মতো কোনো শক্তি আর অবশিষ্ট থাকবে না।

আসক : জঙ্গিবাদী তৎপরতা দমনের নামে বাংলাদেশ যেসব আন্তর্জাতিক চুক্তি করেছে সেগুলো সম্পর্কে কিছু বলবেন?

আ. মু : বাংলাদেশের মানুষ জানেন না, তাদেরকে জানানো হয়নি কিন্তু গত কয়েক বছরে দেশকে ভয়ঙ্কর বেশ কিছু চুক্তির মধ্যে ফেলেছে বাংলাদেশের সরকার। বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত কয়েকটি চুক্তি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চুক্তি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য বুঝি এটা করা হয়েছে। আসলে কিন্তু চুক্তির মধ্যে আছে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের কারিগরি সহায়তা বাংলাদেশের মানুষকে দেবে এবং এর জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সেগুলো বিনা মনিটরিংয়ে বাংলাদেশে আনতে পারবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রীকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এটার কোনো সামরিক দিক আছে কিনা। তখন তার উত্তর ছিল, শান্তি বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনে সামরিক দিকও আমরা ব্যবহার করতে পারি। কী কী জিনিস আসবে? সেগুলোকে কে মনিটর করবে? সে ব্যাপারে তার উত্তর ছিল, এটার ব্যাপারে তাদের একটা যৌথ ভূমিকা থাকবে। তার মানে হলো, এই চুক্তিটার মধ্যেই একটা সন্দেহজনক ব্যাপার আছে। 'হানা' চুক্তিটা তো এখন পর্যন্ত বলবৎ আছে, 'পিসকোর' চলছে একভাবে। আরেকটা হচ্ছে 'সোফা' চুক্তির আদলে 'হানা' চুক্তির বাইরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সেনাবাহিনী 'মানবিক' ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনে যে কোনো সময়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারবে, এ রকম চুক্তি। তার সাথে যুক্ত হয়েছে আরেকটা চুক্তি যেটার খবর আমরা পেয়েছি বিদেশি পত্রিকা থেকে। বাংলাদেশের কোনো পত্রিকায় এটা প্রকাশিত হয়নি। সেটা হচ্ছে 'ইমিউনিটি' চুক্তি। তার মানে বাংলাদেশে মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রবেশ করার পরে যদি কোনো ধরনের অপরাধ করে, সে অপরাধটা যে কোনো মাত্রার হতে পারে; সেটা খুন, ধর্ষণ, জালিয়াতি, জনগণের ওপর বিভিন্ন ধরনের হামলা হতে পারে– 'মানবাধিকার লঙ্ঘন' যে মাত্রারই হোক না কেন সেটার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সামরিক কর্মকর্তা বা সদস্যকে বাংলাদেশের আইনে বিচার করা যাবে না এবং বিচার তো করা যাবেই না বাংলাদেশ তাকে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতে (আইসিসি) হস্তান্তর করতে পারবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই নিজের শাস্তি দিতে পারবে। আর এখানেই শেষ নয়। সে যদি অন্য কোনো জায়গায় অপরাধ করে বাংলাদেশে আসে বা আশ্রয় নেয় যেমন – ইরাকে গণহত্যা করে কিংবা যতরকম ভায়োলেশন আছে, তাহলেও বাংলাদেশ সরকার তার বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যবস্থা

www.pathagar.com

নিতে পারবে না। তার মানে এই চুক্তিগুলো করার অর্থ কী? এই চুক্তিগুলো করার অর্থ হচ্ছে বড় আকারের সন্ত্রাসী তৎপরতা বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালানোর জন্য বাংলাদেশে একটা উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করা। তার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামো নির্মাণ করা, যেখানে ভবিষ্যতে অনেক ধরনের সন্ত্রাস হবে এবং জনগণের ওপর বড় আকারের আক্রমণ হবে, সেটাতে যাতে জনগণের মধ্য থেকে প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ না হয় তার জন্য আইনগত একটা ভিত্তি তৈরি করা। বাংলাদেশ তারপরও কাগজে-কলমে আমরা জানি বা বলি যে, বাংলাদেশ একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র! বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে বিশেষত হ্যারি কে. টমাসের সময়ে বাংলাদেশ সরকারকে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে সহযোগিতা দানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং বেশ কিছু তহবিল, বেশ কিছু প্রকল্পও তারা দিয়েছে। পুলিশের উন্নয়ন, তাদের প্রশিক্ষণ, পুলিশ কর্মকর্তাদের যুক্তরাষ্ট্র সফর, যন্ত্রপাতি আনয়ন, এমনকি তাদের গাড়ি কেনা, নতুন নতুন লোকজনের তদন্ত, গোয়েন্দাগিরি এসব করার জন্য যেসব অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি দরকার সেগুলো আনা, এগুলো চলছে। এসবের সাথে আরেকটা চুক্তির সম্পর্ক আছে, যেটি অনুযায়ী, তাদের ভাষায় বাংলাদেশের সন্ত্রাসী তৎপরতা যারা পরিচালনা করছে তাদের শনাক্ত করার জন্য সব ধরনের তথ্য দুই দেশ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সংরক্ষণ করবে এবং যেকোনো মাত্রায় যেকোনো ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে তারা তথ্য সংগ্রহের জন্য। কারা সন্ত্রাস করছে? তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী এবং পরিষ্কারভাবে একটা জায়গায় বলাও আছে, 'মার্কিন স্বার্থের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত কোনো ধরনের কার্যক্রম' কিংবা তাদের ভাষায় সেই সন্ত্রাসী তৎপরতা করলে 'তাকে দমন ও চিহ্নিত করার জন্য বাংলাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পরস্পরকে সহযোগিতা করবে।' এই চুক্তির শিরোনাম: 'পারসোনাল আইডিন্টেফিকেশন সিকিউর কমপারিজন এন্ড ইভাল্যুয়েশন সিসটেম' বা 'পিসেস' (PISCES)।

আসক : এটা কত সালে হয়েছে?

আ. মু : এটা ২০০৪ সালে হয়েছে। ক্রিস্টিনা রোকা যে সর্বশেষ আসলেন। এই ক্রিস্টিনা রোকার আসা এবং এই চুক্তিগুলো করার একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে।

আসক : আচ্ছা, ক্রিস্টিনা রোকা আসার পরই আমরা জানতে পারলাম যে গত দুই বছর যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সিআইএ বাংলাদেশকে সামরিক সহায়তা দিচ্ছে, অর্থ দিচ্ছে, গবেষণা বা গোয়েন্দাবৃত্তি পরিচালনা করার জন্য?

আ. মু : হ্যাঁ, কারণ ক্রিস্টিনা রোকা এই দায়িত্বে আছেন। তার নেতৃত্বেই চুক্তিগুলো হচ্ছে। নেয়া হচ্ছে নানা ব্যবস্থা। যে ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন জনের টেলিফোনে আড়ি পাতা বিল সংসদে পাস হলো। তারপর বিভিন্ন ধরনের শনাক্তকরণের জন্য সামনে হয়তো আমরা আরও দেখবো আঙ্গুলের চিহ্ন রাখা কিংবা তাকে মনিটর করা কিংবা ক্যামেরা ব্যবহার করা, এসব কিন্তু বিভিন্ন নামে ও ভাবে আস্তে আস্তে দেখতে থাকবো। এগুলোর পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-কড়ি পাওয়া যাবে এবং কাগজপত্রে, মিডিয়াতে আমরা জানবো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবিরোধী কাজের জন্য সমস্ত তহবিল দিচ্ছে কিংবা সহযোগিতা করছে। বাস্তবে বড় আকারের সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর ক্ষেত্র তৈরির জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বিনিয়োগ করছে এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী যে প্রতিষ্ঠানগুলো– পুলিশ থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনী পর্যন্ত যা বস্তুত অনেক দিন আগে থেকেই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে। কিন্তু এখন সেটাকে তাদের জন্য আরো উপযোগী করে তোলা, কিংবা তাদের স্বার্থের জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা, কিংবা তাদের সম্পূর্ণ অধস্তন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য যেভাবে সংস্কার করা দরকার, সেভাবে তারা সংস্কার করে যাচ্ছে। তাদের এই কাজগুলো অধিকতর বৈধতা পাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতার ফলে।

আসক : তাহলে কী আপনি মনে করেন যে, বাংলাদেশে যে জঙ্গিবাদী তৎপরতা চলছে এবং তার বিরুদ্ধে যে মার্কিন উদ্যোগগুলো নেয়া হচ্ছে এর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে?

আ.মু : বাংলাদেশে ইসলামপন্থি রাজনীতির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা ঐতিহাসিক যোগসূত্র আছে। তার সবচেয়ে বড় প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৭১ সালে। বাংলাদেশে যেসব ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দল ছিল তারা পাকিস্তানের সামরিক শাসক এবং পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের সূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে আন্তর্জাতিক বলয় তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল এবং '৭১ সালে তারা পাক সামরিক বাহিনীর সাথে সাথে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকেও সার্ভিস দিয়েছে। এরপরও বাংলাদেশে যতগুলো সামরিক শাসন এসেছে সবগুলোর সাথেই একটা বড় অংশ ইসলামপন্থি রাজনীতি জড়িত ছিল। তাছাড়া তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক এজেন্ডার মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হলো– আল্লাহর আইন বা বিধান প্রতিষ্ঠা। এটি একটি রাজনৈতিক অবস্থান ও কর্মসূচি। কিন্তু এর মধ্যে খুবই শক্ত ফ্যাসিবাদী উপাদান আছে। লক্ষণীয় যে, যুক্তরাষ্ট্রেও এই প্রবণতা বাড়ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কিন্তু যেখান থেকে যেভাবে তারা সমস্ত কিছু পরিচালনা

www.pathagar.com

করেছে, সেগুলো বিবেচনা করলে একে ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায় না। যুক্তরাষ্ট্র খ্রিস্টান আইডেন্টিটি কিংবা বিভিন্ন ধরনের খ্রিস্টান চিহ্ন এবং ক্রুসেডের যে ভাষা, সেটাকে ব্যবহার করছে। আর ইহুদি ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী তো সেখানে প্রবলভাবে সক্রিয়। এই ক্রুসেড এবং জেহাদ, সারা দুনিয়ায় যেটা চলছে এটা আমার কাছ খুব স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হয় না। কারণ ইসলামি জেহাদ যারা পরিচালনা করছে, যেসব প্রতিষ্ঠান, সেগুলো তো ঐতিহাসিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের হাতিয়ার হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। সুতরাং এর মধ্যে কিছুটা প্ররোচনা কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিভিন্ন উস্কানিমূলক তৎপরতা নানাভাবে কাজ করা খুবই সম্ভব। আর মুসলিম বিশ্বে এ ধরনের শক্তি গড়ে ওঠাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সুবিধাজনক এবং তার আধিপত্য বিস্তার করার জন্য খুব ভালো একটা অজুহাত। মার্কিন আধিপত্যবিরোধী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বৃহৎ ঐক্য ভেঙে দেয়া এটাতে সহজ হয়।

আসক : এর মধ্যে ধর্মের ভূমিকাটা কী রকম?

আ.মু : ধর্ম তো খুব সামনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতগুলো সন্ত্রাসী তৎপরতা সারা দুনিয়াতে চালিয়েছে সব জায়গাতেই একটা হাতিয়ার ছিল ধর্ম । ১০০ বছর আগের একটা ঘটনা পড়ছিলাম আমি, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভাষ্য। "মার্কিন বাহিনী যখন ফিলিপাইন দখল করতে যাচ্ছে, তার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেটাকে বৈধ করতে গিয়ে বলছেন যে, 'আমি হোয়াইট হাউজে রাতের পর রাত হেঁটেছি এটার সমাধান পাওয়ার জন্য যে ফিলিপাইনে আমরা কি করবো? তিনটা সম্ভাবনা ছিল। একটা হচ্ছে, আমরা ফিলিপাইনকে সাবেক ফরাসি এবং যেসব ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল, তাদের কাছে দিয়ে দিতে পারি। সেটা আমাদের জন্য সম্মানজনক হবে না। দুই নম্বরে সেদেশকে ছেড়ে দিতে পারি ফিলিপাইনের জনগণের কাছে, কিন্তু ফিলিপাইনের জনগণ দেশটাকে খুবই বাজে অবস্থায় নিয়ে ফেলবে। তৃতীয় সমাধান ছিল, আমরা সেখানে গিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবো এবং ফিলিপাইনের উন্নয়নের জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। তিনটার কোনটা করবো সেটা ভেবে আমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত হোয়াইট হাউজে হেঁটেছি। সমাধান পাইনি। হঠাৎ একদিন গভীর রাতে আমার কাছে তার সমাধান এলো ঈশ্বরের কাছ থেকে। আসলে আমাদেরই ফিলিপিনোদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া উচিত এবং সেটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা উচিত। সেটা সবার জন্যই ভালো হবে।" দখলদারিত্বের জন্য ধর্ম ব্যবহারের এই প্রবণতার এখনো বদল হয়নি। সর্বশেষ বুশ যে ইরাক, আফগানিস্তান দখল করলো তখনো বলেছে, 'আমরা ঈশ্বরের নির্দেশে এটা করেছি' এবং এটা হচ্ছে 'এক ধরনের ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা'।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত কয়েক বছরে বিশেষত গত এক দশকে বিভিন্ন ধরনের খ্রিস্টান এবং ইহুদি ফ্যাসিস্ট গ্রুপের যে উত্থান, সেই উত্থানটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ভূমিকাগুলোকে সমর্থন দিচ্ছে, কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে বর্ণবাদী বা সাম্প্রদায়িক যে দৃষ্টিভঙ্গিগুলো আছে সেগুলোকে আরও জোরদার করেছে। মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা এবং এসব শক্তির যে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, দুটোই পরস্পর সাহায্য করছে। আবার আমরা ইতিহাস দেখলে দেখি যে, বুশের রিপাবলিকান পার্টি এবং তার এই যে বর্ণবাদী, কিংবা নারীবিদ্বেষী কিংবা ফ্যাসিস্ট যেসব কর্মসূচি, সেসব কর্মসূচির সাথে তারা ঐখানকার কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন মুসলিম গ্রুপগুলোকেও বিভিন্নভাবে সাথে পেয়েছে; যেমন– মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্রে যেসব শক্তি কিংবা ফ্যাসিবাদী সেসব রাজনৈতিক গোষ্ঠী, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় মিত্র ছিল বরাবরই, এখন পর্যন্ত আছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনি দখল কিংবা আধিপত্যের জন্য ওই সব দেশে অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী শক্তির টিকে থাকাটা খুব দরকার। সেজন্য এসব দেশের সামরিক, বেসামরিক রাজতন্ত্রী, কিংবা অরাজতন্ত্রী স্বৈরাচারী ব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্র সবসময় পৃষ্ঠপোষকতা করছে, এদের ইসলাম সেখানে তার মিত্র।

আসক : তার মানে কি বাংলাদেশে এখন যে জঙ্গিবাদী তৎপরতা চলছে, এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধনেই চলছে?

আ.মু : বাংলাদেশে যে সন্ত্রাসী তৎপরতা চলছে, যে বোমা হামলা এগুলোকে যদি আমরা আলাদাভাবে সন্ত্রাস বলে বিবেচনা করি, তাহলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভূমিকা দেখে বোঝা যায় যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র এটা দমন করতে চায় না, চিহ্নিত করতে চায় না যে কারা হামলা করেছে এবং তাদের, তাদের বিষয়টাকে জিইয়ে রাখার প্রবণতা আছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। যেটা আমি আগে বললাম যে কখনোই তদন্ত ঠিকমতো হয় না। আলামত নষ্ট হয়েছে এবং চিহ্নিত করা হয়নি ইত্যাদি। শায়খ আবদুর রহমানকে যেভাবে ধরা হলো এবং যেভাবে মিডিয়াতে উপস্থাপন করা হচ্ছে, পুরো জিনিসগুলো আমার খুব নাটক নাটক মনে হয়। কারণ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের অযোগ্যতা আছে এটা ঠিক; কিন্তু অযোগ্যতা বা অথর্বতা এই মাত্রায় নেই যে তারা জানে না যে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। সেজন্য তাদের অজান্তে সমস্ত কিছু ঘটছে এটা আমি মনে করি না। শায়খ বা বাংলাভাই তো এই রাষ্ট্র থেকে প্রত্যক্ষ সমর্থন পেয়েই এতদূর এসেছে। লুৎফুজ্জামান বাবর বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন। এই লুৎফুজ্জামান বাবর মার্কিন

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রে কিছু দিন আগে গিয়েছিলেন। আমাদের পত্রপত্রিকায় ঘটনাটা রিপোর্ট হয়নি, কিন্তু বিদেশি পত্রিকায় হয়েছে। সেখানে জর্জ বুশের ভাই জেব বুশের সঙ্গে লুৎফুজ্জামান বাবরের বেশ দীর্ঘক্ষণ মিটিং হয়েছে। এই জেব বুশ 'আমেরিকান সেঞ্চুরি প্রজেক্ট'-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং সারা পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রের যে সন্ত্রাসী তৎপরতা তার অন্যতম সংগঠক। তার সাথে আমাদের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বৈঠক 'বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য'– জেব বুশের কর্মকান্ড জেনে, যদি কেউ বিশ্বাস করতে বলে– সেটা আমি বিশ্বাস করতে রাজি না। সেই বৈঠকের পরে বাংলাদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা আরও বেড়েছে। পাঁচশো জায়গায় বোমা ফেটেছে। এই সবকিছু মিলিয়ে আমি মনে করি যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যেসব বাহিনী আছে, সন্ত্রাসী বলে যাদের বলা হচ্ছে, সেগুলোর সাথে তাদের একটা যোগসূত্র আছে। এটাকে তারা জিইয়ে রাখতে চায় এবং সেটাকে উপলক্ষ করে নতুন নতুন আইন এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা, বাহিনী গঠন ইত্যাদি করতে চায়। অধিকতর নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে, অধিকতর আধিপত্য এবং সন্ত্রাসের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। আঞ্চলিক কৌশলের দিক থেকেও বাংলাদেশ এখন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়, সেটাই বিপজ্জনক। চূড়ান্ত শিকার হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ।

আসক : বাংলাদেশে জেএমবির যে তৎপরতা এবং তার বিরুদ্ধে সরকারের নেয়া পদক্ষেপগুলো পুরোটাই কি নাটক?

আ.মু : জেএমবির উত্থানের সময় আমরা দেখলাম বাংলাদেশের মন্ত্রীরা তাদের সহযোগিতা করছে। এর শুরু এক মন্ত্রীর পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্য দিয়ে। এরপর তাদের বর্বর কার্যক্রম চলতে থাকে। বাংলাভাইকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ডিফেন্ড করেন; রাজশাহীর পুলিশ সুপার বলেন, 'সর্বহারা দমনে তারা সহযোগিতা করছেন। তাদের ধন্যবাদ।' শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী একবার বলেছেন, 'বাংলাভাই পত্রিকার সৃষ্টি' আবার বলেছেন, 'নকশালীরা হত্যা করেছেন হাজার হাজার। বাংলাভাই মাত্র ৮/১০ জন।' এসব কথা সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৪ সালের মে জুন জুলাই মাসে প্রথম আলো পত্রিকায় এসব বক্তব্য পাবেন। সুতরাং এসব বাহিনীর জন্ম ও বিকাশে যে এদের ভূমিকা ছিল এটা তো বোঝাই যাচ্ছে পরিষ্কারভাবে এবং তারপর যখন একটা স্টেজে এসে তারা ধরপাকড় করছে, সেই ধরপাকড়টাও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের দমন-পীড়নের সাথে তুলনাযোগ্য নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'ক্রসফায়ার'-এ খুন এবং দমন-পীড়ন চলছেই। পাশাপাশি জেএমবি এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে রাষ্ট্র যেভাবে মুভ করছে– বোঝা যায় যে পার্থক্য একটা আছে। এটা আমার ধারণা যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র সন্ত্রাসবিরোধী তৎপরতার নামে যে পরিবর্তনগুলো আনতে যাচ্ছে, সেটার জন্য জেএমবি খুব ভালো একটা হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে এবং বাংলাভাই, শায়খ আবদুর রহমান কোথায় আছে, কীভাবে আছে, সেগুলো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের খুব ভালোই জানা। তাদের কখন কোথায় ধরতে হবে, কতটুকু ধরতে হবে, কতটুকু রাখতে হবে, কীভাবে রাখতে হবে এগুলো সবই তাদের জানা ও পরিকল্পিত বিষয়।

আসক : আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে বললেন, কিন্তু এর সাথে আছে ব্রিটেন, কিংবা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এরাও। কিন্তু বাংলাদেশকে সন্ত্রাসবিরোধী তৎপরতায় সহযোগিতার কথা বলছে বা তহবিল প্রদানের কথা বলেছে। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের আদালতের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য অনেক টাকা অফার করেছে। তার মানে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র একা নয়।

আ.মু : না, যুক্তরাষ্ট্র যখন আমি বলছি তখন আমি নেতার কথা বলছি। মানে যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্র হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছে একটা বিশ্বজোটের। সে বিশ্বজোটে অন্তর্ভুক্ত আছে পশ্চিমা পুঁজিবাদী, সুনির্দিষ্ট করে বললে জি-এইটভুক্ত দেশগুলো, কিংবা আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে আন্তর্জাতিক পুঁজির কেন্দ্রীয় শক্তিগুলো। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ তো তাদেরই হাত হিসেবে কাজ করে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের যে অর্থনৈতিক কর্মসূচি, সেটা শুধুই অর্থনৈতিক নয়, সেটা উঁচুমাত্রায় রাজনৈতিক, মানে তারা কাকে, কখন, কি অর্থে, কি শর্তে ঋণ দেবে, কিংবা কীভাবে সেগুলো দিয়ে কি ধরনের প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন আনবে সেগুলো নিছক অর্থনৈতিক বিবেচনায় ঠিক হয় না। সেগুলোর পেছনে একদিকে যেমন থাকে বহুজাতিক সংস্থার প্রবেশটাকে নিশ্চিত করা কিংবা তাদের অর্থ-বাণিজ্যিক আধিপত্য নিশ্চিত করা, আবার একই সাথে থাকে রাজনৈতিকভাবে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা। বাংলাদেশে এখন 'সুশাসন' এবং 'অর্থনৈতিক সংস্কার' এই দুই ধরনের প্রকল্পের কথা আমরা খুব শুনি। বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, এগুলোর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক আধিপত্যের ডিজাইনের খুব কার্যকর সম্পর্ক আছে। তারা এগুলোকে উপস্থিত করে খুব নিরীহভাবে, উন্নয়ন দান ইত্যাদি মোড়কে। তাদের সুবিধার জায়গাটা হচ্ছে, একাডেমিক ইনস্টিটিউশনও তাদের রাজনৈতিক একটা হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। অনেক একাডেমিক ইনস্টিটিউশন আছে, রিসার্চ ইনস্টিটিউশন আছে, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছে, বড় বড় অনেক এনজিও আছে, যেটা তাদেরই বিভিন্ন বিভাগ হিসেবে কাজ করে। সুতরাং তারা যে একটা নির্দিষ্ট অবজেক্ট নিয়ে অগ্রসর হয়, সেটাকে

www.pathagar.com

যৌক্তিকীকরণ করা, কিংবা সেটাকে দারিদ্র্য বিমোচন বা সন্ত্রাস দমন এ রকম নামের আড়ালে উপস্থিত করার জন্য যে ধরনের একাডেমিক আবরণ দরকার হয়, সেগুলো ঠিক করার জন্য উপযোগী নানা 'বিশেষজ্ঞ' আছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমরা এ রকম থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, রিসার্চ ইনস্টিটিউশন কিংবা এ ধরনের প্রোগ্রামগুলো দেখি, যেখানে বাংলাদেশ 'রিসিভার্স এন্ড' হিসেবে ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের 'বিদ্বান' অনেক লোক আছে এর সঙ্গে। এমন কেউ কেউ থাকতে পারেন যাদের হয়তো পুরো পার্সপেকটিভটা জানা নেই। তারা প্রজেক্ট কিংবা তহবিল পাওয়ার কারণে, আনন্দের আতিশয্যে ওই একই ভাষায় কথা বলে কিংবা মিডিয়া একই জিনিস অনুবাদ করে প্রকাশ করে। এভাবে পুরো একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। মোহ তৈরি করা হয় যে এরা খুব একটা বড় আকারের সন্ত্রাসবিরোধী কিংবা দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ করছে। উন্নয়ন নামে হয় ধ্বংসের কাজ, যেমন তেল-গ্যাস-কয়লা নিয়ে নানা বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে হচ্ছে, দারিদ্র্য বিমোচন নামে হয় দারিদ্র্যকে টেকসই করার কাজ, আর সন্ত্রাস দমন নামে সন্ত্রাসী ব্যবস্থাকে পোক্ত করার নানা আয়োজন চলতে থাকে। এসব প্রচার আর প্রতারণার মোহ আর মতাদর্শিক আধিপত্য থেকে বের না হতে পারলে আমার মনে হয় না, বাংলাদেশের আর আমাদের মানুষের অধিকতর বিপদ থেকে রক্ষার কোনো উপায় আছে।

আসক : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আ.মু : ধন্যবাদ।

২ মে ২০০৬

www.pathagar.com

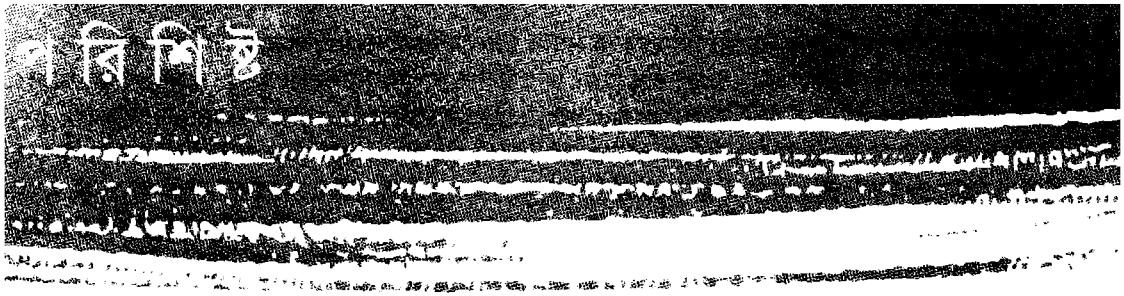

বোমা হামলার ঘটনাপঞ্জি

সাল-কাল	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঘটনা-পরবর্তী অবস্থা	সর্বশেষ অবস্থা
৬ মার্চ (দিবাগত রাত ১টা) ১৯৯৯ টাউন হল ময়দান, যশোর	উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর জাতীয় সম্মেলনের শেষদিন মধ্যরাতে নৃশংস বোমা হামলায় ১০ জন নিহত ও দুই শতাধিক আহত হন। যশোর টাউন হল ময়দানে সম্মেলনের মঞ্চে রাত ১টার দিকে বাউল গান চলার সময় মঞ্চের পেছনে মাটির নিচে পুঁতে রাখা শক্তিশালী দুটি টাইম বোমার বিস্ফোরণে এ ঘটনা ঘটে।	বোমা হামলার সাথে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ঘটনার পরদিন ৭ মার্চ এবং ৯ মার্চ-এর মধ্যে ১৯৯৯ স্থানীয় শিবির সভাপতি রেজাউল করিম ও দপ্তর সম্পাদক রিয়াজুল ইসলামসহ ৪৬ জনকে গ্রেফতার করে। আটককৃতদের অধিকাংশই জামায়াত ও শিবিরকর্মী। এই ঘটনায় ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখে তরিকুল ইসলামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। ১৪ জানুয়ারি ২০০০ মামলার শুনানি শুরু হয় কিন্তু ২১ জুন ২০০০ মামলার কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। ৩ মার্চ ২০০৩ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয়, মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম বা বিএনপির কেউ এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়; ফলে তাদেরকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হোক। ১৩ আগস্ট ২০০৩ তরিকুল ইসলামকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ১৭ জানুয়ারি ২০০৫ দ্বিতীয় দফা চার্জশিট দাখিল করা হয়।	২৮ জুন '০৬ মামলার রায় প্রদান করা হয় । ২৩ জন আসামির সবাইকে খালাস দেয়া হয়। হরকাতুল জিহাদ এ ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করেছে।
৮ অক্টোবর ১৯৯৯, খুলনা	খুলনার নিরালা আবাসিক এলাকায় কাদিয়ানি মসজিদে এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ৮ জন নিহত এবং অর্ধশতাধিক আহত হন।	এই ঘটনায় একটি মামলা হয় এবং একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়।	সিআইডি তদন্ত শেষে ১৭ জুন ২০০৫ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে ।

www.pathagar.com

স্থান-কাল	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঘটনা-পরবর্তী অবস্থা	সর্বশেষ অবস্থা
২০ জুলাই ও ২৩ জুলাই ২০০০ কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভাস্থলের অদূরে পরপর মোট ৩টি বিশালাকৃতির শক্তিশালী বোমা মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা হয়।	এ ঘটনায় মোট ৪টি মামলা হয়। ৯ এপ্রিল ২০০১ মুফতি মাওলানা আব্দুল হান্নান মুন্সিসহ ১৯ জনকে আসামি করে চার্জশিট দাখিল করা হয়। এর মধ্যে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২৫ জুন ২০০১ মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়।	১ অক্টোবর ২০০৫ ঢাকা থেকে মুফতি হান্নানকে গ্রেফতার করা হয়। গত ১৯ নভেম্বর ঢাকা মহানগর হাকিম মো: শফিক আনোয়ারের কাছে ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে তিনি স্বীকার করেন হরকাতুল জিহাদ এ বোমা হামলার ঘটনা ঘটায়।
২০ জানুয়ারি ২০০১ পল্টন ময়দান, ঢাকা	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) মহাসমাবেশে এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ৫ জন নিহত এবং অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হন।	সমাবেশ চলাকালে বিকেল ৫টায় মঞ্চের অদূরে দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে আকস্মিকভাবে বোমাটি বিস্ফোরিত হলে প্রচন্ড শব্দ ও আলোর ঝলকানিতে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হয় এবং বোমার ধোঁয়া, মানুষের রক্ত, শরীরের ছিন্নভিন্ন অংশ- লাশ, আহত মানুষের গোঙানি, চিৎকার ও আতঙ্কিত মানুষের ছোটাছুটিতে সমাবেশস্থলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। এই ঘটনার এক ঘন্টা পর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে পৃথক এক বোমা বিস্ফোরণে আরো দু'জন নিহত হন। পল্টনের বোমা হামলার ঘটনায় ২টি মামলা দায়ের এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ৩ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ২২ জানুয়ারি ২০০১ তারিখে ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ২০০৩ সালে তদন্ত কমিশন চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করে।	মামলার কার্যক্রম এখন স্থবির, পুলিশ ৪ জন আসামিকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।
১৪ এপ্রিল ২০০১ রমনা বটমূল, ঢাকা	বাঙালি জাতির প্রাণের উৎসব রমনার বটমূলে ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা সংঘটিত হয়। সকাল সাড়ে ৮টায় অনুষ্ঠান চলাকালে বোমা বিস্ফোরণে ১০ জন নিহত	এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ দু'দফায় মোট ১৬ জনকে গ্রেফতার করে এবং দুটি মামলা দায়ের করা হয়। ৩ মার্চ ২০০২ তারিখে ৩ জন আসামিকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয় এবং ২৩ মার্চ	এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত ছাত্রদল নেতা মিজানুর রহমান স্বাধীন এখন পুলিশের সাব-

www.pathagar.com

স্থান-কাল	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঘটনা-পরবর্তী অবস্থা	সর্বশেষ অবস্থা
	এবং শতাধিক আহত হন।	অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আব্দুল বারীর নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। ১২ এপ্রিল ২০০৪ তারিখে ১৩ জন আসামির সবাই জামিনে মুক্তি পায়। ১৮ এপ্রিল ২০০৩ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়– 'রমনার বটমূলে বোমা হামলার জন্য সৈয়দ হাসান ইমাম, বাহাউদ্দীন নাছিম, শেখ হাসিনা ও তাদের অনুচর এবং সহযোগীরাই দায়ী; এই মামলার কথিত ১২ জন আসামির কেউই দায়ী নয়।' ১৬ জানুয়ারি ২০০৫ বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলাটির রিপোর্ট প্রকাশ এবং হত্যা মামলায় ১ জনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।	ইন্সপেক্টর। বোমা হামলার আলামত ধ্বংস করা হয়েছে। পুলিশ বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলাটি চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে। হত্যা মামলায় ১ জনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দাখিল (প্রআ: ১৭/১/০৫)। মুফতি হান্নান তার স্বীকারোক্তিতে জানায় হরকাতুল জিহাদ এ ঘটনা ঘটায়।
৩ জুন ২০০১ মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	বানিয়ারচর ক্যাথলিক মিশনারি চার্চে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে প্রার্থনারত ১০ জন প্রাণ হারান এবং কমপক্ষে ৩০ জন আহত হন।	বোমা বিস্ফোরণস্থল পরীক্ষার জন্য সেনা বিশেষজ্ঞ দলকে তলব করা হয়, ডিবি তদন্ত করে ও বোমা হামলার ঘটনায় পুলিশ ৭ জনকে গ্রেফতার করে এবং দুটি মামলা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১, ৫ জন আসামিকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। সিআইডির তত্ত্বাবধানে থাকা মামলা দুটির তদন্ত কর্মকর্তা বারবার পরিবর্তন হয়।	১৬ জানুয়ারি ২০০৫ পুলিশ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। এখনও পর্যন্ত এই মামলার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি।
১৬ জুন ২০০১ চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের নবনির্মিত কার্যালয়ে রাত পৌনে ৯টায় স্থানীয় জনগণের সাথে সাংসদ শামীম ওসমানের নিয়মিত সাক্ষাৎ কর্মসূচি চলাকালে আচমকা কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণে নারী-শিশুসহ ২১ জন নিহত এবং সাংসদ শামীম ওসমানসহ শতাধিক আহত হন। বোমা বিস্ফোরণের পরপরই আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে রাখা শামীম ওসমানের গাড়ি লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষণ করা হয়।	পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে শামসুল আলম লিটনকে (ফ্রিডম পার্টির কর্মী) গ্রেফতার করে। ১৮ জুন ২০০১ বিএনপি ও জামায়াত নেতাকর্মীসহ ২৭ জনকে আসামি করে ২টি মামলা দায়ের করা হয়। ২১ মে ২০০২ সাবেক সাংসদ শামীম ওসমান, তার ২ ভাই নাসিম ওসমান, সেলিম ওসমান ও মামলার বাদি খোকন সাহাসহ ৫৮ জনকে বাদি করে নারায়ণগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ১৯ মার্চ ২০০২ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আব্দুল বারী সরকারকে	৩১ জানুয়ারি ২০০৩ মামলার সব আসামিকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে আদালতে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয়।

www.pathagar.com

[illegible]	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঘটনা-পরবর্তী অবস্থা	সর্বশেষ অবস্থা
		চেয়ারম্যান করে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়।	
২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১ মোল্লাহাট, বাগেরহাট	খলিলুর রহমান কলেজ মাঠে বিকেল সাড়ে ৫টায় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জনসভায় বোমা বিস্ফোরণে ৮ জন নিহত ও শতাধিক আহত হন। আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল মঞ্চের দিকে যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে।	ঘটনার পরপর পুলিশ ও সেনাবাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে। সরকার এ ঘটনার তদন্তে দুই সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে ১৬৯ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের এবং ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়।	বর্তমানে মামলার কার্যক্রম স্থবির অবস্থায় আছে।
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১ শাল্লা, সুনামগঞ্জ	সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের জনসভা থেকে ২০০ গজ দূরে উপজেলা হাসপাতালের হেড কোয়ার্টারে বোমা বিস্ফোরণে ৪ জন নিহত ও ৩০ জন আহত এবং সিলেটে শেখ হাসিনার সমাবেশস্থল থেকে ৫০০ গজ দূরে একটি বাসায় বোমা বিস্ফোরণে ২ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হন।	সুনামগঞ্জের ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে ১টি হত্যা মামলা ও একটি বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত মামলা দায়ের করে। এ ঘটনায় ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।	হরকাতুল জিহাদ এ ঘটনা ঘটায় বলে মুফতি হান্নান জানায়।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০০২ সাতক্ষীরা	শহরের রক্সি সিনেমা হল এবং গুড়পুকুরের মেলার সার্কাস প্যান্ডেলে ১০ মিনিটের ব্যবধানে একাধিক বোমার বিস্ফোরণে এক স্কুল ছাত্রসহ ৩ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হন।	এ দুটি ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা হয় এবং ৬ জনকে গ্রেফতার করে জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ১ অক্টোবর ২০০২ পৌর কমিশনার মোমিন উল্লাহসহ ৩ জনকে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেয়া হয় এবং ৩ অক্টোবর সিআইডির বিশেষ টিমসহ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।	তদন্ত কাজের অগ্রগতি না হওয়ায় মামলাটি এখন স্থবির হয়ে পড়েছে।
৭ ডিসেম্বর ২০০২ ময়মনসিংহ	শহরের ৪টি সিনেমা হলে দেড় ঘণ্টার ব্যবধানে সিরিজ বোমা হামলায় নারী-শিশুসহ ১৮ জন নিহত ও শতাধিক আহত হন।	ঘটনার পরদিন একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন এবং ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় পৃথক ৪টি মামলা হয়। ১০ ডিসেম্বর ২০০২ পুলিশ-সেনা যৌথ বাহিনী আ. লীগ নেতা সাবের হোসেনসহ ৩২ জনকে গ্রেফতার করে। ১৫ মার্চ ২০০৩ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হয়। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ভারত থেকে বোমার উপকরণ এসেছে।	১৬ জানুয়ারি ২০০৫ মামলাগুলোর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়। জেএমবি এ হামলার সাথে জড়িত ছিল বলে দায়িত্ব স্বীকার করে।

www.pathagar.com

স্থান-কাল	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঘটনা-পরবর্তী অবস্থা	সর্বশেষ অবস্থা
১৭ জানুয়ারি ২০০৩ সখীপুর, টাঙ্গাইল	উপজেলার দারিয়াপুরে ফাইলা পাগলার মেলায় গভীর রাতে শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণে ৭ জন নিহত ও ২০ জন আহত হন।	পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৯ জনকে গ্রেফতার করে এবং হত্যা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দুটি মামলা দায়ের করে। ২১ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখে ৭ জনকে চার্জশিটে রেখে আসামিদের রিমান্ডে নেয়া হয়।	জেএমবি এ হামলার সাথে জড়িত ছিল বলে সত্যতা স্বীকার করে।
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ দিনাজপুর	শহরের একটি মেসে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ২ জন নিহত ও ১০ জন আহত হন।	ঘটনাস্থল থেকে কমপক্ষে ২ ডজন বোমা, ৩টি রিভলবার এবং বেশ কিছুসংখ্যক গুলি, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য এবং ২টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় কোতোয়ালি পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করে এবং পৃথক ২টি মামলা হয়। ৮ জনকে আসামি করে চার্জশিট দেয়া হলেও পরবর্তীকালে জেলা দায়রা জজ ৬ জনকে অব্যাহতি দেন।	
১২ জানুয়ারি ২০০৪ সিলেট	হযরত শাহজালাল (রাঃ)-এর দরগায় ওরস চলাকালে এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ৫ জন নিহত ও অর্ধশতাধিক আহত হন ।	এ ঘটনায় ১৩ জানুয়ারি ২০০৪ সিলেট কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। ২৩ জানুয়ারি ২০০৪ মহিলাসহ ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়।	তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
১৫ জানুয়ারি ২০০৪, খুলনা	নগরীর মির্জাপুর রোডে বাসায় ফেরার সময় বোমা হামলায় প্রখ্যাত সাংবাদিক মানিক সাহা নিহত হন।	১৬ জানুয়ারি ২০০৪ একটি মামলা দায়ের করা হয় এবংতদন্ত কমিটি গঠিত হয়।	মামলার তদন্ত কাজে কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় মামলা স্থবির হয়ে পড়ছে।
২৮ জানুয়ারি ২০০৪, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলার পিঠা উৎসবে বোমা বিস্ফোরণে ২ জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়।		
২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ ও উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ	ফুলবাড়িয়া শহীদ মিনারে বোমা পেতে রাখায় একুশে ফেব্রুয়ারিতে কেউ পুষ্পার্ঘ্য দিতে পারেনি এবং অপর এক ঘটনায় উল্লাপাড়ায় একুশের মেলায় ককটেল বিস্ফোরণে ৭ জন আহত হন।	সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দল ফুলবাড়িয়া শহীদ মিনারে পেতে রাখা বোমাটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করে। উল্লেখ্য, চারদলীয় জোটের কেন্দ্রীয় নেতা মুফতি ফজলুল হক আমিনী গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ ফুলবাড়িয়ায় গিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন।	

www.pathagar.com

	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঘটনা পরবর্তী অবস্থা	সর্বশেষ অবস্থা
২১ মে ২০০৪ সিলেট	হযরত শাহজালাল (র.) দরগাহ জামে মসজিদে জুমার নামাজ শেষে বেরিয়ে আসার সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুড়ে মারা হয়। এতে তিনি ও সিলেটের জেলা প্রশাসক আবুল হোসেনসহ শতাধিক লোক আহত এবং ৩ জন নিহত হন।	এই ঘটনায় সিআইডি, পুলিশ ও ব্রিটিশ পুলিশ তদন্ত করে। গত ২২ মে ২০০৪ একটি মামলা দায়ের এবং পরবর্তীকালে ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে সিলেটের তৎকালীন পুলিশ সুপারকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং সিআইডির সিনিয়র এএসপি মুন্সী আতিকুর রহমানের ওপর মামলার তদন্তভার দেয়া হয়।	মামলার কার্যক্রমে বর্তমানে স্থবিরতা বিরাজ করছে। হরকাতুল জিহাদ এ বোমা হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে।
২১ জুন ২০০৪ দিরাই, সুনামগঞ্জ	উপজেলা সদরে আওয়ামী লীগের এক জনসভায় গ্রেনেড হামলায় ১ জন নিহত ও ৭০ জন আহত হন। সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার ১ মিনিটের মধ্যেই মঞ্চের নিচে বিকট শব্দে বোমাটি বিস্ফোরিত হয়।	এ ঘটনায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।	হরকাতুল জিহাদ এ গ্রেনেড হামলার সত্যতা স্বীকার করে।
২৭ জুন ২০০৪ ইসলামপুর রোড, খুলনা	দৈনিক জন্মভূমি কার্যালয়ে বোমা হামলায় সম্পাদক হুমায়ুন কবীর বালু নিহত ও ২ জন সাংবাদিক আহত হন।	এ ঘটনায় ২৮ জুন ২০০৪ পুলিশ বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করে এবং জড়িত সন্দেহে পুলিশ ১০ জনকে গ্রেফতার করে।	তদন্তে কোনো অগ্রগতি নেই
৫ আগস্ট ২০০৪ সিলেট	শহরের তিনটি সিনেমা হলের সামনে রাত ৯টার দিকে তিনটি বোমা বিস্ফোরণে এক কিশোর নিহত ও ১৫ জন আহত হন।	এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের এবং তাবলিগ জামাত সদস্যসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। মামলার তদন্তভার সিআইডি পুলিশের ওপর ন্যস্ত করা হয়।	
৮ আগস্ট ২০০৪ সিলেট	সিলেটে মেয়রের ওপর গাড়িবোমা হামলায় আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ ইব্রাহিম আলী নিহত ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজসহ ৫০ জন আহত হন।	পুলিশ বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করে এবং একজনকে গ্রেফতার ও ৩ জনকে আটক করে। ১৩ আগস্ট ২০০৪ প্রবাসী আ.লীগ নেতা নুনু মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকা আনা হয়।	হরকাতুল জিহাদ এ হামলা ঘটানোর সত্যতা স্বীকার করে।
২১ আগস্ট ২০০৪ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা	আওয়ামী লীগের সমাবেশে উপর্যুপরি গ্রেনেড হামলায় কেন্দ্রীয় মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আইভি রহমানসহ ২১ জন নিহত এবং দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪ শতাধিক আহত হন। বঙ্গবন্ধু	গ্রেনেড হামলার ঘটনা তদন্তে ২২ আগস্ট ২০০৪ বিচারপতি জয়নুল আবেদিনকে দায়িত্ব দিয়ে এক সদস্যবিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন এবং ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়।	তদন্ত কাজে অগ্রগতি না হওয়ায় মামলার কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। হরকাতুল জিহাদ এ ঘটনার দায়িত্ব

www.pathagar.com

স্থান-কাল	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঘটনা-পরবর্তী অবস্থা	সর্বশেষ অবস্থা
	এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ট্রাকে স্থাপিত মঞ্চে বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে শেখ হাসিনার বক্তব্যের পরপরই মঞ্চের দক্ষিণ দিক থেকে গ্রেনেড হামলা চালানো হয়।	দন্ডবিধির ৩২৪/৩২৫/৩০২/৩৪ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩/৪ ধারায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়। ২৪ আগস্ট ২০০৪ হিকমাতুল জিহাদ নামে এক ইসলামি মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন গ্রেনেড হামলার দায় স্বীকার করে এবং ৭ দিনের মধ্যে শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দিয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয়। মামলার তদন্তভার ডিবি পুলিশের কাছ থেকে সিআইডি পুলিশের কাছে ন্যস্ত করা হয় এবং এফবিআই ও ইন্টারপোল পুলিশের একটি বিশেষজ্ঞ টিম তদন্ত কাজে ঢাকায় আসে। ২ অক্টোবর ২০০৪ তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন পেশ করা হয় এবং ১৫ ডিসেম্বর ১১ জনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে নেয়া হয়।	স্বীকার করে।
৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ সিলেট	জালালাবাদ সেনানিবাসের মলাইটিলা বটেশ্বর এলাকার ডাক্তার কলোনিতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এক স্কুলছাত্রসহ ২ জন নিহত ও ১০ জন আহত হন।	ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ১০ জনকে গ্রেফতার এবং ১১ জনকে আটক করে। এ ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করে।	
২৪ ডিসেম্বর ২০০৪, সিলেট	নগরীর তাঁতীপাড়া এলাকায় আওয়ামী লীগ নেত্রী সৈয়দা জেবুন্নেসা হকের বাসভবনে মহিলা আওয়ামী লীগের সভা চলাকালে বোমা বিস্ফোরণে ২ জন নিহত ও ৮ জন আহত হন।	এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের হয়।	হরকাতুল জিহাদ এ ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করে।
২৫ ডিসেম্বর ২০০৪ পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা	হরিনাথপুরের টাকিয়ার বাজারে যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা বিস্ফোরণে ৩ জন নিহত এবং ৫০ জন আহত হন।		
১ জানুয়ারি ০৫ খাল গ্রাম স্কুল মাঠ, বাগমারা, রাজশাহী	যাত্রামঞ্চে বোমা। আহত ৫০ জন।		

www.pathagar.com

স্থান-কাল	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঘটনা-পরবর্তী অবস্থা	সর্বশেষ অবস্থা
৩ জানুয়ারি ২০০৫ বাগমারা, রাজশাহী	উপজেলার খালগ্রাম হাইস্কুল মাঠে যাত্রামঞ্চে বোমা বিস্ফোরণে যাত্রা শিল্পীসহ অর্ধশত আহত হন।	পুলিশ ঘটনার পরপরই বোমা বিধ্বস্ত মঞ্চটি ভেঙে ফেলে।	
৮ জানুয়ারি ০৫ এলাচিপুর টুকচানপুর, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল	যাত্রানুষ্ঠানে বোমা হামলা । আহত ১৫ জন।		
১২ জানুয়ারি ২০০৫ জামালপুর	ছোনটিয়াতে ভ্যারাইটি শোর নাচের অনুষ্ঠানে রাত ২টার দিকে কয়েকজন যুবক নৃত্যশিল্পীদের লক্ষ্য করে পরপর ৪টি বোমা হামলা করে। এতে ৩০ জন আহত হয়।		
১২ জানুয়ারি ০৫ চকপাড়া সদর শেরপুর	নাট্যোৎসবে বোমা বিস্ফোরণ। ১০ জন আহত।		
১৪ জানুয়ারি ২০০৫ বগুড়া ও নাটোর	বগুড়া ও নাটোরের দুটি গ্রামে যাত্রা প্যান্ডেল ও নাট্যমঞ্চে বোমা বিস্ফোরণে ৩ জন নিহত এবং কমপক্ষে ৭০ জন আহত হন।		
১৭ জানুয়ারি ০৫ বাসস্ট্যান্ড জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা	পৌর চেয়ারম্যানের ওপর বোমা হামলা। আহত ৪।	গ্রেফতার ৩।	২১/১/০৫ মামলা দায়ের করা হয়েছে।
২০ জানুয়ারি ০৫ সরিষাবাড়ী, জামালপুর	যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা হামলা। আহত ৩০ জন।		বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
২৩ জানুয়ারি ২০০৫ নৈয়ারবাড়ী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণ। নিহত ১ এবং আহত ৪ জন।		
২৫ জানুয়ারি ২০০৫ বামন্দি, গাংনী মেহেরপুর	পুলিশ ক্যাম্পে বোমা হামলা।		
২৭ জানুয়ারি ২০০৫ হবিগঞ্জ	আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলায় কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া এমপিসহ ৬ জন নিহত এবং আহত হন দেড়শতাধিক নেতাকর্মী।	২৮/১/০৫ দুই সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন। ১০ জনকে আসামি করে চার্জশিট দাখিল ২১/৪/০৫। মামলার বাদি অধিকতর তদন্তের জন্য হাইকোর্টে রিট করেন। মামলাটি হবিগঞ্জ আদালত থেকে	বর্তমানে মামলাটি কিবরিয়ার পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিন মাসের জন্য স্থগিত

www.pathagar.com

স্থান-কাল	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঘটনা পরবর্তী অবস্থা	সর্বশেষ অবস্থা
		সিলেট দ্রুত বিচার আদালতে স্থানান্তর। হাইকোর্টের মামলার কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়ে নথি তলব। নথি পাওয়ার পর হাইকোর্টে রিট শুনানি হয়। রিট খারিজ। হাইকোর্ট আদেশ দেয় মামলার অধিকতর তদন্ত করার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে সংশ্লিষ্ট আদালত।	করেছে সুপ্রিমকোর্ট।
২৭ জানুয়ারি ২০০৫ উত্তর পানিশাইল, কাশিমপুর, গাজীপুর	বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণ। আহত ৩ জন।		
৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ প্রেসক্লাব, খুলনা	প্রেসক্লাবের সামনে বোমা বিস্ফোরণে ১ সাংবাদিক নিহত এবং ১২ জন আহত হন ।	এই ঘটনায় ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ হত্যা প্রচেষ্টা এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দুটি মামলা দায়ের করা হয়।	
১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা	স্থানীয় ব্র্যাক কার্যালয়ে বোমা হামলায় ৩ জন আহত হন।		
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ উত্তর কদমতলী, আদমজী, নারায়ণগঞ্জ	বোমা বিস্ফোরণ। আহত ৩ জন।		
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	টিএসসিতে ভ্যালেন্টাইন্স ডের প্রোগ্রামে বোমা হামলায় ১৬ জন আহত হন।	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে রমনা থানায় মামলা হয়।	
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ জয়পুরহাট ও নওগাঁ	দুই জেলার স্থানীয় ব্র্যাক কার্যালয়ে পৃথক পৃথক বোমা হামলায় ১৩ জন আহত।	এই ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের হয়।	
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পোরশা, নওগাঁ	ব্র্যাক অফিসে বোমা হামলা। আহত ৪।	গ্রেফতার ২ জন।	মামলা দায়ের করা হয়েছে।
১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সিরাজগঞ্জ	নবগ্রামের উল্লাপাড়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের অফিসে বোমা বিস্ফোরণে ২ জন আহত।		

www.pathagar.com

স্থান-কাল	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঘটনা-পরবর্তী অবস্থা	সর্বশেষ অবস্থা
২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	শাহডিঙ্গি মাজারে গ্রেনেড বিস্ফোরণে মাজারের টিনের চালা উড়ে যায় এবং মাজারের দক্ষিণ পাশের দেয়াল ভেঙে যায়।	২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ কুলাউড়া থানায় মামলা দায়ের এবং পুলিশ বিস্ফোরণের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে শিক্ষক ও মাদ্রাসা ছাত্রসহ তিনজনকে গ্রেফতার করে	
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তাহেরপুর বাগমারা, রাজশাহী	গ্রামীণ ব্যাংকের কাছে বোমা বিস্ফোরণ।		
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ খানসামা, দিনাজপুর	কারিতাস অফিসে বোমা হামলা।	গ্রেফতার ১ জন।	থানায় মামলা হয়েছে।
১ মার্চ ২০০৫ পারুলিয়া নরসিংহপুর, জিনারদি,নরসিংদী	ওরস মাহফিলে বোমা হামলা। মহিলাসহ ১০ জন আহত।	গ্রেফতার ১ জন।	থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
৫ মার্চ ২০০৫ রেলগেট, বেলগাছি, চুয়াডাঙ্গা	পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা হামলা।	৪ জন গ্রেফতার	
৫ মে ২০০৫ কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	জাতীয় পার্টির সভায় বোমা হামলা। আহত ১৫ জন।		মামলা হয়েছে।
৬ মার্চ ২০০৫ পায়রাডাঙ্গা ঝিকরগাছি, যশোর	বোমা তৈরিকালে বিস্ফোরণ।	১ জন গ্রেফতার	
৩১ মার্চ ২০০৫ কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বোমা বিস্ফোরণ। আহত ১ জন।	গ্রেফতার ৬ জন	মামলা দায়ের করা হয়েছে।
২১ এপ্রিল ২০০৫ গৌরনদী, বরিশাল	বোমা বিস্ফোরণ। আহত ৪ জন।		
৩ মে ২০০৫ চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি নেতার ওপর বোমা হামলা। আহত ২ জন।	গ্রেফতার ১ জন	আলমডাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে।
১৪ মে ২০০৫ বাগেরহাট	বাগেরহাট স্টেডিয়ামে বাণিজ্য মেলায় দি বেঙ্গল সার্কাসের শো চলাকালে গভীর রাতে বোমা হামলায় দুইজন আহত।		
২৭ মে ২০০৫ সিরাজগঞ্জ	রাত সাড়ে ১১টায় শহরের কালীবাড়ী রোডের মমতাজ সিনেমা হলে শো চলাকালে বোমা বিস্ফোরণে ৭ জন আহত হন।	এ ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং ড. গালিবকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়।	২৬ জুন ২০০৫ তদন্ত কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ এবং আটক ৪ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

www.pathagar.com

স্থান কাল	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মামলা সংক্রান্ত অবস্থা	সর্বশেষ অবস্থা
২৮ মে ২০০৫ দৌলতদিয়া, রাজবাড়ী	পতিতাপল্লীতে বোমা হামলা।		
৫ জুন ২০০৫ জিরো পয়েন্ট, সাতমাথা, বগুড়া	বগুড়ায় বোমা বিস্ফোরণ। নিহত ১ জন।		
৭ জুন ২০০৫ বাগেরহাট সদর	বাগেরহাটে বোমা হামলায় আহত সাবেক পৌর চেয়ারম্যান।	গ্রেফতার ৫ জন	বাগেরহাট সদর থানায় মামলা হয়েছে।
১৭ জুন ২০০৫ মানিকগঞ্জ শহর	মানিকগঞ্জ শহরে বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণ।		
১৭ জুন ২০০৫ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের ধলগাড়ি মাঠ	বোমা বানাতে গিয়ে হাত উড়ে গেছে ও শরীর ঝলসে গেছে এক ব্যক্তির।	গ্রেফতার ১ জন।	মামলা হয়েছে
২২ জুন ২০০৫ মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাজার, পাহাড়ী টিলা	উদ্ধার করা হ্যান্ড গ্রেনেড সেনানিবাসের তত্ত্বাবধানে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।	গ্রেফতার ১ জন।	
২২ জুন ২০০৫ শাহজাদপুর, মেনান্দহ, জামালপুর	বিয়েবাড়িতে শক্তিশালী বোমা হামলা।	গ্রেফতার ৮ জন।	
২৩ জুন ২০০৫ শহরের পূর্ব কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের আহমদিয়া অধ্যুষিত এলাকায় বোমা হামলা। আহত ১ জন।	গ্রেফতার ৮ জন।	
২৭ জুন ২০০৫ দৌলতখান, ভোলা	আ.লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদের বাসভবনের সংলগ্ন বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে ১ জন		একটি মামলা দায়ের করা হয়।
৪ জুলাই ২০০৫ বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ছাত্রী হল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	নিহত ও ১জন আহত। ই বি ছাত্রী হলে রাত ১১:৩০টায় বিস্ফোরণ (২টি বোমা)।		
১৩ জুলাই ২০০৫ নোয়াপাড়া, কুমিল্লা	রাত ১০টায় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও মাদকবিরোধী সভায় হামলা।		

www.pathagar.com

	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ		সর্বশেষ অবস্থা
১৭ জুলাই ২০০৫ হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	পুরানো লোহালক্কড়ের দোকানে বোমা বিস্ফোরণে ৩ জন নিহত ও ৪ জন আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে পরিত্যক্ত মর্টার সেল উদ্ধার করা হয়।	ঘটনার পরপর সেনা বিস্ফোরক দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং হাটহাজারী থানায় মামলা দয়ের হয়।	
২৫ জুলাই ২০০৫ খানজাহান আলী থানা, খুলনা	ইস্টার্ন জুট মিলের পাশে মশিয়ালীতে জনৈক রফিকের চা দোকানে বোমা হামলা। দুইবার বোমা নিক্ষেপ করা হয়। নিহত ১ এবং আহত ২জন।		নিহতের বড় ভাই বাদি হয়ে ২টা মামলা করেন অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে।
২৮ জুলাই ২০০৫ তালপুকুর, হাসাদাহু, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা	বিএনপি নেতা ও গ্রাম সরকার সদস্যার ওপর বোমা হামলা। ১ জন আহত।		
৪ আগস্ট ২০০৫ মেহেরপুর	মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে জনৈক হিরো সাহুর চা-এর দোকানে বোমা হামলা। আহত ৫জন।	গ্রেফতার ৩ জন।	
১২ আগস্ট ২০০৫ আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কল্লা শহীদের (র:) মাজারে বার্ষিক ওরস অনুষ্ঠানের ৩য় দিনে রাত ১১টা ৪০ মিনিটে ভক্তরা যখন জিকির ও গান-বাজনায় মগ্ন তখন মাজারের চারদিক থেকে দফায় দফায় বোমা হামলায় ২জন নিহত ও অর্ধশতাধিক আহত হন।	পুলিশ হামলার সাথে জড়িত সন্দেহে দু'জনকে আটক করে। পুলিশ পাহারার মধ্যে গ্রেফতারকৃত একজন পালিয়ে যায়। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগে ওসিকে সাসপেন্ড এবং পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসককে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে শো-কজ করা হয়। মাজার কমিটির সেক্রেটারি বাদি হয়ে মামলা করে। ১৩ আগস্ট ২০০৫ অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বনমালী ভৌমিককে প্রধান করে ৩ জনের একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়।	
১২ আগস্ট ২০০৫ চুয়াডাঙ্গা জেলা শহর	র‍্যাবের টহল গাড়িতে বোমা হামলা।	মামলা হয়েছে।	
১৪ আগস্ট ২০০৫ মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল	বরিশালে ২ দলের কর্মীদের এলোপাতাড়ি বোমা হামলা। আহত ৬।		
১৫ আগস্ট ২০০৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর বোমা হামলায় স্প্লিন্টারের আঘাতে এক মহিলার হাতের কবজি উড়ে	পুলিশ এ ঘটনায় খতমে নবুয়তের দু'সদস্য গ্রেফতার করে।	

www.pathagar.com

স্থান-কাল	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঘটনা-পরবর্তী অবস্থা	সর্বশেষ অবস্থা
	যায়। পুলিশ পাহারায় একই স্থানে পরপর ৩বার বোমা হামলা ঘটে।		
১৫ আগস্ট ২০০৫ আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়ার খরমপুর মাজার এলাকায় আবার বোমা হামলা।		
১৭ আগস্ট ২০০৫ সারাদেশের ৬৩টি জেলা	রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশ সকাল ১১ টায় বোমায় প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে ৬৩টি জেলার ৩ শতাধিক স্থানে একযোগে প্রায় ৫০০ বোমা বিস্ফোরিত হয়। এতে দু'জন নিহত ও দু'শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। বোমা হামলার টার্গেট ছিল সুপ্রিমকোর্টসহ জেলা আদালতগুলো, বিমানবন্দর, মার্কিন দূতাবাস, ডিসি-এসপি অফিস, প্রেস ক্লাব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো।	ঘটনাস্থলগুলোতে জামা'আতুল মুজাহিদিনের সংশ্লিষ্টতা ও আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা বিষয়ক বক্তব্যসহ লিফলেট পাওয়া যায়। ঘটনার পর সারাদেশে প্রায় শতাধিক মামলা হয়। এর মধ্যে ৫০টির চার্জশিট প্রদান করা হয়। ২ মার্চ ২০০৬ শায়খ আবদুর রহমানকে এবং ৬ মার্চ ২০০৬ সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলাভাইকে গ্রেফতার করা হয়।	১৪ মে ২০০৬ জয়পুরহাটের মামলায় ১০ জনের যাবজ্জীবন, ৩ জনের ২০ বছর জেল এবং ১৪ জনকে মুক্ত করে রায় ঘোষণা করা হয়।
১৯ আগস্ট ২০০৫ টঙ্গীগোপালপুর, মহাজনপুর, মুজিবনগর, মেহেরপুর	বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণ। নিহত ২ জন।	পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।	
৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫ খালিয়া বিল, চিংড়ি ঘের, আশাশুনী সাতক্ষীরা	সন্ত্রাসীদের বোমা নিক্ষেপ। নিহত ১ জন।	মামলা হয়েছে	
৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ বিয়ানীবাজার, সিলেট	উপজেলা সদরে ফজরের নামাজের সময় মসজিদের ভেতরে ও বারান্দায় দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে।	এ ঘটনায় পুলিশ এক শিবিরকর্মী ও এক মাদ্রাসা ছাত্রকে গ্রেফতার করে।	
২ অক্টোবর ২০০৫ সাতক্ষীরা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সাতক্ষীরার বোমা হামলায় এক মৎস্য ব্যবসায়ীসহ ২ জন নিহত ও ৩ জন আহত এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাসপাতালের সামনে বোমা বিস্ফোরণে ৫ জন আহত হন।		
৩ অক্টোবর ২০০৫ চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা	আদালতে বিচারকাজ চলাকালে বেলা ১২টার দিকে তিন জেলাতে একযোগে বোমা হামলা হয়। এজলাসে ঢুকে বিচারককে লক্ষ্য	লক্ষ্মীপুরে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৬ ধারা বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে ৩/৪, ৫/৬ ধারা দন্ডবিধি ৩৩২/৩৪৩ ৩৩৭	তদন্ত ও বিচার কাজ চলছে। জেএমবি উল্লেখিত ৩ জেলায় বোমা হামলা ঘটায়।

www.pathagar.com

	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ		সর্বশেষ অবস্থা
	করে বোমা ছুড়ে মারা হয়। এসব ঘটনায় মোট পাঁচটি বোমা বিস্ফোরিত হয় এবং আরও চারটি অবিস্ফোরিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।	৩৩২, ৪২৭ ৩৪ ধারা মতে মামলা হয়। চাঁদপুর ও চট্টগ্রামে মামলা দায়ের এবং ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এসব ঘটনায় শায়খ আবদুর রহমান, বাংলাভাই, আতাউর রহমান সানি, জাভেদ ইকবাল, আবু জহর, জাহেদুল ইসলাম সুমন, শাহাদাত হোসেন ও লাল্টুকে আসামি করা হয়।	
৮ অক্টোবর ২০০৫ যশোর ও চুয়াডাঙ্গা	যশোর বিএনপি অফিস ও ভোগাইল, ভোগাদি আলমডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা বোমা বিস্ফোরণে আহত যথাক্রমে ১০ ও ২জন।		
৯ অক্টোবর ২০০৫ থানা ভবন, নড়াইল	বোমা বিস্ফোরণে ২ শিশু আহত।		
১৯ অক্টোবর ২০০৫ সিলেট	সিলেটের দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক বিপ্লব গোস্বামীকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা হামলা চালানো হয়। এতে তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও বিস্ফোরিত বোমায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন।		
১৫ নভেম্বর ২০০৫ ঝালকাঠি	সকাল ৯টায় শহরের অফিসার্স পাড়ায় জজেস কোয়ার্টারের সামনে বিচারকদের বহনকারী মাইক্রোবাসের ভেতরে খুব কাছে থেকে শক্তিশালী বোমা ছুড়ে মারা হয়। এতে ঝালকাঠি জজ আদালতের সিনিয়র সহকারী জজ সোহেল আহমেদ চৌধুরী ও জগন্নাথ পাঁড়ে নিহত হন। এ ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পান আরেক বিচারক আব্দুল আউয়াল।	হামলাকারী মামুন (রাজশাহী জেএমবি সদস্য) আহতাবস্থায় নাটকীয়ভাবে গ্রেফতার হয়। ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে ২টি মামলা হয়। মামুন, সুলতান হোসেন খান, শায়খ আবদুর রহমান, আঃ আউয়াল, আতাউর রহমান সানি, সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলাভাই, ওমর মোল্লা (মৃত) ও মেহেদীসহ এই ৮ জনকে আসামি করে চার্জশিট দাখিল হয়। মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করে । ৩ মাস ২০ দিনের মাথায় ২১ মার্চ ২০০৬ চার্জশিট দেয়া হয়।	৩০ মে ২০০৬ মামলার রায়ে ৭ জনের ফাঁসি দেয়া হয়। ফাঁসির দন্ডাদেশপ্রাপ্তরা হচ্ছেন– ১. শায়খ আঃ রহমান, ২. সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলাভাই, ৩. আতাউর রহমান সানি, ৪. আঃ আউয়াল, ৫. মাসুম, ৬. খালিদ, ৭. সাইফুল্লাহ। জেএমবি এ ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করে। ৩০ মার্চ ২০০৭ মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়।

www.pathagar.com

[illegible]	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	[illegible]	সর্বশেষ অবস্থা
৩০ নভেম্বর ২০০৫ গাজীপুর ও চট্টগ্রাম আদালত	পৌনে এক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই জেলার আদালত চত্বরে ইসলামি জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) আত্মঘাতী জঙ্গিরা নিজেদের গায়ে বোমা বেঁধে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দুই জঙ্গিসহ ৯জন নিহত এবং আহত ৭০ জন।	৩ ডিসেম্বর ২০০৫ ২টি মামলা হয়।	
২ ডিসেম্বর ২০০৫ গাজীপুর	আদালত চত্বরে চায়ের ফ্লাস্কে করে বোমা বহন করার সময় একজন নিহত ও পুলিশ আইনজীবী সাংবাদিকসহ ৩০ জন আহত হয়।	হামলাকারী যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়। ২টি মামলা হয়েছে।	
৮ ডিসেম্বর ২০০৫ নেত্রকোনা	সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শহরের অজহর রোডে সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচী ও শতদল কার্যালয়ের সামনে বোমা হামলায় দু'জন সাংস্কৃতিক কর্মীসহ ও ৭ জন নিহত এবং আহত ৫০ জন।	পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে জেএমবির একটি হাতে লেখা চিঠি পায়। এতে ইসলামি আইন চালু করা এবং র‍্যাব-পুলিশের ওপর হামলার হুমকি দেয়া হয়। ২টি মামলা হয়েছে।	জেএমবি এ ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করে।

** ফেব্রুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত তথ্য তালিকাটি হালনাগাদ করা হয়েছে।*

গ্রন্থনা: মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইউনিট ও তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

www.pathagar.com

রাজশাহী-নওগাঁ অঞ্চলে বাংলাভাই বাহিনীর নির্যাতনে নিহত ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকা

(০১ এপ্রিল'০৪ – ২২ জানুয়ারি ০৫)

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	নির্যাতনের ধরন	হত্যার তারিখ	সূত্র
১.	ওয়াসিম ওরফে ওসমান ওরফে বাবু (২৭)	পলাশী, বাগমারী, রাজশাহী	কুপিয়ে ও জবাই করে হত্যা।	১ এপ্রিল ২০০৪	প্রথম আলো, ২৭ এপ্রিল ২০০৪
২.	গোলাম রাব্বানী মুকুল	তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী	অকথ্য নির্যাতনে মৃত্যু হয়। তার আর্ত চিৎকারের শব্দ মাইক দিয়ে প্রচার করা হয়।	১১ এপ্রিল ২০০৪	প্রথম আলো, ২৭ এপ্রিল ২০০৪
৩.	মোবারক হোসেন	বেলঘরিয়া, রানীনগর, নওগাঁ	শারীরিক নির্যাতনে মৃত্যু।	২২ এপ্রিল ২০০৪	প্রথম আলো, ২৭ এপ্রিল ২০০৪
৪.	সাইফুর রহমান	পীরগাছা, নাটোর	শারীরিক নির্যাতনে মৃত্যু।		প্রথম আলো, ২৭ এপ্রিল ২০০৪
৫.	দীপঙ্কর রায় (২১)	কাশিয়াবাড়ী, আত্রাই, নওগাঁ	বেদম মারপিটে মৃত্যু।	২৭ এপ্রিল ২০০৪	প্রথম আলো, ২৯ এপ্রিল ২০০৪; জনকণ্ঠ, ৫ মে ২০০৪
৬.	জনৈক ইউপি দফাদার (২০)	কাশিয়াবাড়ী, আত্রাই, নওগাঁ	মারপিটে মৃত্যু।	২৭ এপ্রিল ২০০৪	জনকণ্ঠ, ২৯ এপ্রিল ২০০৪
৭.	শেখ ফরিদ (অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য)	ভোপাড়া, আত্রাই, নওগাঁ	চাইনিজ কুড়াল দিয়ে মারাত্মকভাবে কুপিয়ে হত্যা।	১ মে ২০০৪	প্রথম আলো, ৩০ এপ্রিল ২০০৪; জনকণ্ঠ, ৫ মে ২০০৪
৮-১০.	অজ্ঞাত ৩ জন	আত্রাই, নওগাঁ	--	--	জনকণ্ঠ, ৫/৫/০৪
১১.	সুফল কুমার সরকার	চামটা, রানীনগর, নওগাঁ	বাংলাভাই ও তার বাহিনী ১২ মে, ০৪ তাকে অপহরণ করে। অদ্যাবধি তিনি নিখোঁজ। তবে পত্রিকান্তরে জানা যায়, তাকে হত্যা করা হয়েছে।	১২ মে, ২০০৪ (সম্ভাব্য)	আসক প্রতিবেদন
১২.	সুশান্ত চন্দ্র সরকার	চামটা, রানীনগর, নওগাঁ	বাংলাভাই ও তার বাহিনী ১২ মে, ০৪ তাকে অপহরণ করে। অদ্যাবধি তিনি নিখোঁজ। তবে পত্রিকান্তরে জানা যায়, তাকে হত্যা করা হয়েছে।	১২ মে, ২০০৪ (সম্ভাব্য)	আসক প্রতিবেদন

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	নির্যাতনের ধরন	হত্যার তারিখ	সূত্র
১৩.	রাবেয়া (৩৮)	নীমপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী	বাংলাভাইয়ের ক্যাডার বাহিনীর সদস্য কর্তৃক ধর্ষণ। পরে আত্মহত্যা করে।	১৩ মে ২০০৪ (ধর্ষণ), ১৪ মে ২০০৪ আত্মহত্যা	প্রথম আলো, ১৭ মে ২০০৪
১৪.	আব্দুল কাইয়ুম ওরফে বাদশা (৪২)	শিম্বা, রানীনগর, নওগাঁ	বগুড়ার নন্দীগ্রাম থানার বামন গ্রামে রাস্তার পাশে গাছে উল্টো করে লাশ ঝুলানো অবস্থায় উদ্ধার।	১৯ মে অপহরণ; ২০ মে ২০০৪ লাশ পাওয়া যায়।	প্রথম আলো, ২১ মে ২০০৪
১৫.	খেজুর আলী	শিম্বা, রানীনগর, নওগাঁ	পিটিয়ে হত্যা। চার টুকরো করে পুঁতে রাখা লাশ উদ্ধার।	১৯ মে ২০০৪	প্রথম আলো, ২৯ মে ২০০৪
১৬.	আফজাল হোসেন (৩৮)	বাঁশবাড়িয়া, রানীনগর, নওগাঁ	পিটিয়ে হত্যা।	২৪ জুন ২০০৪	প্রথম আলো, ২৫ জুন ২০০৪
১৭.	ইয়াসিন আলী মৃধা (২৫) আওয়ামীলীগ নেতা	সাকোয়া, বাগমারা, রাজশাহী	শতশত নারী পুরুষের সামনে পিটিয়ে হত্যা।	৩০ জুন ২০০৪	জনকণ্ঠ, ১ জুলাই ২০০৪
১৮-২০.	৩ জন অজ্ঞাত	বাসুদেবপুর, নাটোর	বাসুদেবপুর লাইনের পাশে লাশ পাওয়া গেছে।	---	জনকণ্ঠ, ২৬ জুলাই ২০০৪
২১.	জিয়াউল হক জিয়া (৩০) এনজিও মাঠকর্মী	ভেটি পুলিশ ক্যাম্প আবাদপুকুর, রানীনগর, নওগাঁ	পিতার সামনে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে হত্যা।	১৪ নভেম্বর ২০০৪	জনকণ্ঠ, ১৮ নভেম্বর ২০০৪
২২.	আলী আকবর (৩৫), বাসদ নেতা	তাহেরপুর পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের, বাগমারা, রাজশাহী	স্ত্রী কন্যার সামনে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা।	২৭ নভেম্বর ২০০৪	ভোরের কাগজ, ডেইলি স্টার, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৪
২৩.	জরিনা (৪৫)	দাশপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী	নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা।	৪ জানুয়ারি ২০০৫	জনকণ্ঠ, ৫ জানুয়ারি ২০০৫
২৪.	মাহবুবুর রহমান (৩৪) আওয়ামী	শ্রীপুর, বাগমারা, রাজশাহী	বাংলাভাই ক্যাডারদের গুলিতে নিহত।	২২ জানুয়ারি	ইত্তেফাক, ২৫ জানুয়ারি ২০০৫

মোট - ২৪ জন

তথ্যসূত্র: তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট ও কমিউনিকেশন ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

www.pathagar.com

ঘটনাপ্রবাহ

সূত্র: বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা
সময়কাল: ১৮ আগস্ট ২০০৫ থেকে ১ এপ্রিল ২০০৭

সংবাদ, ১৮ আগস্ট ২০০৫

একসঙ্গে কেঁপে উঠলো ৬৩ জেলা।

জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিনের পরিকল্পিত বোমা বিস্ফোরণে একসঙ্গে কেঁপে ওঠে ঢাকাসহ দেশের ৬৩টি জেলা। তবে মুন্সীগঞ্জে এ ধরনের বোমা বিস্ফোরণের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। গতকাল সকাল ১১টা থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে। মোট ৪২২টি স্পটে ৪৩৭টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এছাড়া অবিস্ফোরিত অবস্থায় কমপক্ষে ৪৬টি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। ঢাকার বাইরে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে সবচেয়ে বেশি ২০টি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় ২ জন নিহত হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৮ আগস্ট ২০০৫

কেন আদালতে বোমা হামলা? বিচারব্যবস্থাই জামা'আতুলের মূল টার্গেট।

জামা'আতুল মুজাহিদিনের মূল টার্গেট হলো বিচারব্যবস্থা। গতকাল সুপ্রিম কোর্ট চত্বরসহ দেশের সবগুলো আদালত অঙ্গনের ভেতরে-বাইরে বোমা বিস্ফোরণের পরপরই ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকৃত লিফলেট থেকেই জানা যায় এ তথ্য।

জনকণ্ঠ, ২০ আগস্ট ২০০৫

বোমা হামলার তদন্ত ভিন্নখাতে ঘুরিয়ে দেয়া হচ্ছে! জঙ্গি গ্রেফতার অভিযানে ভাটা।

সারাদেশে একযোগে নজিরবিহীন বোমা হামলার তদন্ত কাজ ভিন্ন খাতে ঘুরিয়ে দেয়া হচ্ছে! স্তিমিত হয়ে পড়েছে হামলার ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজন ইসলামি জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিনের সদস্যদের গ্রেফতার অভিযান। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা জঙ্গিদের গ্রেফতারে উদাসীন হলেও বোমা কানেকশনে ফাঁসানো হচ্ছে বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষকে। সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতারের পর তাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ বাহবা নেয়ার চেষ্টা করছে। অথচ জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় বোমা হামলার সময় জঙ্গি সন্দেহে যাদের আটক করা হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা না করে পুলিশ তাদের ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে রিমান্ডে নিয়েছে। পুলিশের মাঠ পর্যায় থেকে বোমা হামলা সংক্রান্ত মামলা ও গ্রেফতারের বিবরণী উল্লেখ করে ঊর্ধ্বতন মহলে যে প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে তা থেকে মিলেছে এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য।

প্রথম আলো, ২০ আগস্ট ২০০৫

জামা'আতুল প্রধান আবদুর রহমানের নির্দেশে বোমা হামলা হয়েছে। ১৪ জঙ্গির স্বীকারোক্তি। মোট গ্রেফতার ১২০।

দেশ কাঁপানো ভয়াবহ বোমা হামলার নেতৃত্ব দিয়েছেন জামা'আতুল মুজাহিদিনের প্রধান নেতা জামালপুরের শায়খ আবদুর রহমান। তার দীক্ষা নেয়া কয়েকশ' জঙ্গি এ অভিযানে অংশ নিয়েছে। বোমা হামলার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে ধরা পড়া ১৪ জঙ্গি পুলিশের কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তিতে এ কথা বলেছে। পুলিশ জানায়, গতকাল দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২ জঙ্গি, এর আগের দিন সাতক্ষীরায় ২জন জঙ্গি একই ধরনের স্বীকারোক্তি দিয়েছে এবং এরা সবাই ১৬৪ ধারায় আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে।

যুগান্তর, ২১ আগস্ট ২০০৫

বোমা হামলা: যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু। গ্রেফতারকৃতদের স্বীকারোক্তি। নেতারা ধরাছোঁয়ার বাইরে।

যৌথ জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা স্বীকার করেছে, তারা জামা'আতুল মুজাহিদিনের কর্মী। তাদের সূত্র ধরে গোয়েন্দারা

www.pathagar.com

এখন জঙ্গি সংগঠনগুলোর নেতাদের ধরার চেষ্টা করছে। গতকাল পর্যন্ত বোমা কানেকশনে ১২৩ জনকে গ্রেফতার করা হলেও এখন পর্যন্ত জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিন বা তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর কোনো নেতাকে গ্রেফতার করা যায়নি। এদিকে হামলার দু'দিন পরও সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল স্পষ্ট করে কিছুই বলতে পারছে না যে, সেদিন আসলে কী ঘটেছিল।

প্রথম আলো, ২১ আগস্ট ২০০৫

বারবার ধরা পড়ে আর ছাড়া পায় জঙ্গিরা।

কয়েক বছরে পাঁচ শতাধিক জঙ্গি গ্রেফতার হলেও প্রশাসনের নমনীয় ভূমিকার সুযোগে বাংলাভাইসহ জঙ্গিবাদের সমর্থকরা ছাড়া পেয়ে গেছে। এবারও প্রশাসনের নমনীয় ভূমিকায় ও আইনের ফাঁক গলে এসব দুষ্কৃতকারী ও তাদের মাথারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে কিনা সে সন্দেহ করছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রথম আলো, ২১ আগস্ট ২০০৫

ঢাকায় ৩২ জঙ্গিকে জেরা। সবাই বলছে আবদুর রহমান তাদের নেতা।

দেশজুড়ে একযোগে বোমা হামলায় ধরা পড়া ৩২ জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকায় আনা হয়েছে। গতকাল শনিবার থেকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ সেলের (জেআইসি) কর্মকর্তারা তাদের জেরা শুরু করেছেন। জেআইসির কর্মকর্তারা জানান, জঙ্গিরা সবাই হামলার ঘটনা সম্পর্কে প্রায় একই কথা বলছে। তারা বলছে, আবদুর রহমান তাদের নেতা এবং তার নির্দেশেই এ হামলা হয়েছে। গত ছয় মাস ধরে হামলার প্রস্তুতি চলে বলে তারা জানায়।

প্রথম আলো, ২১ আগস্ট ২০০৫

বোমা হামলার আগে বাগমারায় তিনটি গোপন বৈঠক। জামিনে থাকা অর্ধশত বাংলাভাই ক্যাডার গা ঢাকা দিয়েছে।

জামিনে থাকা মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে কিলার মোস্তাক, মাদ্রাসা শিক্ষক আবদুস সাত্তার ও আবদুস সোবহানসহ বাংলাভাইয়ের অর্ধশত ক্যাডার গত বুধবার বোমা হামলার আগে হঠাৎ এলাকা থেকে উধাও হয়ে যায়। জঙ্গিদের মধ্যে যারা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে, তারা আগেই ছুটি নেয় নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে। রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) সক্রিয় এসব জঙ্গি গতকাল শনিবার পর্যন্ত এলাকায় ফেরেনি। বোমা হামলার পর পুলিশ তাদের খোঁজে এলাকায় একাধিকবার হানা দিয়েও পায়নি।

যুগান্তর, ২২ আগস্ট ২০০৫

দেশজুড়ে বোমা হামলা: ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন।

রাজধানী ঢাকাসহ দেশজুড়ে বোমা হামলায় জড়িত সন্দেহে আটককৃতদের নিয়মিত মামলায় গ্রেফতার না দেখিয়ে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ফলে ৫৪ ধারার প্রয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। উচ্চ আদালতের দিকনির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ কেন ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারাকে জঙ্গি গ্রেফতারে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে? প্রশ্ন উঠেছে, আসলে পুলিশ গ্রেফতারকৃতদের বাঁচাতে চাচ্ছে নাকি ফাঁসাতে চায়? ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম বোমা হামলায় জড়িতদের পক্ষে আদালতে শুনানি পরিচালনাকালে যুক্তি দেখিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন সেখান থেকেই এ প্রশ্নটির অবতারণা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আটককৃতদের নিয়মিত মামলায় গ্রেফতার না দেখিয়ে কেন বারবার ৫৪ ধারায় নিমান্ডে নেয়া হচ্ছে?

ভোরের কাগজ, ২২ আগস্ট ২০০৫

তালেবানি বিপ্লবের প্রশিক্ষণ দিয়েছে এক বিদেশীসহ কয়েক মওলানা। ৩২ জামা'আতুল জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

রাজধানীসহ দেশের ৬৩টি জেলায় গত ১৭ আগস্ট একযোগে টাইম বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতারের পর ঢাকায় বিশেষজ্ঞ সেলে জিজ্ঞাসাবাদে ৩২ জঙ্গি গতকালও চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে। তবে তারা বোমা হামলার

www.pathagar.com

পরিকল্পনা এবং সরবরাহকারীদের ব্যাপারে তথ্য দিলেও জামা'আতুল মুজাহিদিনের আধ্যাত্মিক নেতা শায়খ আব্দুর রহমানের অবস্থান সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিচ্ছে। এছাড়া তারা বোমা এবং লিফলেটের উৎসস্থল সম্পর্কে এখনো কোনো তথ্য দেয়নি। নাটের গুরুদের ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই সে ব্যাপারে তারা কিছু না জানার কথা বলছে। এদের মধ্যে কয়েকজন তাদের সঙ্গে শায়খ আবদুর রহমানের সাক্ষাতের কথা স্বীকার করে গোয়েন্দাদের জানিয়েছে আরও কয়েকজন মওলানার নাম, যারা তাদের তালেবানি বিপ্লব সংঘটনের জন্য জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এর মধ্যে তিনজন বিদেশি নাগরিকের কথাও তারা বলেছে, যাদের মধ্যে একজন দীর্ঘদিন ঢাকায় অবস্থান করে উত্তরার একটি বাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণের দিকনির্দেশনা দিয়েছে। অপর দুই বিদেশি কুষ্টিয়া ও সাতক্ষীরায় জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

প্রথম আলো, ২৪ আগস্ট ২০০৫

মাওলানা মাসউদ রিমান্ডে। মাদ্রাসায় তল্লাশি। নিজামীকে রিমান্ডে নিলে বোমা হামলার রহস্য উদ্ঘাটন হবে।

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের একাংশের নেতা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক পরিচালক মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদকে গ্রেফতারের পর পুলিশ গতকাল তার মাদ্রাসা থেকে বিপুল পরিমাণ বইপত্র ও সিডি উদ্ধার করেছে। খিলগাঁও ঝিলপাড় মাদ্রাসায় অভিযানকালে তার ব্যক্তিগত সহকারী আবদুল আলিমকে গ্রেফতার করা হয়। মাওলানা মাসউদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ সেল (জেআইসি) তাকে জেরা করবে। গতকাল মাওলানা মাসউদ আদালতে বলেন, এটা স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর কাজ। জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামীকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বোমা হামলার মূল রহস্য উদ্ঘাটন হবে।

ভোরের কাগজ, ২৫ আগস্ট ২০০৫

শায়খ আবদুর রহমান বোমা হামলার প্রধান আসামি: আরও ৪ জঙ্গি গ্রেফতার। বিশেষজ্ঞ সেলে ৪ জনের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি।

রাজধানীসহ দেশের ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা হামলার ঘটনায় গতকাল বুধবার জামা'আতুল মুজাহিদিনের প্রধান শায়খ আবদুর রহমানকে প্রধান আসামি করে ৫টি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। সাতক্ষীরা থানায় এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে ঢাকায় সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা গতকাল বুধবার সন্দেহভাজন আরও ৪ জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সময় গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন এদের গ্রেফতার করে। এরা সবাই সারাদেশে সিরিজ বোমা হামলায় জড়িত জামা'আতুল মুজাহিদিনের বিভিন্ন পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতা বলে একটি সূত্র জানায়। এছাড়া বোমা হামলার ঘটনার পর গ্রেফতারকৃতদের মধ্য থেকে ৪ জন গতকাল বিশেষজ্ঞ সেলের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। তারা জবানবন্দিতে বোমা হামলার ঘটনায় নিজেদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

ভোরের কাগজ, ২৬ আগস্ট ২০০৬

জঙ্গি কানেকশন পাওয়া গেলেও জামায়াতের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেই। রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা করার মতো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ!

রাজধানীসহ দেশের ৬৩টি জেলার ৪১০টি স্থানে ১৭ আগস্ট একই সময়ে ধারাবাহিক টাইম বোমা হামলার ঘটনা তদন্তে নেমে পুলিশ ও গোয়েন্দারা জামায়াতে ইসলামীর জঙ্গি কানেকশনের ব্যাপারে নিশ্চিত হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো 'অ্যাকশন' নেয়া হচ্ছে না রহস্যজনক কারণে। উপরন্তু বোমা হামলার পর সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে যেসব জামায়াত নেতাকর্মী রয়েছে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। কাউকে বিশেষ ব্যবস্থায় ছেড়ে দেয়া হচ্ছে, আবার কাউকে বোমা হামলার মামলায় গ্রেফতার না দেখিয়ে ৫৪ ধারায় আদালতে পাঠানো হচ্ছে।

জনকণ্ঠ, ২৬ আগস্ট ২০০৫

চাপের মুখে বোমার মামলা সিআইডিতে।

জোটের শরিকদের চাপের মুখে ৬৩ জেলার সব বোমা হামলার মামলা সংশ্লিষ্ট থানাগুলো থেকে নিয়ে সিআইডির হাতে তুলে

www.pathagar.com

দেয়া হয়েছে। দেশব্যাপী বোমা হামলাকারী ইসলামি জঙ্গিদের শনাক্ত ও গ্রেফতার অভিযান শিথিল করা হয়েছে। ৬৩টি জেলার প্রতিটিতে পুলিশ সুপারকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তও কার্যকর হয়নি। পুলিশের এসবির প্রধান অতিরিক্ত আইজিকে প্রধান করে গঠিত তদন্ত কমিটির কার্যক্রমও শিথিল হয়ে পড়েছে।

প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট ২০০৫

বোমা আসে ঝালকাঠি থেকে। বণ্টন হয় ইসলামি এনজিওতে বসে। বরিশালে জিজ্ঞাসাবাদে কর্মচারীর চাঞ্চল্যকর তথ্য।

বরিশালে বোমাগুলো আনা হয়েছিল ঝালকাঠি থেকে। সেগুলো মজুদ রাখা হয় বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) আল ইকরাম ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থার কার্যালয়ে। সেখান থেকেই বণ্টন করা হয়। হামলার আগের দিন গত ১৬ আগস্ট ওই কার্যালয়ে চূড়ান্ত বৈঠক হয়। ১৮ আগস্ট আরেক দফা বৈঠক। পুরো কাজের সমন্বয় করেন ওই এনজিওর নির্বাহী পরিচালক জিয়াউর রহমান জিয়া।

প্রথম আলো, ২৮ আগস্ট ২০০৫

বোমা হামলার আগে টাঙ্গাইলের মাদ্রাসায় জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ হয়। জিজ্ঞাসাবাদে কয়েকজনের স্বীকারোক্তি।

১৭ আগস্ট বোমা হামলার আগে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে কয়েকটি মাদ্রাসায় জঙ্গিদের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ হয়। জঙ্গি নেতা আবদুর রহমানের নির্দেশে জামা'আতুল মুজাহিদিনের কমান্ডাররা এ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। সেখানে জঙ্গিদের গ্রেনেড নিক্ষেপেরও শিক্ষা দেয়া হয়। খাগড়াছড়ির দীঘিনালা থেকে গ্রেফতার করা জঙ্গি শহিদুল ইসলাম ও এমদাদ হক পুলিশ এবং যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ সেলের (জেআইসি) কাছে এ তথ্য প্রকাশ করে।

জনকণ্ঠ, ২৯ আগস্ট ২০০৫

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কওমি মাদ্রাসায় দিনে কারাতে। রাতে চলে জঙ্গি প্রশিক্ষণ।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ চলছে। মাদ্রাসার কিছু শিক্ষক শারীরিক প্রশিক্ষণের নামে ছাত্রদের কারাতে শেখায়। এটা দিনের বেলায় শেখানো হলেও রাতে অনেক মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ চলে বলে মানুষ জানায়। ১৭ আগস্ট বোমা হামলার পর অনেক স্থানে এ প্রশিক্ষণ বন্ধ রয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২ সেপ্টেম্বর ২০০৫

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

রাজধানীসহ দেশের ৬৩টি জেলায় গত ১৭ আগস্ট একযোগে সিরিজ টাইম বোমা হামলার ঘটনায় বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেফতারকৃতদের মধ্য থেকে ১৬ জনকে এখন ঢাকায় বিশেষজ্ঞ সেলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে প্রত্যেকেই বোমা হামলার জন্য জামা'আতুল মুজাহিদিনের শীর্ষনেতা শায়খ আব্দুর রহমানকে নির্দেশদাতা উল্লেখ করেছে। কিন্তু কেউই বোমা তৈরির সরঞ্জাম কোথা থেকে এসেছে এবং কারা বোমা তৈরি করে বিতরণ করেছে সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো তথ্য দেয়নি।

যুগান্তর, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫

যশোরে গোয়েন্দা ও পুলিশের জঙ্গিবিরোধী অভিযান থেমে গেছে।

যশোরে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের জঙ্গিবিরোধী অভিযান থেমে গেছে। এখানে সিরিজ বোমা হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাগুলোর তদন্তেরও কোনো অগ্রগতি নেই। পুলিশ আজ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত কোনো ক্লু উদ্ধার করতে পারেনি। অথচ থেমে নেই মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলো।

সংবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫

জঙ্গিদের স্বীকারোক্তি: বোমা হামলায় জড়িত বাংলাভাই, আবদুর রহমান। সহযোগিতায় জনযুদ্ধ।

খাগড়াছড়িতে আটক জামা'আতুল মুজাহিদিনের জঙ্গি সদস্যরা দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার ঘটনায় বাংলাভাই ও

www.pathagar.com

শায়খ আবদুর রহমানের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। গতকাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ১৬৪ ধারায় দেয়া জবানবন্দিতে ওই জঙ্গিরা আরও জানায়, এ ঘটনায় তাদের সহযোগিতা করেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত জনযুদ্ধ।

ভোরের কাগজ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৫

জঙ্গি বোমায় জামায়াত কানেকশন ফাঁস। নির্দেশনা না থাকায় খতিয়ে দেখছে না গোয়েন্দারা।

ঢাকায় গ্রেফতারকৃত ৭ জঙ্গির কাছ থেকে উদ্ধারকৃত বইপত্র এবং জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্য থেকে গত ১৭ আগস্ট সারাদেশে বোমা হামলার সঙ্গে ক্ষমতাসীন চারদলীয় ঐক্যজোটের শরিক জামায়াতে ইসলামীর সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি বেরিয়ে আসছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ গোড়ানের হাওয়াই রোডের ৩৬০/১ নম্বর বাসা থেকে গোয়েন্দারা বোমা তৈরির সরঞ্জামের সঙ্গে বেশ কয়েকটি পুস্তক উদ্ধার করেছে। এর মধ্যে ৮টি বই ধর্মীয় বিপ্লব সংক্রান্ত জামায়াতের প্রকাশনা বলে ধারণা করছেন গোয়েন্দারা।

যুগান্তর, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫

চট্টগ্রামে দশ জঙ্গির অবস্থান। পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না কাউকে।

চট্টগ্রামে সশস্ত্র জঙ্গিদের সংঘবদ্ধ নেটওয়ার্ক অক্ষতই রয়ে গেছে। জেএমবির প্রায় দু'শ' সক্রিয় জঙ্গি কর্মী চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থান করলেও পুলিশ রহস্যজনক কারণে কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না। ফলে বন্দরনগরীতে আবার বোমা হামলার আশঙ্কায় শঙ্কিত প্রশাসন। নাশকতার আশঙ্কায় প্রতিদিন সকালে নগরীর অর্ধশতাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় চলছে পুলিশের সুইপিং (ঝটিকা তল্লাশি)। গ্রহণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থা। জঙ্গি নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করতে গোয়েন্দা পুলিশের চরম ব্যর্থতায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও ক্ষুব্ধ। ইতোমধ্যে এক প্রজ্ঞাপনে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, চট্টগ্রামে নাশকতামূলক যে কোনো কর্মকান্ডের জন্য মহানগর পুলিশ প্রশাসন দায়ী থাকবে। ১৭ আগস্ট বোমা হামলার আগে ও পরে নগর গোয়েন্দা পুলিশের রহস্যজনক কর্মকান্ড সরকারের উচ্চমহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। সিরিজ বোমা হামলার চারদিন আগে সিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ তাদের রিপোর্টে জানিয়েছিল, চট্টগ্রামে জঙ্গি তৎপরতার কোনো অস্তিত্ব নেই। এ রিপোর্ট দেয়ার চার দিনের মাথায় সিরিজ বোমা হামলার ঘটনা ঘটে।

জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০৫

জঙ্গিদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান করে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হচ্ছে।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার সম্পন্ন ও সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে জঙ্গি বোমারাজ দমনে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। বিশেষ সন্ত্রাস দমন আইন হিসেবে প্রস্তাবিত এ আইনের খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করেছে আইন মন্ত্রণালয়। এটি হবে দেশে সন্ত্রাস দমন বিষয়ক দশম বিশেষ আইন। আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ বলেছেন, বোমাবাজি বা এ ধরনের সন্ত্রাস দমনের জন্যই এ আইনের কথা ভাবা হচ্ছে।

ইত্তেফাক, ১৩ অক্টোবর ২০০৫

দেশব্যাপী বোমা বিস্ফোরণ মামলার বিচার একই সময়ে শুরু হচ্ছে

গত ১৭ আগস্ট রাজধানীসহ দেশের ৬৩ জেলায় ৪৩৪টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় দায়ের করা ১৫২টি মামলার বিচার কার্যক্রম প্রায় একই সময়ে শুরু হতে যাচ্ছে। তদন্তকারী সর্বোচ্চ সংস্থা অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডি পর্যায়ক্রমে চার্জশিট দেয়া শুরু করেছে। গোয়েন্দা পুলিশ বলছে, রাজধানীতে বোমা বিস্ফোরণের ১৮টি মামলার চার্জশিট এ মাসের শেষ সপ্তাহে দেয়া হবে।

ভোরের কাগজ, ২৭ অক্টোবর ২০০৫

গ্রেফতারকৃত সব জঙ্গির বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা! চট্টগ্রামের ৬ মামলা পুনরুজ্জীবিত করার নির্দেশ।

দেশব্যাপী সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ এবং জাগ্রত মুসলিম জনতা

www.pathagar.com

বাংলাদেশের গ্রেফতারকৃত প্রায় ৩৫০ জন জঙ্গির বিরুদ্ধে সরকার পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। এর আগে শুধু এ বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার মূল হোতা শায়খ আবদুর রহমান ও সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাইয়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হয়েছিল।

যুগান্তর, ১ নভেম্বর ২০০৫

১৭ আগস্ট দেশজুড়ে বোমা হামলা। অর্ধশত মামলার তদন্তে অগ্রগতি নেই। চার্জশিট হয়েছে ৩৬টির।

সারাদেশে ১৭ আগস্ট বোমা হামলায় দায়ের করা অর্ধশত মামলার তদন্তে কোনো অগ্রগতি হয়নি। ১৫৪টি মামলার মধ্যে গত আড়াই মাসে মাত্র ৩৬টি মামলার চার্জশিট দেয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, আজ ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সব মামলার চার্জশিট দেয়ার একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে আরও ২০টি মামলার চার্জশিট প্রায় চূড়ান্ত। আরও ৯৮টি মামলার চার্জশিট চূড়ান্ত করতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।

যুগান্তর, ৯ নভেম্বর ২০০৫

সিলেটে সিরিজ বোমা হামলার চার্জশিটে পরিকল্পনাকারীরা বাদ।

সিলেটে সিরিজ বোমা হামলার প্রথম চার্জশিট দাখিল হয়েছে গতকাল। কালেক্টরেট ভবনে বোমা হামলার এই চার্জশিট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে হামলার মূল পরিকল্পনাকারী দেলওয়ার ও মুরাদকে। কোতোয়ালি থানার সাব-ইন্সপেক্টর শওকত হোসেন সন্ধ্যায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এ চার্জশিট দাখিল করেন।

প্রথম আলো, ৯ নভেম্বর ২০০৫

নিষিদ্ধ আল হিকমার প্রধান কাওসার ফের জামিনে মুক্ত।

রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে দায়ের করা দ্বিতীয় মামলা থেকেও জামিন পেয়েছেন নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামি জঙ্গি সংগঠন শাহাদাত-ই-আল হিকমার চেয়ারম্যান কাওসার হোসাইন সিদ্দিকী। গত ২ নভেম্বর তার জামিন মঞ্জুর হয় এবং পরদিন তিনি জেল থেকে ছাড়া পান।

জনকণ্ঠ, ২৬ নভেম্বর ২০০৫

১৭ আগস্টের বোমা হামলা: নড়াইলে চার্জশিট দাখিল। শায়খ রহমান, বাংলাভাইয়ের নাম নেই।

নড়াইলে ১৭ আগস্টের বোমা হামলা মামলার চার্জশিট পুলিশ দাখিল করেছে। এতে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে ৪ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হলেও জঙ্গি নেতা শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলাভাইয়ের নাম নেই।

জনকণ্ঠ, ২৭ নভেম্বর ২০০৫

গাইডলাইনের বাইরে হাত বাড়াতে পারছে না বোমা হামলা তদন্তকর্তা।

১৭ আগস্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলার মধ্যে শতাধিক মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিমশিম খাচ্ছেন। বিশেষ মহলের বাইরে হাত বাড়াতে পারছেন না তারা। গোয়েন্দা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের হাত-পায়ে বেড়ি পরিয়ে সুষ্ঠু তদন্ত করার কথা বলা হচ্ছে। এতে প্রকৃত জঙ্গিদের শনাক্ত এবং গ্রেফতার করা সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চার্জশিট দিতে বাধ্য করায় তদন্তকারী কর্মকর্তারা পড়েছেন শাখের করাতে। ফলে সিরিজ বোমা হামলার এমন নজিরবিহীন অপরাধের তদন্ত কার্যক্রম নিয়ে লেজেগোবরে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ, ৫ জানুয়ারি ২০০৬

জঙ্গি আলামত ধ্বংস করার তড়িঘড়ি আয়োজন।

১৭ আগস্ট এবং পরবর্তী সময়ে দেশজুড়ে জঙ্গিদের হামলায় ব্যবহৃত অথবা তাদের আস্তানা থেকে উদ্ধার করা বোমা ও বিস্ফোরক ধ্বংস করার সরকারি আগ্রহ নিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর গতকাল

www.pathagar.com

পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন, আদালতের অনুমতি নিয়ে আগামী ৭ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে এসব বোমা, অস্ত্র ও বিস্ফোরক ধ্বংস করার জন্য। দেশের বিশিষ্ট আইনজীবীরা বলছেন, এসব জিনিস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার আলামত। এসব আলামত ধ্বংস করতে নিম্ন আদালতকে প্রভাবিত করা হতে পারে বলেও তারা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

সংবাদ, ৬ জানুয়ারি ২০০৬

জঙ্গি হামলার প্রতিবেদনে অসঙ্গতি: হাইকোর্টে সম্পূরক রিট।

বার কাউন্সিলের হিউম্যান রাইটস কমিটি গতকাল জঙ্গি হামলার প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করা সংক্রান্ত আদেশের জন্য একটি সম্পূরক রিট আবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেছেন। গতকাল এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তারা আদালতে দাখিল করা সরকারের তদন্ত রিপোর্টের বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরেন।

ভোরের কাগজ, ১০ জানুয়ারি ২০০৬

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় শায়খ রহমানসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে নাটোরে চার্জশিট।

জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) প্রধান শায়খ আবদুর রহমানসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় নাটোরের আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশ। মামলায় জেএমবি প্রধান সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলাভাই ও আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের প্রধান ড. আসাদুজ্জামান গালিবকে আসামি করা হলেও চার্জশিটে তাদের বাদ দেয়া হয়েছে।

জনকণ্ঠ, ১৪ জানুয়ারি ২০০৬

নারায়ণগঞ্জে শায়খ আবদুর রহমান ও বাংলাভাইসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে গোপনে চার্জশিট।

১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলায় নারায়ণগঞ্জ শহরের জনাকীর্ণ ৫টি পয়েন্টে ৭টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার ৪ মাস ২২ দিন পর ঈদের ডামাডোলের মধ্যে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে সোমবার বিকেলে শায়খ আবদুর রহমান, বাংলাভাই, সানিকে আসামি করে পুলিশ ২টি পৃথক চার্জশিট দাখিল করেছে। কর্মকর্তা হিসেবে নারায়ণগঞ্জ সদর থানার ওসি মোঃ আব্দুল হান্নান ও ফতুল্লা থানার ওসি শফিকউল্লাহ আদালতে এই চার্জশিট দুটি দাখিল করেন। ঈদের ছুটির পূর্বমুহূর্তে তড়িঘড়ি করে গোপনীয়তার সঙ্গে এই চার্জশিট দাখিল রহস্যের সৃষ্টি করেছে।

সংবাদ, ১৪ জানুয়ারি ২০০৬

চট্টগ্রামে জঙ্গি কমান্ডারের স্বীকারোক্তি: জেএমবির একজন সদস্য বেঁচে থাকলেও জঙ্গি হামলা চলবে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামি সংগঠন জেএমবির চট্টগ্রাম অঞ্চলের অপারেশনাল কমান্ডার জাভেদ ইকবাল ওরফে মোহাম্মদ বলেছে, যতদিন পর্যন্ত জেএমবির একজন সদস্য জীবিত থাকবে, ততদিন তাদের জঙ্গি হামলা অব্যাহত থাকবে। প্রচলিত শাসনব্যবস্থা নয়– কোরান-হাদিসের আলোকে ইসলামি হুকুমত কায়েম করাই হচ্ছে জেএমবির মূল লক্ষ্য। শায়খ আবদুর রহমান হচ্ছে জেএমবির শীর্ষ নেতা। তার ছোট ভাই আতাউর রহমান সানি হচ্ছে তাদের সামরিক প্রধান। সানির নির্দেশেই দেশব্যাপী বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার প্রায় ২ ঘণ্টাব্যাপী ১৬৪ ধারায় দেয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়ার সময় জঙ্গি নেতা জাভেদ ইকবাল ওরফে মোহাম্মদ এসব কথা বলেছে।

যুগান্তর, ১৬ জানুয়ারি ২০০৬

জঙ্গিদের বিচার প্রক্রিয়া মন্থর, তদন্ত দুর্বল: পুরোটাই আইওয়াশ।

জঙ্গিদের বিচার কার্যক্রমের গতি খুবই মন্থর। গত পাঁচ মাসে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জঙ্গিদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা যায়নি। মামলার দুর্বল তদন্তের কারণে ভবিষ্যতে জঙ্গিদের অনেকেই ছাড়া পেয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন আইনজীবীরা। জঙ্গিদের দ্রুত বিচার করার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিয়তই ঘোষণা দেয়া হলেও বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

ইনকিলাব, ১৮ জানুয়ারি ২০০৬

সিলেটে জঙ্গিবিরোধী অভিযান ঝিমিয়ে পড়েছে: মামলার তদন্ত হিমাগারে।

সিলেটে জঙ্গিবিরোধী অভিযান ঝিমিয়ে পড়েছে। ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলার তদন্ত কার্যক্রম থমকে গেছে। বোমা হামলার ৩ মাসের মধ্যে ৩টি মামলার চার্জশিট আদালতে দায়সারাভাবে দাখিল করা হলেও অন্য ৭টি মামলা এখনও আঁতুড়ঘরে। দীর্ঘ ৫ মাসেও মামলাগুলোর চার্জশিট আদালতে জমা দিতে পারেনি তদন্তকারী কর্মকর্তারা।

প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারি ২০০৬

জঙ্গি অর্থায়ন বন্ধে আইন তৈরির জন্য চাপ বাড়ছে।

জঙ্গিগোষ্ঠীর সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়নসহ অর্থের সব ধরনের অপব্যবহার বন্ধ করতে সক্রিয় আইন তৈরি ও তা দ্রুত কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশের ওপর চাপ বাড়ছে। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় অবিলম্বে এ রকম একটি আইন জাতীয় সংসদে পাস হোক।

ভোরের কাগজ, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

জেহাদ করতেই বোমা ফাটাই, টাকা আসে লন্ডন থেকে।

আদালতে জঙ্গি কমান্ডার আউয়াল ও সানির জবানবন্দি নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ডার ও সংগঠনটির প্রধান শায়খ আবদুর রহমানের জামাতা আবদুল আউয়াল ও জেএমবির সামরিক কমান্ডার আতাউর রহমান সানি বুধবার ১৬৪ ধারায় আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে। আউয়াল জানিয়েছে, সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মুসলমানদের বাঁচাতেই আমরা জেহাদের ডাক দিই। আমরা মানুষের তৈরি আইনকে পরাজিত করে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৭ আগস্ট ও তার পরে দেশের আদালত এবং অন্যত্র বোমা হামলা চালিয়েছি।

ইত্তেফাক, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

এক মাসের মধ্যে জেএমবি বোমা হামলা মামলার চার্জশিটদানের নির্দেশ।

নিষিদ্ধ ঘোষিত জেএমবির আত্মঘাতী জঙ্গিদের বোমা হামলা মামলার চার্জশিট আগামী একমাসের মধ্যে আদালতে দাখিল করার জন্য পুলিশকে সময় বেঁধে দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। একই সময়ের ভেতরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তাহের হত্যা মামলার চার্জশিটও দাখিল করতে হবে। গতকাল সোমবার চাঞ্চল্যকর মামলার তদন্ত সম্পর্কে গঠিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেলের বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

যুগান্তর, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

ঝালকাঠিতে দুই বিচারক হত্যা মামলার রায়। শায়খ রহমান ও বাংলাভাইসহ চারজনের ৪০ বছর কারাদণ্ড।

ঝালকাঠিতে জেএমবির বোমা হামলায় দুই বিচারক নিহত হওয়ার ঘটনায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দায়ের হওয়া মামলার চূড়ান্ত রায় দিয়েছেন আদালত। বরিশাল দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক আ. মতিন সোমবার ঐ রায় দেন। রায়ে মামলার অন্যতম আসামি শায়খ আবদুর রহমান ওরফে আবদুল্লাহ, সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই, মোল্লা ওমর ওরফে শাকিল আহম্মেদ এবং আমজাদ ওরফে খালিদ সাইফুল্লাকে ৪০ বছর করে কারাদণ্ড দেয়া হয়। অপর আসামি সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বেকসুর খালাস দেয়া হয় তাকে। উল্লেখ্য, এই মামলার অপর ৩ আসামি আতাউর রহমান সানি, আবদুল আউয়াল এবং ইফতেখার হাসান আল মামুনকে আগেই ৪০ বছর করে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

প্রথম আলো, ১ মার্চ ২০০৬

ঝিনাইদহে ২১ ও সিলেটে এক জেএমবি জঙ্গির ফাঁসির আদেশ।

ঝিনাইদহে ১৭ আগস্টের বোমা বিস্ফোরণ মামলায় ২১ জঙ্গির ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছে। ঝিনাইদহ দ্রুত বিচার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালতের সিনিয়র বিচারক সা কা ম আনিছুর রহমান খান গতকাল মঙ্গলবার এ রায় দেন।

www.pathagar.com

প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০০৬

জঙ্গি রহমানের অসহায় আত্মসমর্থন।

আগের দিনই তিনি জোর গলায় বলেছিলেন, 'জিহাদ করব শহীদ হবো, তবু আত্মসমর্পণ করব না।' তার কাছে এই শিক্ষা পেয়ে ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চার শিষ্য আত্মাহুতি দিয়েছে। কিন্তু নিজের বেলায় শায়খ আবদুর রহমান আত্মাহুতির ঘোষণা ২৪ ঘণ্টাও রক্ষা করতে পারেননি। জোর করে ঘরে ঢুকে গ্রেফতারের ব্যাপারে র‍্যাব ও পুলিশের হুমকির মুখে নতি স্বীকার করে অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করেছেন দেশে বোমা সন্ত্রাসের অন্যতম হোতা জঙ্গি নেতা শায়খ আবদুর রহমান।

প্রথম আলো, ৬ মার্চ ২০০৬

শায়খ রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হচ্ছে।

সংবিধান এবং প্রচলিত বিচারব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য সারাদেশে পরিকল্পিত বোমা বিস্ফোরণ ও হত্যাযজ্ঞ ঘটানোর অভিযোগে সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদের হোতা শায়খ আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হচ্ছে।

প্রথম আলো, ১০ মার্চ ২০০৬

ময়মনসিংহে সিনেমা হলে বোমা, সাংবাদিক ও আ.লীগ নেতারা গ্রেফতার হলেও তদন্ত এগোয়নি।

ময়মনসিংহের চারটি সিনেমা হলে একযোগে বোমা হামলার তিন বছরের বেশি সময় পার হলেও এ ঘটনায় দায়ের করা মামলা চারটির কোনো কিনারা হয়নি। এখন জেএমবির জঙ্গিরা এসব হামলার দায় স্বীকার করলেও ওই সময় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতা এবং একজন সাংবাদিককে আসামি করে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ময়মনসিংহে জঙ্গিদের স্বীকারোক্তির পর নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবির শীর্ষ নেতা শায়খ আবদুর রহমানও এ হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০০৬

অ্যামনেস্টির বিবৃতি মানবাধিকার লঙ্ঘন না করেই বোমা হামলা ও সন্ত্রাসের তদন্ত করতে হবে।

বাংলাদেশে বোমা হামলা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বিষয়ে তদন্ত অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুযায়ীই সম্পন্ন করতে হবে। যাদের বেপরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য দেশটিতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, তাদের সবাইকে তদন্তের আওতায় আনতে হবে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এ কথা জানায়।

সমকাল, ১৮ মার্চ ২০০৬

কুমিল্লা ডিবি পুলিশের চার্জশিটে জেলা কমান্ডার রঙ্গিলের নাম নেই!

কুমিল্লায় র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার হওয়া জেএমবির জেলা কমান্ডার রঙ্গিল ১৭ আগস্টের সিরিজ বোমা হামলা অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়া সত্ত্বেও ৪ মাস আগে জমা দেয়া কুমিল্লা ডিবি পুলিশের চার্জশিটে তার নাম নেই। চার্জশিটে মোট ১০ জনকে আসমি করা হয়। এদের মধ্যে ২ জন পলাতক রয়েছে। পুলিশ ওই ২ জনকে এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি।

জনকণ্ঠ, ২০ মার্চ ২০০৬

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বোমা॥ মামলার তদন্ত নিয়ে নাটক!

১৭ আগস্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের পর জঙ্গি গ্রেফতার ও মামলার তদন্ত নিয়ে একের পর এক নাটক করছে। বোমার মতো স্পর্শকাতর মামলায় নিরীহ সাধারণ লোকজনকে মাসের পর মাস জেলে পুরে রাখার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। সরকার ও উপর মহলকে খুশি করতে পুলিশ এসব নাটক করছে বলে শহরজুড়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। সর্বশেষ গত ১৫ মার্চ রাতে র‍্যাব ৯ ও পুলিশের হাতে ৪ জঙ্গি গ্রেফতার হওয়ার পর পুলিশের পূর্বের সাজানো নাটকের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

যুগান্তর, ২২ মার্চ ২০০৬

তদন্ত ও স্বীকারোক্তিতে বিস্তর ফারাক।

রাজনৈতিক সুবিধা আদায় এবং প্রতিপক্ষকে সুযোগ বুঝে ঘায়েল ও হয়রানি করার জন্যই গত ৬ বছরে দেশে সংঘটিত প্রায় অর্ধশত বোমা হামলার ঘটনা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে হাতেগোনা যে ক'টি মামলার তদন্ত শেষ হয়েছে তাতেও ব্যাপক ঘাপলা করা হয়েছে। সরকারের নির্দেশে তদন্ত করতে গিয়ে তদন্ত কর্মকর্তারা একদিকে যেমন একপেশে তদন্ত করছেন, অপরদিকে তারা বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং নিরীহ লোকজনকে ফাঁদে ফেলে হয়রানি করছেন। পুলিশের একাধিক সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা এ ব্যাপারে বলেছেন, সম্প্রতি শীর্ষ জঙ্গি নেতা শায়খ আবদুর রহমান ও মুফতি হান্নান গ্রেফতার এবং অনেকগুলো বোমা হামলায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার ও বোমা হামলার পুরনো মামলাগুলো নতুন মোড়কে শুরু হলেও অতীতে এসব মামলায় যাদের জড়িত করা হয়েছিল তাদের হয়রানি শেষ হচ্ছে না। তাদের অপেক্ষা করতে হবে বিরোধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা নির্ভর করতে হবে বিচারকের কৃপার ওপর।

সমকাল, ৪ এপ্রিল ২০০৬

সিরিজ বোমা মামলার তদন্তে ফাঁকফোকর।

সিরিজ বোমা হামলাসহ পরবর্তী আত্মঘাতী বোমা হামলার তদন্তে থেকে যাচ্ছে ফাঁকফোকর। এসব ত্রুটিপূর্ণ তদন্তে চার্জশিট দাখিল হলে বিচার পর্যায়ে জঙ্গি আসামিদের রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন খোদ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। সোমবার মামলার তদন্ত অগ্রগতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি সরাসরি বলেছেন, ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত নিয়ে চার্জশিট দাখিল করা যাবে না। আর এ ধরনের চার্জশিট দাখিলের ফলে যদি কেউ ছাড়া পেয়ে যায় তাহলে তদন্ত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি সাংবাদিকদের কাছে গাজীপুরের আদালতে বোমা হামলা ও ময়মনসিংহে বাংলাভাইকে ধরার পর দায়ের করা মামলার তদন্তে ত্রুটি এবং অসন্তোষ প্রকাশের কথা স্বীকার করেন।

সমকাল, ১৩ এপ্রিল ২০০৬

সব আসামি জামিনে মুক্ত, মামলার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

রমনা বটমূলে বোমা হামলা মামলার গন্তব্য সম্পর্কে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা (আইও) নিজেই সন্দিহান। ৬ বার আইও পরিবর্তনের পর ৫ বছরেও মামলার চার্জশিট দিতে পারেনি পুলিশ। সিআইডির বর্তমান আইও জানে না কোন দিকে যাবেন, কী করবেন। গ্রেফতারকৃত আসামিদের সবাই জামিনে মুক্ত। বোমা হামলায় জড়িতদের নাম প্রকাশ করে আদালতে স্বীকারোক্তি দেয়া হরকাতুল জিহাদ নেতা আকবর হোসেনও পরে আদালতের মাধ্যমে তার জবানবন্দি প্রত্যাহার করেছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন এখনো দেয়নি রিপোর্ট। কিন্তু প্রথম দিকে মামলাটি পুরোপুরি ডিক্টেট করে ফেলেছিল মহানগর গোয়েন্দা বিভাগ। এখন মামলাটির তদন্ত করছে সিআইডি। সূত্র জানায়– পরে রাজনৈতিক চাপে হরকাতুল জিহাদ নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা যায়নি।

যুগান্তর, ১৪ এপ্রিল ২০০৬

রমনায় বোমা হামলার তদন্ত বন্ধ: মামলার আলামত নষ্ট।

রমনার বটমূলে বাঙালির বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নারকীয় বোমা হামলার তদন্ত একেবারেই থেমে গেছে। গত পাঁচ বছরে আটবার তদন্তকারী কর্মকর্তা বা আইও পরিবর্তন হলেও তদন্ত এগোয়নি এতটুকুও। মামলার প্রথমদিকের অন্যতম তদন্তকারী মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের সিনিয়র এসি আক্তারুজ্জামান ভুঁইয়া অত্যন্ত স্পর্শকাতর এ মামলাটির তদন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেলেও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে তা চলে গেছে হিমাগারে। সেই সঙ্গে সরকারের চরম উদাসীনতায় মামলায় অভিযুক্ত এবং গ্রেফতারকৃত সব আসামিই একে একে জামিনে বেরিয়ে গেছে। এমনকি ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত মর্মে আদালতে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী মাওলানা আকবরও এখন জামিনে। অযত্ন-অবহেলায় গুরুত্বপূর্ণ এ মামলার আলামতগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

সংবাদ, ২২ এপ্রিল ২০০৬

১৭ আগস্ট বোমা হামলা। রংপুরে আটক জামায়াত নেতাকে রিমান্ডে নিচ্ছে না পুলিশ।

র‍্যাবের হাতে আটক গঙ্গাচড়া উপজেলা জামায়াতের প্রচার সম্পাদক রোকনুজ্জামানকে রংপুরে ১৭ আগস্ট বোমা হামলা মামলায় শোন এরেস্ট দেখিয়েছে ডিবি পুলিশ। ওই জামায়াত নেতার জামিনের আবেদন করেছেন জামায়াতের দুই আইনজীবী। এদিকে জামায়াত নেতার জেএমবির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টি জানাজানি হওয়ায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। পুলিশই তাদের দেয়া প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, সে বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত। অথচ তাকে রিমান্ডের আবেদন করছে না পুলিশ। পুলিশের এ রহস্যজনক ভূমিকায় গোয়েন্দা বিভাগসহ বিভিন্ন মহল ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

প্রথম আলো, ১৬ মে ২০০৬

আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় আদালতে শীর্ষ জঙ্গিদের আরও হত্যার হুমকি।

ঝালকাঠিতে দুই বিচারক হত্যা মামলার আসামিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের দিনে গতকাল সোমবার নিষিদ্ধ সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) শীর্ষ জঙ্গিরা বলেন, তারা প্রচলিত আইন মানে না। বিচারক ও আইন প্রয়োগকারী লোকদের তারা হত্যা করেই যাবে। মামলার রায় নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

প্রথম আলো, ১৮ মে ২০০৬

ধর্মের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করে আইন হচ্ছে।

ধর্মের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করে আটকাদেশ দেয়ার বিধান এনে নতুন 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন' তৈরি করা হচ্ছে। এ আইনের অধীনে গ্রেফতার করা কাউকে মামলার তদন্তকালে এবং সরকারের আইন বিভাগকে নোটিশ দিয়ে না জানিয়ে জামিন দেয়া যাবে না। এ আইনে দোষী ব্যক্তির সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হচ্ছে।

সমকাল, ১৯ মে ২০০৬

সরকারও ফেরাউনের মতো তাগুদ: শায়খ।

ঝালকাঠিতে দুই বিচারক হত্যা মামলার যুক্তিতর্কের শেষ দিনে জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) প্রধান শায়খ আবদুর রহমান আদালতে চিৎকার করে সরকারকে ফেরাউনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সরকারও ফেরাউনের মতো 'তাগুদ' বা সীমা লঙ্ঘনকারী। তিনি ইসলামি জুরি বোর্ড গঠন করে এ মামলার রায় দেয়ার আবেদন জানান। বৃহস্পতিবার আদালতে জেএমবি সেকেন্ড ইন কমান্ড সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলাভাই বলেছেন, পুলিশ নির্যাতন চালিয়ে আসামিদের কাছ থেকে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, খুলনার সাংবাদিক বালু হত্যা পুলিশের ইন্ধনেই হয়েছে।

জনকণ্ঠ, ১৯ মে ২০০৬

জঙ্গি ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন রোধে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে হতাশ যুক্তরাষ্ট্র।

জঙ্গি ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে সরকারের আন্তরিকতা এবং কাজে হতাশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে জঙ্গি অর্থের উৎস ও লেনদেন উদ্ঘাটন করতে বিশেষ তদন্ত টিম পাঠাবে তারা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগের অধীনে গঠিত আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের সঙ্গে আগামী জুলাই মাস থেকে উক্ত টিম কাজ শুরু করতে পারবে। মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের এই বিশেষজ্ঞ দল একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করবেন।

ভোরের কাগজ, ৩০ মে ২০০৬

শায়খ বাংলাভাই সানিসহ ৭ জঙ্গির ফাঁসি।

ঝালকাঠির দুই সিনিয়র জজ সোহেল আহম্মেদ ও জগন্নাথ পাঁড়েকে বোমা মেরে নৃশংসভাবে হত্যার দায়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) প্রধান শায়খ আবদুর রহমান ও সেকেন্ড ইন কমান্ড সিদ্দিকুল

www.pathagar.com

ইসলাম বাংলাভাইসহ ৭ আসামিকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় ঝালকাঠির অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রেজা তারিক আহম্মদ স্মরণকালের বর্বরতম এই হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়দানকালে একমাত্র পলাতক আসাদুল ইসলাম ছাড়া বাকি ৭ আসামিই আদালতে উপস্থিত ছিল।

প্রথম আলো, ২৪ জুন ২০০৬

নিউইয়র্কে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী: ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলার তদন্ত শেষ পর্যায়ে।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেছেন, গত বছর ১৭ আগস্ট দেশজুড়ে বোমা হামলার তদন্ত শেষ পর্যায়ে আছে। দায়ীদের ইতোমধ্যে চিহ্নিত করা গেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে।

জনকণ্ঠ, ২৭ জুন ২০০৬

মোটিভ অনুদ্ঘাটিত থাকছে॥ দায়ী কারা কারণ কি, গডফাদার কে তাও ধামাচাপা পড়ছে।

জোট সরকার ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার আগেই একুশ আগস্টের গ্রেনেড হামলার মামলাটির নিষ্পত্তি করার আগ্রহে আগামী জুলাই মাসেই চার্জশিট দেয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক সমাবেশে গ্রেনেড হামলার জন্য পেশাদার সন্ত্রাসীদের দায়ী করে আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই এই মামলার চার্জশিট দেয়ার প্রস্তুতি চলছে। গ্রেনেড হামলার মোটিভ অনুদ্ঘাটিত রেখেই তদন্তের সমাপ্তি টানা হচ্ছে। গ্রেনেড হামলায় দায়ী কারা, কারণ কি, গডফাদার কে তা ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে তদন্তে।

সমকাল, ২৯ জুন ২০০৬

তদন্তের ত্রুটির কথা স্বীকার সিআইডির।

যশোরে উদীচী হত্যা মামলার তদন্ত ও চার্জশিট ত্রুটিপূর্ণ ছিল বলে সিআইডি নিজেই স্বীকার করেছে। সিআইডির অতিরিক্ত আইজিপি খোদা বক্স চৌধুরী সমকালকে বলেন, চার্জশিট ত্রুটিপূর্ণ ছিল বলেই চার্জশিটভুক্ত আসামি তরিকুল ইসলামকে উচ্চ আদালত আগেই মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

প্রথম আলো, ৩০ জুন ২০০৬

উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলা করেছিল হরকাতুল জিহাদ? রাজনৈতিক পাল্টাপাল্টির কারণে জঙ্গিদের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে কোনো তদন্তই হয়নি।

যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় প্রথম থেকে ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠী হরকাতুল জিহাদের (হুজি) সম্পৃক্ততার অভিযোগ এলেও পুলিশের তদন্তে তা শুধু উপেক্ষাই করা হয়নি, রাজনৈতিক স্বার্থে তদন্তকে ভিন্ন খাতে নেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক এ প্রভাবের জন্য ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ মধ্যরাতে উদীচী শিল্পগোষ্ঠীর জাতীয় সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণে ১০ জন নিহত ও ১০০ জন আহত হওয়া এই নারকীয় ঘটনার মূল আসামিরা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সমকাল, ৩০ জুন ২০০৬

খুলনা অঞ্চলের আলোচিত চারটি বোমা হামলায় কেউ চিহ্নিত হয়নি।

খুলনা অঞ্চলের সর্বাধিক আলোচিত ৪টি বোমা হামলার ঘটনায় হামলাকারী হিসেবে কেউ চিহ্নিত হয়নি। সাজা তো দূরের কথা, হামলাকারী কেউ চিহ্নিত না হওয়ায় সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ-হতবাক। সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব, রাজনৈতিক চাপ ও তদন্ত কর্মকর্তার উদাসীনতার কারণেই মূলত বোমা হামলাকারীরা চিহ্নিত হচ্ছে না বলে জানা গেছে।

যুগান্তর, ৬ জুলাই ২০০৬

কিবরিয়া হত্যা তদন্তের অগ্রগতি জানতে চেয়েছে ১৫ মার্কিন কংগ্রেস সদস্য।

সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যার ব্যাপারে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চেয়ে মার্কিন কংগ্রেসের ১৫ জন সদস্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। এই চিঠিতে কংগ্রেসম্যানরা মূলত প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঁচটি বিষয়ে জানতে চেয়েছেন।

www.pathagar.com

সমকাল, ৬ আগস্ট ২০০৬

সিরিজ বোমা হামলাঃ এক বছরেও তদন্ত শেষ হয়নি। পাবনায় নতুনভাবে সংগঠিত হচ্ছে জঙ্গিরা।

দীর্ঘ একবছরেও পাবনায় জঙ্গিদের সিরিজ বোমা হামলার চার্জশিট বা তদন্ত শেষ হয়নি। এদিকে আবারও নতুন করে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা জেএমবির ক্যাডাররা সংগঠিত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

প্রথম আলো, ৭ আগস্ট ২০০৬

সিলেটের মেয়রের ওপর গ্রেনেড হামলা, দুই বছরেও মামলার অভিযোগপত্র দেয়া হয়নি।

সিলেটের মেয়র কামরানের ওপর গ্রেনেড হামলার দুই বছর পেরিয়ে গেলেও ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ব্যাপারে সিআইডি এখনো কোনো তথ্য বের করতে পারেনি। এ কারণে মামলার অভিযোগপত্রও (চার্জশিট) দেয়া হয়নি।

যুগান্তর, ১৩ আগস্ট ২০০৬

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১১ মাসেও মামলার বিচার কার্য শুরু হয়নি।

প্রভাকশন ওয়ারেন্ট তামিল না হওয়ায় দীর্ঘ সাড়ে ১১ মাস অতিবাহিত হলেও চাঁপাইনবাবগঞ্জে জেএমবির সিরিজ বোমা হামলা মামলার বিচার কার্য এখনও শুরু হয়নি। বর্তমানে মামলাটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে। কারাগার কর্তৃপক্ষ মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামিদের নির্ধারিত দিনে আদালতে হাজির না করায় বিচার কার্য শুরু হচ্ছে না।

প্রথম আলো, ২০ আগস্ট ২০০৬

তদন্ত থেমে আছে, অভিযোগপত্র কবে দেয়া হবে কেউ জানে না।

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলার তদন্ত থেমে আছে। বহুল আলোচিত এ মামলার অভিযোগপত্র কবে দেয়া হবে তাও বলতে পারছেন না তদন্তকারী কর্মকর্তারা। তবে পুলিশের অপরাধ তদন্ত সংস্থার (সিআইডি) কর্মকর্তারা মামলার তদন্ত থেমে থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

সমকাল, ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬

বছর পেরিয়ে গেলেও রংপুরে হয়নি সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ মামলার চার্জশিট।

রংপুরে ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলার এক বছর পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত মামলার চার্জশিট দেয়া হয়নি। ওই মামলা নিয়ে বর্তমান জোট সরকারের মেয়াদের শেষদিকে এসে নড়েচড়ে বসেছে রংপুরের ডিবি পুলিশ। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার আগেই সিরিজ বোমা মামলাটি সচল করতে উদ্যোগী হয়ে পড়েছেন তারা। মামলার তদন্ত কাজ শেষ করা হয়েছে দায়সারাভাবে।

সংবাদ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬

গ্রেনেড হামলা; সব আইও বদল।

তদন্তে ব্যর্থতার কারণে ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে গ্রেনেড হামলা মামলাসহ দেশের সব উল্লেখযোগ্য গ্রেনেড ও বোমা হামলা মামলার তদন্ত কর্মকর্তাদের সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তদন্ত কর্মকর্তাদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

ইনকিলাব, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬

সরকারের গাইডলাইন অনুযায়ী তদন্ত হচ্ছেঃ গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বিপাকে।

সরকারের গাইডলাইন অনুযায়ী চাঞ্চল্যকর গ্রেনেড ও বোমা হামলার মামলাগুলো তদন্ত করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। দফায় দফায় তদন্তের মোটিভ পরিবর্তন করতে গিয়ে প্রকৃত অপরাধীরা আড়ালে থেকে যাচ্ছে। রিমান্ডে থাকা হরকাতুল জিহাদের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে গোয়েন্দারা যেসব তথ্য দিচ্ছেন এ নিয়েও নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে।

www.pathagar.com

জনকণ্ঠ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬

জোট সরকারের মেয়াদে ময়মনসিংহ সিনেমা হলে বোমা হামলার চার্জশিট হচ্ছে না।

জোট সরকারে মেয়াদে ময়মনসিংহ সিনেমা হলে বোমা মামলার চার্জশিট হচ্ছে না। দেশ কাঁপানো এই বোমা হামলায় জড়িত জেএমবির পাঁচ সদস্যের তিনজন ইতোমধ্যে শনাক্ত ও এক শূরা সদস্যের বোমা হামলার দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেয়ার ঘটনাকে মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি দাবি করা হলেও জোট সরকার মেয়াদে এই মামলার চার্জশিট হচ্ছে না। কৌশলগত কারণে নাকি অন্য কারও স্বার্থে মামলাটি জিইয়ে রাখা হচ্ছে এমন প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে জোট সরকারের মেয়াদে জেএমবি বোমা হামলার অনেক মামলার অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত সময়ে চার্জশিট প্রদানসহ খুনিদের বিরুদ্ধে আদালত ফাঁসির রায় পর্যন্ত ঘোষণা করলেও সিনেমা হলে বোমা মামলা নিয়ে সময়ক্ষেপণ করায় ময়মনসিংহবাসীর মধ্যে ক্ষোভ-অসন্তোষ বাড়ছে।

সমকাল, ১৭ অক্টোবর ২০০৬

২ জঙ্গির জবানবন্দি: মুফতি হান্নানের নির্দেশেই ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর হামলা হয়।

সিলেটে হজরত শাহজালালের (র:) দরগাহ প্রাঙ্গণে ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর গ্রেনেড হামলাসহ সিলেটে ৪টি বোমা হামলার দায় স্বীকার করেছে হরকাতুল জিহাদের সদস্য জঙ্গি বিপুল ও রিপন। হরকাতুল জিহাদের শীর্ষ নেতা মুফতি হান্নানের নির্দেশে এ হামলা চালানো হয় বলে বিপুল ও রিপন সোমবার সিলেটের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৬৮ ধারায় দেয়া জবানবন্দিতে এই স্বীকারোক্তি প্রদান করে।

প্রথম আলো, ২০ নভেম্বর ২০০৬

সিলেট ও রমনা বটমূলে গ্রেনেড হামলা চালান মুফতি হান্নান, আরও বহু বোমা হামলায় জড়িত থাকার কথা আদালতে স্বীকার।

কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনার জনসভার স্থানে বোমা পুঁতে রাখা এবং সিলেটে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর গ্রেনেড ও ঢাকায় রমনার বটমূলে বোমা হামলাসহ দেশের বিভিন্নস্থানে বোমা হামলার সঙ্গে নিজের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে হরকাতুল জিহাদ।

ভোরের কাগজ, ২০ জানুয়ারি ২০০৭

সিপিবির সমাবেশে বোমা হামলার তদন্ত দীর্ঘ ৬ বছরেও শেষ হয়নি।

পল্টনে সিপিবির মহাসমাবেশে বোমা হামলার তদন্ত আজো শেষ হয়নি। দীর্ঘ ৬ বছর কেটে গেলেও ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। পুলিশ উদ্ঘাটন করতে পারেনি ঘটনার নেপথ্য অশুভ শক্তিকে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আজ শনিবার পালিত হচ্ছে পল্টন ট্র্যাজেডির ষষ্ঠ বার্ষিকী।

সংবাদ, ২১ জানুয়ারি ২০০৭

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা উলফার দায়িত্ব স্বীকার।

সংবাদ সংস্থা বিডিনিউজ আসামের পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য পরিবেশন করে। বাংলাদেশের কাছে তথ্য নেই। ভারতের আসাম রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী উলফার একজন জঙ্গি নেতা ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালানোর কথা স্বীকার করেছেন।

প্রথম আলো, ৩১ মার্চ ২০০৭

এক অন্ধকার অধ্যায়ের অবসান।

৩০ মার্চ মধ্যরাতে আকস্মিকভাবে দেশের বিভিন্ন কারাগারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় জেএমবি নেতা শায়খ আবদুর রহমান, সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই, আতাউর রহমান সানি, আব্দুল আউয়াল, খালেদ সাইফুল্লাহ্ এবং আত্মঘাতী হামলাকারী ইফতেখার হাসান মামুনের। নিরাপত্তার কারণে ফাঁসির বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয় বলে জানানো হয়।

www.pathagar.com

সমকাল, ১ এপ্রিল ২০০৭

জঙ্গি মদদদাতা : সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হকের বিরুদ্ধে মামলা।

বাংলাভাইয়ের হাতে নির্যাতিত রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার ফজলুর রহমান নামক ব্যক্তি জঙ্গিদের মদদদাতা হিসেবে সাবেক টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক এবং রাজশাহী জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক শীশ মোহাম্মদসহ ২৮ জনের নামোল্লেখ করে দেড় শতাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাগমারা থানায় মামলা দায়ের করেছেন গত ৩০ মার্চ রাতে।

www.pathagar.com

১৭ আগস্ট ২০০৫ তারিখে জেএমবি'র প্রচারিত লিফলেট

১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের আহ্বান!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তার বান্দা ও রাসুল। কুরআনে কারিমে ইরশাদ হচ্ছে– "আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেয়ার অধিকার নেই" (সূরা ইউসুফ-৪০)। "শুনে রাখ! তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা (সূরা আ'রাফ-৫৪)। 'আল্লাহর আইনকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমার উম্মতের মধ্যে একটি ঈছাবা (দল) সবসময় সশস্ত্র জিহাদ করে যাবে। তারা তাদের শত্রুদের প্রতি কঠোর হবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজ চালিয়ে যাবে।"

জনগণের প্রতি আহ্বান!

প্রিয় দেশবাসী মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিরূপে এবং শুধুই তাঁর ইবাদতের জন্য যাতে থাকবে না কোনো অংশীদার। আমাদের মাঝে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)কে প্রেরণ করেছেন এই শিক্ষা দেয়ার জন্য যে, আমরা কীভাবে আমাদের বিশ্বাস ও কাজেকর্মে তাগুতকে বর্জন করতে পারি। আল্লাহতালা বলেন, "প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি রাসুল পাঠিয়েছি এ দায়িত্বে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো এবং সকল প্রকার তাগুতকে বর্জন কর" (সূরা নাহল-৩৬)।

তাগুত: মানুষ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইলাহ বা উপাস্যের আসনে বসিয়ে তার ইবাদত বা আনুগত্য করে এবং কোনো ব্যাপারে তাকে আল্লাহর সাথে শরিক করে তবে সেই অংশীদার ইলাহকে বলা হয় 'তাগুত'। ক্ষমতাসীন তাগুত আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী জালিম শাসক, অর্থাৎ যে শাসক আইনের বলে হারামকে হালাল করে। যেমন– যিনা, সুদ, মদ্যপান বা অশ্লীলতার অনুমোদন দেয় কিংবা হালালকে হারাম করে। যেমন– জিহাদ-ক্বিতালে বাধা দেয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের তৈরিকৃত অথবা কাফের-মুশরেকদের বিধান অনুযায়ী শাসন করে সে হলো 'ক্ষমতাসীন তাগুত'।

কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কারো বিধান চলতে পারে না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম বাস করা সত্ত্বেও আমাদের দেশে আল্লাহর বিধান কার্যকর নেই। উপরন্তু এ দেশের জেলা থেকে রাজধানী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নিম্ন ও উচ্চ আদালত গঠন করে যে বিচারকার্য পরিচালনা করা হচ্ছে তার মূলভিত্তি হচ্ছে মনুষ্য রচিত সংবিধান। যে সংবিধান প্রণয়ন করেছে কিছু জ্ঞানপাপী মানুষ। কথা ছিল মানুষ হিসেবে একজন মানুষের কাজ হবে আল্লাহর দাসত্ব করা ও আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা। কিন্তু সে মানুষ আজ নিজেই সংবিধান রচনা করে আল্লাহর বিধানের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

এ দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছে আল্লাহবিরোধী শক্তি। কারণ যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা রাষ্ট্রের অন্যান্য পরিচালকবর্গ নির্বাচিত হচ্ছেন তা একটি সম্পূর্ণ অনৈসলামিক পদ্ধতি। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে কোথাও প্রচলিত কাফির মুশরিক বিরচিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি পদ্ধতির স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। এসব প্রত্যেকটি পদ্ধতিই হচ্ছে আল্লাহর বিধানের প্রতিপক্ষ এক একটি অবস্থা এবং কাফির-মুশরিক ও ইহুদি মস্তিষ্কপ্রসূত এসব বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে শুধু মুসলিম আক্বিদা ও বিশ্বাসকে ধ্বংস করার মানসে। কাজেই এ দেশের মুসলিম জনতার আজ ভাবার সময় এসেছে।

তাই জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ আল্লাহর হুকুম ঈমানের দাবিকে সামনে রেখে এই প্রচলিত বিচার ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। পাশাপাশি যে সংবিধানকে ভিত্তি করে দেশ পরিচালিত হচ্ছে, তা আল্লাহর বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় এ ব্যবস্থা ও তথাকথিত নির্বাচন পদ্ধতি পরিহার করে আল্লাহর হুকুম ও রাসুলের তরিকায় দেশ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। অন্যথায় জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহ নির্দেশিত কিতাব পদ্ধতির সামগ্রিক বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। অতএব, যতদিন পর্যন্ত দেশে ইসলামি আইন বাস্তবায়ন না হয়, ততদিন পর্যন্ত তাগুতের বিচারালয়ে যাওয়া বন্ধ রাখুন। আপনাদের যে কোনো বিচার ফয়সালার জন্য মসজিদের খতিব, মাদরাসার মুহাদ্দেস ও অভিজ্ঞ আলেমেদ্বীনের কাছে গিয়ে আল্লাহর আইনের ফয়সালা প্রার্থনা করুন। তাগুত সরকারের আইন উপেক্ষা করে আল্লাহর আইনের বিচার ফয়সালা নিন।

আল্লাহ বলেন, "তারা কি জাহেলি বিধানের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা ঈমানদারদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে?" (সূরা মায়েদাহ-৫০)। "তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো বিচারক অনুসন্ধান করবো?" (সূরা আন'আম-১১৪)। "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে আমরা ঈমান এনেছি, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়ে ছিল। তারা তাগুতকে বিধান দানকারী বানাতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, তারা যেন তাকে অমান্য করে" (সূরা নিসা-৬০)।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান!

যারা হেদায়েতের অনুসারী তাদের প্রতি সালাম। হেদায়েত প্রাপ্তির পর গোমরাহি ও অন্ধকারের দিকে ফিরে আসা উচিত নয়। আল্লাহ তার রাসুলকে সত্য দ্বীন সহকারে সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করেছেন সুসংবাদ বহনকারী ও সতর্ককারী হিসেবে। যারা তার ডাকে সাড়া দিয়েছে, আল্লাহ তাদের সঠিকভাবে হেদায়েত দিয়েছেন। আর যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। অতঃপর তারা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, ইসলামের আনুগত্য করেছে। অতএব, বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান! আপনারা এ দেশে আল্লাহর আইন চালু করুন। আমরা আপনাদের সহযোগিতা করবো। আমরা ক্ষমতা চাই না, আমরা দেশে তাগুতি শাসনের পরিবর্তে আল্লাহর আইন চাই।

জামা'আতুল মুজাহেদিন বাংলাদেশের কর্মীরা আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করার জন্য এরা অস্ত্র হাতে নিয়েছে। যেমন নিয়েছিলেন নবী-রাসুল, সাহাবী ও যুগে যুগে বীর মুজাহিদরা। জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ এ দেশ থেকে সব শিরক-বিদ'আতের অবসান ঘটিয়ে খালেছ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় এবং এর মাধ্যমে জনগণকে দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী দেখতে চায়।

জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ লিফলেট ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে সরকারকে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য ইতোপূর্বে দু'বার আহ্বান জানিয়েছে। প্রতিবারই সরকার তাদের কর্মীদের গ্রেফতার করেছে। জামা'আতুল মুজাহিদিন তার পাল্টা কোনো অ্যাকশন নেয়নি। কিন্তু এবারের আহ্বান জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার তৃতীয় আহ্বান। এই আহ্বানের পর সরকার যদি এ দেশে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা না করে, বরং আল্লাহর আইন চাওয়ার অপরাধে কোনো মুসলিমকে গ্রেফতার করে, অথবা আলেম-ওলামাগণের ওপর নির্যাতন চালায় তাহলে জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে পাল্টা অ্যাকশন নেবে ইনশা আল্লাহ।

জাতীয় সংসদের সরকারি ও বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান!

এ দেশে যারা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চায় তারা ইসলামের শত্রু। অতএব, আল্লাহর হেদায়েত পেতে চাইলে দলাদলি বাদ দিয়ে সরকারি ও বিরোধী দল মিলে অবিলম্বে দেশে ইসলামি আইন চালু করুন। তাগুতি সংবিধান পরিত্যাগ করে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ থেকে সমুদয় শিরক-বিদ'আত, অশ্লীলতা দূর করে জনগণকে সঠিকভাবে ইসলাম পালন করতে দিন। আর আপনারা যদি বুশ-ব্লেয়ার চক্রের ভয়ে দেশে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার সাহস না পান, তাহলে গণতন্ত্রের তাগুতি রাজনীতি ছেড়ে দিন। আলেম-ওলামা, মাশায়েখ ও ইসলামি চিন্তাবিদগণের সমন্বয়ে শুরাই পদ্ধতিতে তৌহিদী জনতা এ দেশে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে ইনশা আল্লাহ।

সরকারি আমলা ও বিচারকগণের প্রতি আহ্বান

সরকার দেশে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা না করলে আপনারা প্রশাসনিক কাজকর্ম ও তাগুতি আইনের বিচারকার্য পরিচালনা বন্ধ করুন। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে জীবন ধন্য করুন। সেই সঙ্গে আর্মি, বিডিআর, পুলিশ ও র‍্যাবসহ সব সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের প্রতি আহ্বান! আপনারা তাগুতি আইন হেফাজতের পরিবর্তে আল্লাহর আইন হেফাজতে সচেষ্ট হোন। তাগুতের আদেশ মানবেন না, আল্লাহর আদেশ মানুন। তাগুতের

www.pathagar.com

নির্দেশে আল্লাহর সৈনিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না। তাগুতের গোলামি ছেড়ে আল্লাহর সৈনিকদের দলে যোগ দিন। তাগুতের সৈনিক হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর সৈনিক হয়ে যান। আর যারা তাগুতের গোলামি না ছাড়বে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন– "যারা ঈমানদার তারা লড়াই (সশস্ত্র জিহাদ) করে আল্লাহর রাহে, পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা লড়াই (সশস্ত্র জিহাদ) করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে (দেখবে), শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল" (সূরা নিসা-৭৬)।

বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আহ্বান

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হচ্ছে জর্জ ডব্লিউ বুশ। সে সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিরীহ মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে এবং জোর করে সব মুসলিম দেশে কুফরি সংবিধান চাপিয়ে দিয়ে তাদের ঈমানহারা করতে চায়। সমগ্র পৃথিবীতে গণতন্ত্রের কুফুরি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে New World Order এর মাধ্যমে গোটা পৃথিবীকেই তার নির্দেশের আওতায় আনতে চায়। এ যেন এক নব্য ফেরাউনি অভিলাষ। কিন্তু আল্লাহর সৈনিকরা তার এ অভিলাষ পূর্ণ হতে দেবে না এবং গণতন্ত্রের কুফরি মতবাদও প্রতিষ্ঠা হতে দেবে না। গণতন্ত্র হচ্ছে তাগুতের উদ্ভাবিত পদ্ধতি। পৃথিবীতে তাগুতি শক্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটা তাদের প্রধান অস্ত্র। তাগুতি বিধান আল্লাহর পথের মুজাহিদদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা অস্ত্র ধরে তাদের বলে জঙ্গি, সন্ত্রাসী। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্য দলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়' (সূরা নিসা-৭১)।

অতএব, বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আহ্বান, আপনারা প্রতিটি মুসলিম দেশে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে বাধ্য করুন। সব মুসলিম দেশ হতে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে তাগুতি শাসকদের উৎখাত করে ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা করুন। কুফরি জাতিসংঘ পরিত্যাগ করুন। ইসলামি দেশ মিলে মুসলিম জাতিসংঘ গঠন করে মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করুন।

কাফের-মুশরেকদের প্রতি হুঁশিয়ারি

বুশ-ব্লেয়ারসহ সব জালেম শাসকদের হুঁশিয়ার করা যাচ্ছে যে, তোমরা মুসলিম দেশের দখলদারিত্ব ছেড়ে দাও। মুসলিম দেশে আর মোড়লিপনা করার চেষ্টা করো না। সারাবিশ্বে মুসলিমরা জেগে উঠছে। এখনো যদি মুসলমানদের ওপর নির্যাতন বন্ধ না কর, তাহলে তোমাদের পৃথিবীর কোথাও নিরাপদে থাকতে দেয়া হবে না। ইসলামদ্রোহী NGO-দের সতর্ক করা যাচ্ছে যে, তোমরা মুসলিম দেশে ইসলাম বিধ্বংসী কার্যক্রম বন্ধ কর। তা না হলে তোমাদের সমূলে উৎপাটন করা হবে ইনশা আল্লাহ।

ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদিও ওয়া'আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন। আহ্বানে, জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ।

সূত্র: ১৮ আগস্ট ২০০৫, দৈনিক আমাদের সময়।

www.pathagar.com

পরিসংখ্যান

জঙ্গিদের বিচার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

সময়	অভিযোগপত্র দায়ের	মামলা দায়ের	খালাশ	মৃত্যুদণ্ড	যাবজ্জীবন	অন্যান্য
২০০১-০৫	৩৪					
২০০৬	৫৬২	১৮৩	৭৩	৪০	১২৫	৮১
মোট	৫৯৬	১৮৩	৭৩	৪০	১২৫	৮১

সূত্র: গবেষণা ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

জঙ্গি গ্রেফতারের তালিকা

১৭ আগস্ট '০৫ থেকে ৩১ মার্চ '০৭

বিভিন্ন দল	সংখ্যা
জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)	৮৩৬
হিযবুত তাহরীর	৩২
হিজবুত তৌহিদ	২৭
হরকাতুল জিহাদ	২৩
আহলে হাদিস আন্দোলন	৯
দাওয়াতে ইসলামী	৮
বিভিন্ন ইসলামিক এনজিও	৭
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬
ইসলামিক শাসনতন্ত্র আন্দোলন	২
কালেমা দাওয়াত	২
লস্কর-ই-তৈয়বা	২
জাগ্রত জনতা পার্টি	১
খেলাফত মজলিশ	১
জমিয়তে উলামা-এ ইসলাম	১
অজ্ঞাত জঙ্গি গ্রুপ	২৩
জঙ্গি সন্দেহে	২২
জেএমবি সন্দেহে	১৭
রাজনৈতিক পরিচয়হীন	২৭৮
সর্বমোট	**১২৯৭**

সূত্র: প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, সংবাদ, ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, ইনকিলাব, সমকাল, বাংলা বাজার, ডেইলি স্টার, নিউএজ ও সংগ্রাম।

গ্রন্থনা: তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট এবং মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

www.pathagar.com

জঙ্গিবাদী বোমা হামলা (১৯৯৯-২০০৫)

লক্ষ্যবস্তু	ঘটনার সংখ্যা	নিহত	আহত
রাজনৈতিক সমাবেশ ও ব্যক্তিত্ব	৭	৭০	৯২৮
মেলা/উৎসব/পার্বণ	৯	৩৯	১৫৭
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংগঠন	১৩	৩০	৪৭১
সিনেমা হল	১১	২২	২৪৭
ধর্মীয় উপাসনালয়	৭	১৯	৯৯
আদালত ও বিচারক	৯	১৫	১৪৮
মাজার/ওরস	৫	৭	১২০
বিদেশি রাষ্ট্রদূত	১	৩	১০০
পুলিশ/থানা/কারাগার	৮	৩	২৩
সাংবাদিক ও সংবাদপত্র অফিস	৩	৩	২২
এনজিও	৩	০	২৭
অন্যান্য	২০	২৯	১৪১
মোট	১৫৯	২৪০	২৪৮৩

সূত্র: বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা

গ্রন্থনা: মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইউনিট ও তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট

১৭ আগস্ট ২০০৫-এর বোমা হামলা

লক্ষ্যবস্তু	ঘটনার সংখ্যা	নিহত	আহত
আদালত/কোর্টচত্বর	১১০		৭৫
ডিসি, এসপি ও টিএনও অফিস	৮৬	১	৪৩
স্টেশন (বাস-রেল-লঞ্চ)	৩৮		৩৬
বাজার	২৬	১	১৮
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কলেজ-বিশ্ব:)	২৬		
প্রেসক্লাব	১৩		
ধর্মীয় উপাসনালয়	১২		৯
পুলিশ/থানা/কারাগার	৯		৩৭
হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ	৬		
মাজার	৬		
শহীদ মিনার	৫		
রাজনৈতিক দলের অফিস (আ.লীগ-বিএনপি)	৪		
সচিবালয় (নিকটবর্তী)	৩		
বিমানবন্দর (নিকটবর্তী)	৩		৩০
ব্যাংক	৩		
আমেরিকান দূতাবাস (নিকটবর্তী)	২		
বঙ্গভবন (নিকটবর্তী)	১		
অন্যান্য (জনসমাগম স্থল)	১৪৯		৩৭
মোট	৫০২	২	২৮৫

সূত্র: বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা

গ্রন্থনা: মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইউনিট ও তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট